জিয়াং প্রদেশের উইঘুরদের উপর কমিউনিস্ট রাষ্ট্র চীনের নিপীড়নের অভিযোগ বেশ পুরোনো। বর্তমান শতাব্দীতেও জাতিগত চয়ে নিপীড়নের স্বীকার তারা। কথায় কথায় নিষিদ্ধ আর সন্দেহ ই গ্রেপ্তার। দুনিয়ার অদ্ভুত সব বৈষম্যমূলক নিষেধাজ্ঞা হয়তো নেই খুঁজে পাওয়া যাবে। গোঁফ ছাড়া দাড়ি রাখা নিষেধ। ১৮ বছরের পুরুষের মসজিদে প্রবেশে আছে নিষেধাজ্ঞা। মানা আছে নারীদের হিজাব পরার উপরেও। কিন্তু বলা হয়ে থাকে হিজাব উইঘুর নারীদের যতটা না ধর্মীয় তার থেকে বেশি সাংস্কৃতিক উপাদান। এ ছাড়াও রাস্তায় দলবদ্ধ হয়ে হাটা কিংবা টুপি পরতেও মানা এখানে। এমন কি বাচ্চাদের ধর্মীয় নাম রাখার ক্ষেত্রেও আছে নিষেধাজ্ঞা। নিষিদ্ধ ২৯ টি ধর্মীয় নাম।

উইঘুরদের ধর্মীয় সকল কাজ দেখা হয় সন্দেহের দৃষ্টিতে। তাই রোজা রাখা কিংবা নামাজ পড়া এখানে বিশাল সন্ত্রাসী কাজ। ফলে নামাজ পড়লে কিংবা রোজা রাখার অপরাধে এখানে গ্রেফতার করা হয় নাগরিকদের। চীনা ভাষায় কুরআন অনুবাদের অপরাধে সালিহ হাজিম নামে উইঘুর নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো যিনি কিছুদিন আগে কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন। আবার আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে দেখা যায় জিনজিয়াংয়ে উইঘুর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখায় তাকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে চীনের একটি আদালত। তার স্ত্রীকে দেওয়া হয় দুই বছরের কারাদণ্ড কারণ দাড়ি রাখার বিষয়টি জেনেও কর্তৃপক্ষকে জানায় নি সে! মনে হতে পারে নিজ দেশে পরবাসী এক জাতির গল্প বলা হচ্ছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও তারা ভুলে যাননি নিজেদের পরিচয়। বরং শত অত্যাচারের মধ্যেও সব সময় সরব থেকেছে নিজেদের অধিকার নিয়ে। প্রতিবাদ করেই যাচ্ছে। লড়াই করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। উইঘুরদের ইতিহাস, সংগ্রাম আর নির্যাতন সম্পর্কে জানতে ডুব দিতে হবে "উইঘুরের কান্না" বইয়ে।

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

www.projonmo.pub

NON FICTION
ISBN: 978-984-34-6697-6

উইঘুরের কান্না ■ মুহসিন আব্দুল্লাহ

FREE UYGHUR NOW!

উইঘুরের কান্না

মুহসিন আব্দুল্লাহ

উঁইঘুরের কান্না

মুহসিন আব্দুল্লাহ

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
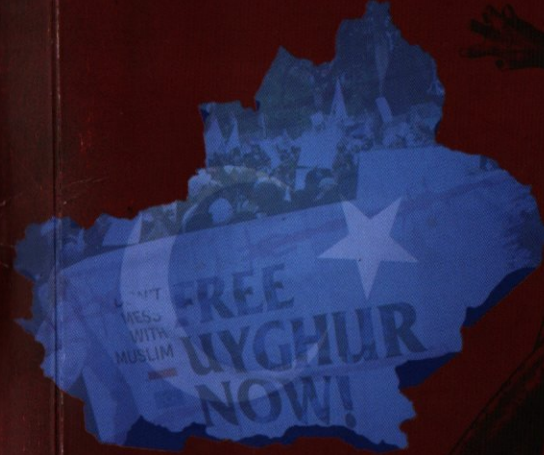
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৯
২য় সংস্করণ: বইমেলা ২০২৩
প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুষার

পরিবেশক
রকমারি.কম
www.rokomari.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশন
৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
info@projonmo.pub
www.projonmo.pub

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা কর্তৃক ৪১/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত।

Price: BDT 264 Taka
International Price: $20.00 USD
ISBN: 978-984-96328-8-7

সূচিপত্র

উইঘুর শব্দের ইতিবৃত্ত

বাংলা 'উইঘুর' শব্দটি তুর্কি ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ 'ঐক্যবদ্ধ' বা 'সংঘবদ্ধ'। শুধু বাংলা নয় উচ্চারণে সামান্য হেরফের থাকলেও প্রায় সব ভাষারই একটি নির্দিষ্ট পরিভাষায় পরিণত হয়েছে শব্দটি। এর দ্বারা নির্দিষ্ট করে শুধু চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের অন্যতম একটি জাতিগোষ্ঠীকে বুঝায়। তারা এশিয়ার বিভিন্ন দেশ এমনকি ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। আসলে চীনা সরকারের নিষ্ঠুর দমন নীতির কারণে তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে জিনজিয়াং এর মুসলিম জনগোষ্ঠীর ওপর চীনা কমিউনিস্ট সরকারের বর্বরতার খবর আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় উঠে আসার কারণে বিশ্ববাসীর কাছে 'উইঘুর মুসলিম' শব্দটি বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে।

উইঘুর শব্দটিকে পুরাতন নিয়মে ফার্সী ভাষায় আরবি বর্ণে লেখা হতো। আবার এখন ইংরেজীতে লেখা হয় বিভিন্ন বানানে। যেমন, Uyghur (উইকিপিডিয়া); Uighur (আলজাজিরা, বিবিসি); Uygur (চায়না ডেইলি), অনেক সময় এভাবেও লেখা হয় Uigur, Weiwuer আর চীনা ভাষায় লেখ্যরূপ সরলীকৃত চীনা: 维吾尔; প্রথাগত চীনা: 維吾爾; প্রতিবর্ণিরূপ; *Wéiwú'ěr.*

আবার প্রাচীন তুর্কি 'ওউ/উই' উচ্চারণভেদে অর্থ হতো 'জেগে ওঠা', 'ওঠানো' বা 'নাড়ানো'। অবশ্য পিটার গোল্ডেন নামক এক পশ্চিমা ভাষা ও ইতিহাসবিদ তার An Introduction to the History of the Turkic Peoples: Ethnogenesis and State-formation in Medieval and Early Modern Eurasia and the Middle East (১৯৯১) গ্রন্থে এই মতো নাকচ করেছেন। যা বিভিন্ন পশ্চিমা গণমাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হচ্ছে।

তবে আধুনিক শব্দতত্ত্ব (Modern etymological explanations) অনুযায়ী উইঘুর শব্দের ক্রিয়ারূপ 'অনুসরণ করা' আর বিশেষণরূপ 'অবিদ্রোহী' বা 'গোলমাল করেনি এমন'। Oxford English Dictionary-তে বলা হয়েছে, NOUN; 1. A member of a Turkic people of north-western China, particularly the Xinjiang region, and adjoining areas. 2. *[mass noun]* The Turkic

language of the Uighurs, which has about 7 million speakers. ADJECTIVE; Relating to the Uighurs or their language.

তুর্কি গবেষক হাকান ওজগলু (Hakan Özoğlu) তার Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities, Competing Loyalties, and Shifting Boundaries (২০০৪) গ্রন্থের ১৬ পৃষ্ঠায় লেখেন, উইঘুরদের বুঝাতে কোন কোন ঐতিহাসিক 'হুইহে' বা 'হুইহু' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তা আসলে রাজনৈতিক শব্দ। কোন আদিম জাতিগোষ্ঠীর শব্দ নয়। শব্দটি তকুজ ওঘুজ থেকে এসেছে। তুর্কিভাষায় তকুজ অর্থ নবম সংখ্যা আর ওঘুজ অর্থ সম্প্রদায় বা জাতিগোষ্ঠী। ৭৩০ সালে চীনের উত্তর পশ্চিমে নয়টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী একসঙ্গে বসবাস করত। তাদের একটির নাম ছিল হুইহে বা হুইহু। অনেকের ধারণা উইঘুররা এই 'হুইহে বা হুইহু' জাতিগোষ্ঠীরই পরবর্তী প্রজন্ম। গবেষক ওজগলুর মতে, 'হুইহে বা হুইহু' শব্দটির ব্যবহার পনেরশ শতকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আবার বিংশ শতাব্দীতে এসে ব্যবহৃত হতে শুরু করে রাশিয়ান বলশেভিকদের দ্বারা। তারা 'তুর্কি' শব্দের বদলে 'হুইহে' শব্দ দিয়ে উইঘুরদের পরিচিত করার চেষ্টা করে।

চীনের প্রাচীন নথিপত্রে দেখা যায় উইঘুররা 'উত্তরের উই' নামেও পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকে চীনের উত্তরাঞ্চলে 'ওয়েই' বা 'উই' রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজারা বিশেষ করে তুবা উই, লেতার উই, ইয়ান উই পূর্ব মঙ্গোলিয়া থেকে আগত গোত্র বলে ধারণা করা হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ধরা হয় তুবা উইকে। তারা মূলত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

কোন কোন ইতিহাসবিদ মনে করেন, প্রাচীনকালে একটি কাফেলা যাত্রাপথে বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে থাকে। অগ্রগামী দলের একজন জিনজিয়াংয়ের তারিম নদীর অববাহিকায় সুন্দর আবহাওয়া দেখে অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে ওয়াও! সেখান থেকে অপভ্রংশ হয়ে উইঘুর শব্দটি এসেছে।

আবার একদল মুসলিম ইতিহাসবিদদের মতে, ৭১২ সালে মুসলিম সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিমের পূর্ব তুর্কিস্তান বিজয়ের পর ছোট ছোট বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। এর আগে নানান গোত্রে বিভক্ত বিশাল জনসমষ্টিকে এভাবে একত্রিত দেখে তারা

নিজেরাই অবাক হয়ে যায়। এবং নিজেদেরকে উইঘুর বা 'একতাবদ্ধ' বলে পরিচয় দিতে থাকে। সেখান থেকেই উইঘুর শব্দের উৎপত্তি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও প্রাচীন এ সম্প্রদায়ের লোকদের উইঘুর না বলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হতো। মূলত, ১৯২১ সালে উজবেকিস্তানে এক সম্মেলনের পর উইঘুররা তাদের পুরোনো পরিচয় ফিরে পায়। ভাষাবিদ ও ইতিহাসবেত্তারা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছেন যে 'উইঘুর' শব্দটি 'উয়্যাঘুর' শব্দ থেকে এসেছে।

উইঘুররা মূলত তুর্কি বংশোদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশের বিশাল এলাকাজুড়ে জিনজিয়াং প্রদেশে তাদের বসবাস। তারা এখানে প্রায় চার হাজার বছর ধরে বসবাস করে আসছে। বর্তমানে উইঘুররা চীনের ৫৬টি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বা উপজাতির মধ্যে একটি। তাদের অধিকাংশই মুসলিম।

উইঘুররা যেভাবে মুসলিম হলো

ইবনে কাসিরের সূত্র ধরে ইমাম তিরমিজির বয়ানে আমরা জানতে পারি প্লাবন পরবর্তী সময়ে নূহ (আঃ) এর তিন পুত্রের মাধ্যমে দুনিয়ায় আবার মানব বসতি শুরুর কথা। তিন পুত্র সাম, হাম আর ইয়াফেস ছড়িয়ে পড়েন তিনটি ভিন্ন অঞ্চলে। সাম আরবে, হাম আফ্রিকায় আর ইয়াসেফ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া তথা খোরাসান ও হিন্দুস্তানে। ইয়াফেসের ছিল ৮ পুত্র। তুর্ক, খাজার, সাকলাব, রাস, মিং, চিন, কেমেরি এবং তারিখ। পিতার পছন্দে প্রথম সন্তান 'তুর্ক' এর নামানুসারে সমগ্র অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠির নাম ঠিক হয় তুর্ক বা তুর্কি। পিতা ইয়াফেসের পর পুত্র তুর্কই হাল ধরেন সাম্রাজ্যের।

এরপর বংশ পরম্পরা অনুযায়ী শাসন চলতে থাকে। তুর্ক তার পরবর্তী কর্ণধার ঠিক করে যান ইসিক কুলকে। ইসিক কুল ঠিক করে যায় তুতেককে। এর চার প্রজন্ম পরে আসে তাতার এবং মঘুল বা মোঘল। তাতার ও মঘুলরা সাম্রাজ্যকে দুইভাগ করে নেন নিজেদের মধ্যে। মঘুল খান থেকে সাম্রাজ্যের ভার আসে কারা খানের কাছে। কারা খান থেকে ওঘুজ খানের কাছে।

ওঘুজ খানকে নিয়ে অনেক রূপকথা প্রচলিত আছে তুর্কিদের মধ্যে। বলা হয়ে থাকে, জন্মের পরই কথা বলতে শুরু করে শিশু ওঘুজ। শুধু তাই

নয়, অবিশ্বাস্য গতিতে ওঘুজের শারীরিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। মাত্র চল্লিশ দিন বয়সে পরিপূর্ণ যুবকে পরিণত হয় ওঘুজ। সেসময় রাজ্যে এক ভয়ানক ড্রাগনের হামলা সবাইকে আতঙ্কিত করে তোলে। মোকাবেলা করার কেউ নাই। ওঘুজ এগিয়ে আসে। একাই বীর দর্পে হরিণের ফাঁদ পেতে হত্যা করে ড্রাগনটিকে। এরপর থেকে ওঘুজ সবার চোখের মনিতে পরিণত হয়। জনগণের ভালোবাসার সুযোগে ওঘুজ তার বাবাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। সেক্যুলার ইতিহাসবিদদের এই বর্ণনার বিপরীতে শক্তিশালী একটি বর্ণনাও প্রচলিত আছে তুর্কিদের মধ্যে। নবীপুত্র ইয়াসেফের আদর্শ অনুযায়ী সাম্রাজ্য পরিচালিত হচ্ছিল। কিন্তু কারা খান তাতে ব্যত্যয় ঘটান। কারা খান নূহ নবীর আদর্শ তথা ইসলাম থেকে বিচ্যুত হন। ওঘুজ খান পিতার মৃত্যুর পর সে আদর্শের পুনর্জীবন দান করেন। ওঘুজ খানের জন্মের পর তার মা পরপর তিনদিন স্বপ্ন দেখেন যে, ওঘুজ তাকে বলছে মুসলমান হবার জন্য নচেৎ সে মায়ের দুধ পান করবে না। তখন তার মা ইসলামী আদর্শে দিক্ষীত হন। আবুল গাজি নামের একজন তুর্কি লেখকের এই লেখা তুর্কি সমাজে বেশ সমাদৃত। তবে ওঘুজ খান যে মধ্য এশিয়ার তুর্কি জাতিগোষ্ঠির কাছে এখনো একজন বীর যোদ্ধা ও কিংবদন্তি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তুর্কমেনিস্তানের একটি মুদ্রায় তার ছবি প্রকাশের মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালের ১ নভেম্বর তুর্কেমেনিস্তান তাদের এক মানাত বা ৫০০ রাশিয়ান রুবেলের সমান মূল্যের মুদ্রায় মহান শাসক ওঘুজ খানের বীরোচিত ছবিটি প্রকাশ করে।

ওঘুজ খানের ছিল ৭ পুত্র ও ২৪ নাতি। তার মৃত্যুর পর সন্তানদের কেউ কেউ নাতিপুতিদের নিয়ে নতুন কোন স্থানে নিরিবিলি বসবাসের জন্য বেরিয়ে পড়ে। মঙ্গোলিয়ার বিশুষ্ক তৃণভূমি থেকে নেমে তারা মধ্য এশিয়া ও ইউরোপের দিকে পা বাড়ায়। তাদের একটি অংশ থেকে যায় মঙ্গোলিয়া থেকে তিব্বতের আগের পাহাড়ি উপত্যকা অঞ্চলে। তারিম নদীর পানি আর দক্ষিণ পশ্চিম থেকে আসা হিমালয়ের শিনশিন বাতাসের স্পর্শ এই অঞ্চলকে করে তোলে মোহনীয়। পরিণত করে শান্তির আবাসে। সেই মাটিতে পা রাখে ওঘুজের একটি প্রজন্ম। শান্ত, সৌম্য সেই প্রজন্ম বসতি স্থাপন করে।

স্রোতস্বিনী তারিমের জলস্রোত বয়ে চলে। নিরবে গড়ে উঠে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল। হঠাৎ একদিন সেখানে শোনা যায় একদল ঘোড়সওয়ারের খুরের আওয়াজ। পশ্চিম থেকে আগত সওয়ারীরা একটি আদর্শের পতাকাবাহী। এই মহান ঘোড়সওয়ারদের সিপাহসালার ছিলেন এক কিংবদন্তী। ইতিহাসের পাতায় স্বর্নাক্ষরে লেখা তার নাম কুতাইবা বিন মুসলিম। দীর্ঘ একহারা গড়নের এই সেনাপতির নেতৃত্বে পূর্ব তুর্কিস্তানের মাটিতে সেটাই ছিল প্রথম কোন মুসলিম বাহিনীর পদার্পণ।

নতুন আদর্শের বাণী শীতের শুষ্কতা শেষে বর্ষার বৃষ্টির মতোই ওঘুজ বংশধরদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। নতুন জীবনব্যবস্থা আর ধর্মীয় রীতিনীতি শিখতে ঘরেঘরে শুরু হয় আনন্দময় ব্যস্ততা। জীবনের মানে পাল্টে যায় তাদের। জীবনধারাও তাই পাল্টে যেতে থাকে ধীরে ধীরে। কিন্তু কুতাইবার মৃত্যু এতে ছন্দপতন ঘটায়। সেনাপতির শাহাদাতের পর মুসলিম সৈন্যদলের বেশিরভাগ সেনারাই চলে যায় নিজ মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে। নতুন ইসলামে শামিল হওয়া ওঘুজ বংশধররা আর রয়ে যাওয়া সেনারা থাকতে লাগল সেখানে। তারা সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও থাকতে লাগল "একতাবদ্ধ" হয়ে। যেন তাদের এই একতাবদ্ধ অবস্থাকে নির্দেশ করতে লাগল তাদের পরিচয়। তারা "উইঘুর"।

কুতায়বা বিন মুসলিম খলিফা ২য় ওয়ালিদের সময়ে পারস্য ও পারস্যের পূর্বাঞ্চল অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন। ইতিহাসের চাকা তখন সপ্তম শতকের শুরুটা পার হচ্ছিল। সালের হিসেবে ৭১০-১৫ সাল। তবে চীনমুখি যাতায়াত শুরু হয়েছিল কিন্তু বহু আগেই। সেই উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে। সে সময় চীনে মুসলমানদের ব্যবসায়িক যাত্রা শুরু হয়। দ্বিতীয় উমর নামে খ্যাত খলিফা উমর ইবনু আব্দুল আজীজের শাসনকাল শুরুর ঠিক দুই বছর আগে বর্তমান চীনের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মুসলিম জনগোষ্ঠী উইঘুরদের ইসলাম পালন শুরু হয়।

উইঘুর মুসলিমদের সংগ্রামধারা

উইঘুররা একতাবদ্ধ এবং ছোট; কিন্তু একদল সাহসী মানুষের খানাত। (খানাত বা খাগানাত একটি তুর্কি উদ্ভূত শব্দ, যা খান শাসিত একটি

রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। আধুনিক তুর্কি ভাষায় শব্দটি কাগানলিক বা হানলিক নামে এবং মোঙ্গলীয় ভাষায় খানলিগ নামে ব্যবহৃত হয়।)

৭৫৬ সাল থেকে এই খানাতের প্রথম ভাঙ্গন শুরু হয়। ৭৫৫ সালে চীনের আন লু শান নামের জেনারেল বিদ্রোহ করে বসেন। নিজের অধীনে থাকা অঞ্চলকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। চীনের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকতে অস্বীকৃতি জানালেন। চীনের সম্রাট জানতেন যে এ অঞ্চলে তাদের সেনাবাহিনী সংখ্যায় বেশি হয়েও সুবিধা করতে পারবে না। কারণ, এখানকার মাটি, পানি, বাতাস সবকিছুই থাকবে আন লু শানের সেনাবাহিনীর পক্ষে।

চতুর সম্রাট সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন উইঘুর খানাতের উদ্দেশ্যে। বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে খানাত গ্রহণ করল সম্রাটের সন্ধি প্রস্তাব। আন লু শানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন তাঁরা। যুদ্ধে আন লু শান পরাজিত হলেন। আর তখনই প্রকাশ পেল সম্রাটের আসল চেহারা। সম্পূর্ণ এলাকার উপরই নিজের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইলেন তিনি। আর তাই নিজের বিশাল সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিলেন উইঘুর খানাতের বিরুদ্ধে।

বীরের মতো লড়েও সংখ্যাধিক্যের কাছে পরাজিত হলো উইঘুররা। ক্রমেই পিছনে সরে আসতে আসতে শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা উইঘুররা প্রবেশ করলেন কোচো রাজত্বে। শুরু হলো তাঁদের টিকে থাকার লড়াই। ১০০৬ সালে এলেন তুর্কী বীর ইউসুফ কাদির খান। পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলো মুসলিম সালতানাত "কারা খানিদ খানাত"। তবে এবার আরব আধিপত্যে নয়; তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হলো। এই সালতানাত শাসন করে গেছেন সাতুক বুঘরা খানের তো তুর্কী-উইঘুর বংশোদ্ভূত সুলতানরা।

১৮ শতকের শেষের দিকে কিং রাজারা জুনগড় এবং তারিম উপত্যকার পূর্বাঞ্চল দখল করার মাধ্যমে স্বাধীন উইঘুর সাম্রাজ্যকে নিজেদের অধীনে নিয়ে নেয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা উইঘুরদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে তারা কখনো দমিয়ে রাখতে পারেনি। ইয়াকুব বেগের নেতৃত্বে তারা আবার সংগঠিত হয়ে স্বাধীন কাশগরিয়া রাষ্ট্র গঠন করে। এই কাশগরিয়া রাষ্ট্রকেই আধুনিক পূর্ব তুর্কিস্তানের ভিত্তি ধরা হয়। ইয়াকুব বেগকে মহান নেতা হিসেবে শ্রদ্ধার সাথে আজো স্মরণ করা হয়।

ইয়াকুব বেগ ছিলেন তাসখন্দের মানুষ। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাসখন্দের স্বাধিকার আন্দোলনরত বাহিনীর হয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার রয়েছে।

তাসখন্দ সমরকন্দ বর্তমান স্বাধীন উজবেকিস্তানের অংশ। উজবেক সীমান্ত পেরিয়ে কোকান্দ। কোকান্দের পর কাশগড়। রাশিয়া তাসখন্দ দখল করে নিলে ইয়াকুব বেগ তার বাহিনী নিয়ে কাশগড়ের দিকে নজর দেন। কিং রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাশগড়ের আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে গড়ে তোলেন স্বাধীন ইসলামি শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র কাশগরিয়া। তুরস্কের উসমানি খলিফা তাকে সমর্থন জানিয়ে আমিরুল কাশগরিয়া উপাধি প্রদান করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও রাশিয়া তাকে প্রথমদিকে সমর্থন দিলেও তার শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি দেখে সমর্থন ফিরিয়ে নেয়।

তার সময়ে আশেপাশের রাজ্যগুলোও তটস্থ থাকতো। নিজ রাজ্যে সংস্কার কার্যক্রম চালানোর পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতেও তিনি নজর রাখতেন। নিজ রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। খোতান, ইরখান্দ, আকসু, কুচা, তুরসান ইত্যাদি অঞ্চলগুলো অধিকার করেন। উরামকি বেশ কয়েকবার আক্রমণ করেন। কাশগড়সহ বিজিত প্রতিটি অঞ্চলে অসংখ্য মসজিদ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করেন। অবশেষে ১৮৭৭ সালের ২২ মে তিনি ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যু নিয়ে কিছুটা ধোয়াশা রয়েছে। কেউ বলেন, তাকে কিং রাজা ষড়যন্ত্র করে নিকট কারো মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। কেউ বলেন তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আবার চীন ও রাশিয়াপন্থি গবেষকরা তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন বলেও প্রচার করে। তবে মৃত্যু যেভাবেই হোক তার মৃত্যুর পরপরই চীনের কিং রাজা ও রাশিয়ার জার শাসকরা স্বাধীন ইসলামি রাষ্ট্রটির দখল নিতে উঠে পড়ে লাগে। প্রায় সাত বছরেরও বেশি সময় লড়াই করার পর ১৮৮৪ সালের ১৮ নভেম্বর মাঞ্চু বা কিং রাজা কাশগড়কেন্দ্রিক পূর্ব তুর্কিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্রটি দখল করে নেয়। তার চার ছেলে, চার নাতি নাতনি এবং চার স্ত্রীর সবাইকে বন্দি করা হয়। বিভিন্ন মেয়াদের শাস্তি দিয়ে এগারো বছরের মধ্যে সবাইকে শহিদ করা হয়। ইয়াকুব বেগের বিজয়গাথা ও তেজস্বিতা নিয়ে উইঘুর, তুর্কি কবিরা কবিতা লিখেছেন। এমনকি ইংরেজ লেখকরাও তাকে নিয়ে উপন্যাস গল্প লিখেছেন।

১৯৩৩ সালে আবার এক বিপ্লব সাধিত হয়। উইঘুর মুসলিমরা কাশগড় এবং এর আশেপাশের এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তান রাষ্ট্র। স্বাধীন পতাকা আকাশে ওড়া শুরু করতেই তাঁদের উপর হামলে পড়ে চাইনিজ জেনারেল শেং শি চাই এর নেতৃত্বে চাইনিজ হানরা।

ব্যাপক দমন পীড়ন চালানো হয় উইঘুরদের উপর। আত্মগোপনে চলে যেতে বাধ্য হয় তাদের নেতারা। তবে এটিই ছিল শতভাগ শরিয়াভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ প্রচেষ্টা। এরপর আন্দোলন সংগ্রাম হয় উইঘুর জাতীয়তাবাদ ও সেক্যুলার আদর্শের।

উইঘুর নেতা আব্দুল আজিজ মাখদুম, আব্দুল হাকিম মাখদুম প্রমুখ মিলে ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি। গোপনে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকেন তাঁরা। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৪৪ সালে তিয়েনশান পর্বতমালার ওপারে ঘুলজা এবং এর আশেপাশের অঞ্চলে আবারো বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন পূর্ব তুর্কিস্তান। তিয়েনশানের পাহাড়ী দেয়াল প্রাকৃতিক ভাবেই সুরক্ষিত রেখেছিল উইঘুর মুসলিমদের এই নতুন পূর্ব তুর্কিস্তানকে।

১৯৪৯ সাল। চীনের গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির বছর। পূর্ব তুর্কিস্তানকে বৃহত্তর চীনের সাথে একত্রিত হওয়ার প্রস্তাব দেয়। অঙ্গীকার করা হয় উইঘুরদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তাঁদের ইতিহাস চর্চার সুযোগ দেয়ার। একদিকে কমিউনিস্ট রাশিয়া অন্যদিকে কমিউনিস্ট চীন। যে কোন সময় এই দুই শক্তির মাঝে থাকা পূর্ব তুর্কিস্তান আক্রমণের শিকার হতে পারে। রাশিয়ার চেচেন মুসলিমদের দুর্ভাগ্যজনক উদাহরণ ছিলও তাদের সামনে। তথাপি আব্দুল হাকিম মাখদুম এবং তাঁর অনুসারীরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু একটা অংশ যুদ্ধের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়।

চীন সরকার পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করে ১৯৪৯ সালের ১৩ অক্টোবর। ১৯৫০ সালের ৩০ জানুয়ারি আব্দুল হাকিম ও সাইয়েদুল্লাহ উইঘুরদের নিয়ে কুমুল জেলার আরাতুরুক এলাকায় 'দখলদার বিরোধী বাহিনী' (এন্টি-অকুপেশন গ্রুপ) তৈরি করেন। চীনা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ৫০০ জনেরও বেশি উইঘুর শহিদ হয়। এসময় কালবেগ নামের একজন কাজাখ নেতা বিশাল সংখ্যক উইঘুর ও কাজাখ যোদ্ধা নিয়ে আরেকটি বাহিনী গঠন করে যুদ্ধ করেন কিন্তু প্রায় দুই হাজার লোক শহিদ হলেও বিজয়ী হওয়া কিংবা কোন ইতিবাচক ফল আনতে ব্যর্থ হন।

১৯৫০ সালের এপ্রিলে কুমুলে প্রায় ২০ হাজার লোক মিলে ওসমান বাতুরের নেতৃত্বে চীনা দখলদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশ থেকে গেরিলা যুদ্ধের ডাক দেওয়া হয়। গেরিলা যুদ্ধ দুই বছর স্থায়ী ছিল। এতে কয়েক হাজার লোক শহিদ হন। ১৯৫৩ সালে বেশ

কয়েকটি বাহিনীর নেতৃত্বে লড়াই সংগ্রাম, প্রতিবাদ সমাবেশ চলতে থাকে। এসময় চীনা সরকার জেনারেল ওয়াং ঝেনকে পাঠায় পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। জেনারেল ঝেং এসেই ব্যাপক ধরপাকর, নির্যাতন চালায়। শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন ইসলামি ব্যক্তিত্বকে ফাঁসিতে ঝোলায়। চেংগিস খান দামুল্লা, আসাদুল্লাহ দামুল্লা, আব্দুল আজিজ মাসুম তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। (দামুল্লা মানে ইসলামি স্কলার)।

আব্দুল হামিদ দামুল্লা ও পাথিদিন মাসুম ১৯৫৪ সালে 'পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক লিবারেশন পার্টি' গঠন করেন। তারা হামলা করে একটি চীনা কারাগার দখল করে নেয় এবং বিশাল সংখ্যক কয়েদিকে মুক্ত করেন। তারা আরো হামলার প্রস্তুতি নেয় কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হোতান শহরের পুরো দখল নিতে ব্যর্থ হয়। ফলে চীনা বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ করে ধরাশয়ী করে ফেলে। ৬ বছর লড়াই চলার পর চীনা কমিউনিস্ট বাহিনী পুরো উইঘুর এলাকা দখল করে নেয় ১৯৫৫ সালের ১ অক্টোবর। চীনাদের প্রস্তাবে সেক্যুলার যেসব নেতা রাজি হয়েছিলেন তাদেরকেও শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। সে হত্যাকাণ্ড ছিল অভিনব। কাউকে রাজনৈতিক আলোচনার কথা বলে ডেকে নিয়ে রাতের আঁধারে, কাউকে গুম করে। আর শীর্ষ পর্যায়ের কিছু নেতাকে বিমান দুর্ঘটনার মাধ্যমে। আর কারাগারের গোপন কুঠুরিতে যে কতজন মারা গেছে তার কোন সঠিক হিসাব জানা যায় না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব পোষণ করায় গ্রেপ্তার হন আব্দুল হাকিম মাখদুম। অধিকৃত নতুন এই প্রদেশের নামকরণ করা হলো জিনজিয়াং। উইঘুররা ভেবেছিল চাইনিজ সরকার তাদের সাথে করা অঙ্গীকার পালন করবে। চাইনিজ সরকার উইঘুরদের সাথে করা অঙ্গীকার পালন করা দূরে থাক, তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর এক জাতীয়তার ধোঁয়া তুলে উইঘুরদের উপর ব্যাপক দমন পীড়ন শুরু করে। হত্যা করা হয় হাজার হাজার উইঘুরকে। চায়নার অন্যান্য প্রদেশ থেকে বিপুল পরিমাণ হান জনগোষ্ঠীর লোকদের নিয়ে এসে পুনর্বাসিত করা হয় উইঘুর এলাকায়। ফলে ধীরে ধীরে জনসংখ্যার দিক থেকেও উইঘুররা কোণঠাসা হয়ে পড়তে থাকে।

১৯৫৬ সালের মার্চে বাকি দামুল্লা এবং সামাদ দামুল্লা হোতান শহরের কারাকাশ অঞ্চলে উইঘুরদের একটি বাহিনী গঠন করেন। চীনা বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে তাদের প্রায় ৮০০ লোক শহিদ হয়। একই সালের মে মাসে

আব্দুল কাদের প্রায় ১৩০০ উইঘুর নিয়ে হোতান শহরের লোপ অঞ্চলে এ বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। চীনা সরকার নিষ্ঠুরভাবে সে সমাবেশ দমন করে।

উইঘুরদের আরেকটি বাহিনী ১৯৫৭ সালে উরামকি ও উলানবেতে চীনা দখলদারিত্বের মোকাবেলায় গোপনে প্রস্তুতি নেবার আয়োজন করে। গুপ্তচরের মাধ্যমে চীনা বাহিনী খবর পেয়ে হামলা করে সবাইকে গ্রেপ্তার, নির্যাতন করে জেলে ভরে। একই বছর হাজিদিহান বা খাদিজা নামের একজন মহিলার নেতৃত্বে হোতানের হান এরিক অঞ্চলে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে।

১৯৫৮ সালে বাকি দামুল্লা ও সামাদ দামুল্লা হোতান শহরে কৃষকদের নিয়ে চীনা দখলদারিত্বের প্রতিবাদ করে। একই বছরের সেপ্টেম্বরে জামিশকান ও দালিলিহান ককতুকায় প্রদেশের আলতায় অঞ্চলে প্রতিবাদ সমাবেশ করলে চীনা সরকার তাদের ওপর নিষ্ঠুর হামলা চালায়। অক্টোবরে আলি কুরবান ও শেখ সাঈদ আবারো কুমুলে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে। সাত হাজার লোকের সমাবেশকে চীনা সরকার নিষ্ঠুরভাবে দমন করে।

১৯৬৯ সালে 'ইস্ট তুর্কিস্তান পিপলস পার্টি' একটি প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করে। গুপ্তচরের মাধ্যমে সমাবেশের কথা আগেই জেনে হামলে পড়ে চীনা বাহিনী। প্রায় ৩২ হাজার 'ইস্ট তুর্কিস্তান পিপলস পার্টির' সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি সাজাসহ বহুলোকের ফাঁসি দেওয়া হয় এসময়। পার্টির একটি অংশ সশস্ত্র লড়াইয়ের ডাক দেয় সে বছরই। ফলে পূর্ব তুর্কিস্তানের দক্ষিণাংশের তাকলামাকান মরুভূমিতে চীনা বাহিনীর সাথে তুমুল লড়াই হয়। লড়াইয়ে সবাই শাহাদাত বরণ করেন।

প্রায় ২০০ পূর্ব তুর্কিস্তান পার্টির সদস্য সরকারি বাহিনীর ওপর হামলা করে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুট করে ২৭ মে ১৯৮১ সালে। কিন্তু পরবর্তীতে নিজেদের গাদ্দারিতে সরকারি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার এবং নিহত হয়।

১৯৮৫ সালের ১২ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা উরামকিতে ৬ দফা দাবিতে বিশাল সমাবেশ করে। সমাবেশে আকসু, হোতান ও কাশগড়সহ পুরো পূর্ব তুর্কিস্তান হতে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

তাদের ৬ দফা দাবি ছিল–

১. গণতান্ত্রিক অধিকার অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রদান।
২. পূর্ব তুর্কিস্তানে পারমানবিক বোমার পরীক্ষা চালানো বন্ধ করা।
৩. হান চাইনিজদের পূর্ব তুর্কিস্তানে অভিবাসন বন্ধ করা।
৪. জিনজিয়াংয়ে সত্যিকারের স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা।
৫. মুসলিম পরিবারের জন্য পরিবার পরিকল্পনা বন্ধ করা।
৬. নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

১৯৮৮ সালের জুন মাসে চীনা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা আবারো তাদের দাবী আদায়ে উরামকিতে জড়ো হয়। প্রায় ৪০০০ হাজার শিক্ষার্থী চীনের নৃগোষ্ঠির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদ করে।

পরের বছরের এপ্রিল ও মে মাসে শিক্ষার্থীরা আরো গণতান্ত্রিক আচরণের দাবি জানিয়ে সমাবেশ করে। এর দেখাদেখি উরামকিতে উইঘুরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরাও চীনা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে সমবেশ করে। একই বছরের মে মাসে জিনজিয়াং ইসলামিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা উরামকিতে 'সেক্স এন্ড ট্রেডিশন' বইয়ের প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক দেয়। সরকারি সহযোগিতায় একজন চাইনিজ বইটি লিখেছিল। বইটিতে মুসলিমদের বিয়ে ও ঐতিহ্যবাহি রীতিনীতির সমালোচনা করা হয়। শান্তিপূর্ণ এ সমাবেশ থেকেও প্রায় ৩০০ ছাত্রজনতাকে গ্রেপ্তার করে চীন সরকার।

শাইখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ কয়েকশত কৃষক নিয়ে চীনা সরকারের দমন নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন ১৯৯০ সালের মে মাসে। যথারীতি কোনরকম উষ্কানি ছাড়াই চীনা বাহিনী কৃষকদের উপর হামলা করে। কৃষকরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সরকারি বাহিনীর অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। ফলে ছোটখাট যুদ্ধ বেধে যায়। বেশ কয়েকদিন সে যুদ্ধ চলে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে পুরো গ্রাম তছনছ করে দেয় চীনা সরকারি বাহিনী। শায়খ ইউসুফ কয়েকশত উইঘুর কৃষকসহ এ যুদ্ধে শহিদ হন। এর আগে ১৯৮৮ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি। তাঁর গুরু ছিলেন ১৯৮০ সালে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া আব্দুল হাকিম মাখদুম। বৃদ্ধ মাখদুম দেখলেন নতুন করে চাইনিজ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার শারীরিক শক্তি তাঁর আর নেই। কিন্তু হার মানলেন না তিনি বরং প্রচার করতে থাকেন তাঁর আদর্শ। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাতে থাকেন তাঁর হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্রকে। তাদেরই একজন ছিলেন এই জিয়াউদ্দিন ইউসুফ।

চীনা সরকার হোতান প্রদেশের একজন উইঘুর শীর্ষ আলেম আবলেত মাসুমকে গ্রেপ্তার করে ১৯৯৫ সালে। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে সাধারণ জনগণ। সাধারণ মানুষের সেই সমাবেশকে নির্মমভাবে দমন করে কমিউনিস্ট সরকার।

পরের বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি আকসু প্রদেশে চীনা সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সমাবেশের ডাক দেন আহমাদজান হামুত। প্রকাশ্যে গণহত্যা চালায় চীনা সরকার। উইঘুরদের লাশগুলো তাকলামাকান মরুভূমির তারিম রোডের পাশে গণকবর দিয়ে দেয় সরকারি বাহিনী।

১৯৯৭ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এক হাজারেরও বেশি উইঘুর চীনা সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সমাবেশের আয়োজন করে ঘুলজা শহরে। চীনা পুলিশ প্রকাশ্যে গুলি করে সমাবেশে। এতে ঘটনাস্থলেই প্রায় ৫৬০ জন প্রতিবাদী জনতা নিহত হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে চীনা পুলিশ প্রায় ৭৫ হাজার উইঘুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এবং ৪০০০ হাজার জনকে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেয়।

শাইখ ইমিন হাশিমের নেতৃত্বে চীনা পুলিশের সাথে উইঘুরদের একটি দলের সংঘর্ষ বাধে ১৯৯৮ সালে। আকসু প্রদেশের কারাতাঘ পর্বতের পাদদেশে ইমিন হাশিমকে তার ৯ সহযোগীসহ হত্যা করা হয়। বাকিদের জেলে ভরা হয়।

এভাবে দেখা যায় স্বজন হারিয়ে, গুম-খুনের শিকার হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয় অসংখ্য উইঘুর। কিন্তু তাঁদের পালানোর পথটাও সহজ ছিল না। বহির্বিশ্বের কাছে নিজেদের ক্লিন ইমেজ ধরে রাখার জন্য চায়না এই দেশত্যাগরত উইঘুরদের উপরও হামলা চালায়। তাঁদের বাঁধা দেওয়া হয় দেশত্যাগে। যাঁরা পালাতে পেরেছিলেন, তাঁরা এক অর্থে বেঁচে যান। কারণ, রয়ে যাওয়া উইঘুরদের উপর কমিউনিজম চাপিয়ে দেয়া শুরু করে চীন। তাঁদের ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। তাঁদের বাকস্বাধীনতা হরণ করা হয়। সর্বোপরি তাঁদের উইঘুর জাতিসত্তাবোধ মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবাদ করলেই হয় গুম-খুন, নতুবা উদ্বাস্তু হতে হয় তাঁদের। এভাবেই উইঘুররা সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা রক্ষার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে যে ভুল করেছিল তার মাশুল দিতে থাকে।

চীনের (৯২/৯৩ সালের দিকে) সংশোধিত নীতিমালার ফলে উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল হয়। কিন্তু এখনো তাঁদের স্বাভাবিক অধিকারটুকুও নিশ্চিত হয়নি। জিনজিয়াং-এ এখনো বাইরে থেকে এনে হানদের অবৈধ বসতি স্থাপন চলছে। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করা হলেই রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদকারীকে প্রহসনমূলক বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে।

১৯৯৭ সালের ঘুলজা ট্রাজেডির পর বর্হিবিশ্বে অবস্থানরত উইঘুরদের ওপর নজরদারি জোরদার করে চীনারা। দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-পরিজনদের সাথে দেখা করতে বাঁধা দেওয়া হয় এমনকি যারা বিদেশে রয়েছেন তাদের আত্মীয়দের গ্রেপ্তার করে কারাবন্দি, নির্যাতন করা হয়। যুগের পর যুগ এভাবে নির্যাতনের ফলে ৯০ ভাগ উইঘুর জনসংখ্যা নেমে আসে ৪৮ ভাগে। নিজভূমি পূর্ব তুর্কিস্তান বা জিনজিয়াংয়েই আজ তারা পরবাসী।

আঠারো বছরের আগে কোন উইঘুর মুসলিম মসজিদে যেতে পারে না। সম্মিলিতভাবে কোরআন, হাদীস কিংবা অন্য কোন ইসলামী জ্ঞান চর্চা করা নিষিদ্ধ। উইঘুর মুসলমানরা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাঁধার মুখে পড়ছে। পবিত্র রমযান মাসে সরকারি কর্মচারীরা রোযা রাখতে পারে না, কেউ যদি রোজা রাখে, তাকে রোজা ভাঙতে বাধ্য করা হয়। কলেজ ছাত্রদের অবশ্যই সাপ্তাহিক রাজনৈতিক শিক্ষাক্লাসে যোগ দিতে হয় এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্মকর্তারা মাদরাসাগুলোতে যখন ইচ্ছা হানা দিতে পারে।

সবচেয়ে বেশি উসকানিমূলক পদক্ষেপ হচ্ছে, নারীদের হিজাব ব্যবহার করা ও পুরুষদের দাড়ি রাখার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান। যেসব ট্যাক্সিচালক বোরকা পরা নারীদের গাড়িতে নেয় তাদের মোটা অংকের জরিমানা করা হয়। হিজাব পড়া নারীদের চিকিৎসা সেবা দিতে ডাক্তারদের নিষেধ করা হয়। ধর্মীয় স্থাপনাগুলো সার্বক্ষণিক থাকে তাদের গোয়েন্দা নজরদারিতে। নামাজ পড়ার কারণে চাকরি চলে গেছে, এরকম অসংখ্য নজির আছে জিনজিয়াংয়ের উইঘুর জনপদে। চাকরির ক্ষেত্রেও উইঘুর মুসলমানরা চরম বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। যা সাম্প্রতিক সময়ে পরিচালিত বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক জরিপ থেকে বোঝা যায়।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে উইঘুর মুসলিমদের প্রতি চীন সরকারের নীতির কঠোর সমালোচনা করে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (২০১৮) বলেছে, ২০০৯ সালের দাঙ্গার পর সরকারের সমালোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে মতামত প্রকাশের দায়ে চীন সরকার গোপনে বেশ কয়েকজন

উইঘুর মুসলিম বুদ্ধিজীবীর বিচার করেছে। চীন সরকারের কঠোর মিডিয়া নীতির কারণে এসব সংবাদ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আসতে পারে না। উইঘুর মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের গ্রেপ্তার ও হয়রানি করার মাধ্যমে তাঁদের সর্বদা মানসিক চাপে রাখা হচ্ছে।

বিগত ১৭ বছরে অন্তত ৮টি বড় রকমের হামলার খবর প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা যায় হান বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর দ্বারা হামলার শিকার হয়েছে উইঘুর মুসলিমরা। আশ্চর্যজনকভাবে এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে বিদেশে অবস্থানরত নগণ্য সংখ্যক উইঘুর মুসলিম এক্টিভিস্টদের। আর এভাবেই প্রতিনিয়ত নিপীড়নের মাধ্যমে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে উইঘুরদের আজাদী আন্দোলনের দাবি।

চীনা সরকারের কঠোর দমননীতির কারণে তারা বাধ্য হয়েছে বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাতে। এমনকি বিদেশে থেকে নিজেদের মাতৃভূমিতে রেখে যাওয়া বাবা-মা, ভাইবোন, স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না। বর্তমানে উইঘুর মুসলিমরা সবচেয়ে বেশি আশ্রয় পেয়েছে তুরস্কে। তুরস্ক, মিশর, জার্মানী ও আমেরিকায় আশ্রয় নিয়ে নির্বাসিত উইঘুররা তাদের স্বাধীনতা অর্জন তথা পূর্ব-তুর্কিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। নিজেদের দাবীর পক্ষে সভাসমাবেশ, স্মারকলিপি, গণসংযোগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

কুতায়বা বিন মুসলিম; যার হাতে মুসলিম হন উইঘুররা

৬৬৫ সালে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ইতি টানা হলেও ইতিহাসের লাগাম তখন মুসলিম সেনাপতিদের হাতেই। ৬৮০ সালে কারবালার প্রান্তরে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে যদিও নবী-নাতি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে যান তদুপরি বিশ্বের দিকে দিকে কালেমার পতাকাবাহী ছুটন্ত ঘোড়াগুলো দোর্দন্ড প্রতাপে ছুটে চলছিল তখনো। মুসলিম জাহানের খলিফা তখন উমর ইবনে আব্দুল আজীজ তথা দ্বিতীয় উমর (৭১৭-৭২০ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলামের বাণী প্রচার আরো গতি পায় তার সময়ে। যদিও তার আগেই একেকজন সেনাপতি বেড়িয়ে পড়েছিল একেকটি বাহিনী নিয়ে। কুতাইবা ইবনে মুসলিম ছিলেন সেসব দিগ্বিজয়ী সেনাপতিদেরই একজন।

সমরকন্দ পুরোটা জুড়ে ছিল নগররক্ষা দেয়াল। একবার তিনি অকস্মাৎ সমরকন্দ আক্রমণ করে সমরকন্দবাসীদের অবরুদ্ধ করে ফেলেন।

সমরকন্দবাসীরা ইতোপূর্বে চীন ও ফারগানার শাসকদের সাথে মিত্রতা তৈরি করে মুসলিমদের সাথে লড়াই করে আসছিল। এবার তারা অসহায় অবস্থায় তাদের কাছে নিজেদের জন্য সাহায্য চায়। চীনের অধিপতির নেতৃত্বে একটা বিশাল বাহিনী আরবদের মোকাবেলায় এগিয়ে আসে। তাদের পরিকল্পনা ছিল, রাতের আঁধারেই মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করবে। কিন্তু কুতাইবা এই কৌশল বুঝতে পেরে সালেহ বিন মুসলিমের নেতৃত্বে ৬০০ জনের বাহিনী প্রেরণ করেন। ডানে ও বামে মাত্র ২০০ জন করে ৪০০ জন এবং সম্মুখে ২০০ জনের শিবির স্থাপন করে সৈন্য মোতায়েন করেন, যাতে শত্রু সৈন্যের উপর তিন দিক থেকে হামলা করা যায়। এই কৌশলে চীন ও ফারগানার সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় সামনে পেছনের উভয়দিকের আক্রমণে ভীত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

ইতোমধ্যে অবরোধ একমাস অতিক্রান্ত হয়। সাহায্যকারী বাহিনীর পরাজয়ে সমরকন্দবাসীর মনোবল ভেঙে পড়ে। মুসলিম বাহিনীও কামানের সাহায্যে নগরের প্রতিরক্ষা প্রাচীরে পাথর নিক্ষেপ শুরু করে। ফলে সমরকন্দবাসী সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। কুতাইবা ও সমরকন্দের শাসকদের মধ্যে তিন শর্তে সন্ধি হয়।

১. সমরকন্দবাসী ২২ লক্ষ দিরহাম কর প্রদান করবে।

২. মন্দির, মূর্তি এবং অগ্নিপূজকদের অগ্নিকুণ্ডের ব্যাপারে মুসলমানদের অধিকার থাকবে।

৩. মুসলমানগণ মসজিদ নির্মাণ করবে এবং নামাজ পড়বে, মুসলিম সৈন্যদের তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারি করা হবে। এরপর মুসলমানগণ শহরে প্রবেশ করেন।

সমরকন্দ হচ্ছে উত্তর এশিয়ার এমন ভূমি যা সিল্ক রোডের সংযোগস্থল হওয়ায় ধনী অঞ্চল ছিল। প্রচুর সোনা ও রূপার মতো মূল্যবান খনিজসমৃদ্ধ অঞ্চল এটি। মন্দিরগুলোও সমৃদ্ধ ছিল। অনেক মূর্তি ছিল সোনার। সন্ধির শর্তানুযায়ী কুতাইবা এগুলো গলানোর নির্দেশ দিলেন। সমরকন্দবাসীরা বললো- আমরা এগুলো না জ্বালানোর পরামর্শ দিচ্ছি। নতুবা আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। কুতাইবা বললেন, তোমাদের বিশ্বাস যদি এই হয়, তবে আমি তা নিজ হাতে প্রজ্জ্বলন করছি। এরপর মূর্তিগুলো থেকে ২৫০০ মণ স্বর্ণ পাওয়া গেল। নিজেদের উপাস্যদের এমন অবস্থা দেখে সমরকন্দবাসীদের অনেকেই মুসলিম হয়ে গেল।

এটা ছিল ৭১২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা। মুসলিম বিশ্বের খলিফা ছিলেন তখন দ্বিতীয় ওয়ালিদ। এর পাঁচ বছর পর উমর ইবনে আব্দুল আজিজ মুসলিম জাহানের খলিফা হন। তখন সমরকন্দের প্রধান পুরোহিতের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি তাঁর নিকট যান। খলিফা তখন নিজের ঘরের দেয়াল নিজ হাতে মেরামত করছেন। সেই ব্যক্তি প্রবল বিস্মিত হন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইসলামের যুদ্ধনীতি কি এটাই নয় যে, তারা যখন কোনও দেশ দখল করতে চায় প্রথমে তাদের ইসলামের আহ্বান জানায় কিংবা তাদেরকে করের শর্তে বশ্যতার আহ্বান জানায় এবং সে দেশের মানুষ এই দুইয়ে সম্মত না হয়, তখনই যুদ্ধের আহ্বান জানায়?' খলিফা বললেন, 'এটাই নিয়ম।' আগন্তুক বললেন, পাঁচ বছর আগে আপনাদের সেনাপতি কুতাইবা আমাদের উপর এসব যুদ্ধনীতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ করে। খলিফা অভিযোগ নথিবদ্ধ করতে নির্দেশ দেন।

একইসাথে সমরকন্দের গভর্নরকে একজন ঈমানদার কাজী তথা বিচারক নিয়োগের নির্দেশ দেন যিনি ফায়সালা করবেন। একইসঙ্গে গভর্নরকে বলেন, তিনি যেন কুতাইবার হয়ে আদালতে শুনানির জন্য হাজির হন। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে কাজী ফায়সালা দেন, যেহেতু ইসলামি যুদ্ধনীতি ব্যাহত হয়েছে তাই সমরকন্দ দখল অবৈধ। মুসলিমগণ শহর হস্তান্তর করে অনতিবিলম্বে সেই পূর্বের সেনাছাউনিতে ফিরে যাবে। অতঃপর পুনরায় যুদ্ধ কিংবা সন্ধি করে শহরে প্রবেশ করবে। এই বিচারে প্রধান পুরোহিত বিস্মিত হন। লোকদের মাঝে ঘোষণা করেন, 'এটা অবশ্যই সত্য ধর্ম'। তিনি এবং অন্য অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সমরকন্দবাসী মুসলিমদের শাসনে থাকাটাকেই পছন্দ করে।

সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিম পুরো খোরাসান অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। খোরাসান অর্থাৎ বর্তমান মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ বিজয় করতেই তাকে পাঠানো হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার দেশ বলতে পারস্যের (ইরান) শেষ ভাগ হতে তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারতের শুরুর ভাগকে বুঝানো হয়। সমরকন্দের দুই পাশে তাজিকিস্তান ও কিরগিজিস্তানের মাঝ দিয়ে সোজা পূর্ব দিকে তুর্কিস্তান।

উইঘুরদের প্রাথমিক ইতিহাস

উইঘুরদের প্রাথমিক বা অতীত ইতিহাসকে আধুনিক ইতিহাসবিদগণ দুই ভাগে ভাগ করেন। একটি প্রাচীন ইতিহাস আরেকটি উইঘুর খাগনাত হবার পরের ইতিহাস।

আবার উইঘুরদের ইতিহাস নিয়ে উইঘুর ইতিহাসবিদ ও চীন সরকারের মধ্যে দ্বিমত দেখা যায়। উইঘুর ইতিহাসবিদদের মতে উইঘুররা জিনজিয়াং অঞ্চলে সুদীর্ঘকাল হতে বসবাস করে আসছে। উইঘুর রাজনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ মুহাম্মেদ ইমিন বুগরা তার A History of East Turkestan বইয়ে তুর্কি বংশোদ্ভূত উইঘুরদের ইতিহাস ৯০০০ বছরের পুরোনো বলে উল্লেখ করেন। আবার উইঘুর ইতিহাসবিদ তুরঘুন আলমাস তারিম মমি (আঠার শতকে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের তারিম অঞ্চলে আবিষ্কৃত অনেকগুলো মমি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে একদল ইউরোপীয় গবেষক মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে উদ্ধারকৃত মমি নিয়ে গবেষণা করে সেগুলোর ইতিহাস-বুৎপত্তি নির্ণয় করার চেষ্টা করে। তাদের মন্তব্য, সেগুলো খ্রিস্টপূর্ব আঠারো শতকের। মমিগুলো এখন জিনজিয়াংয়ের যাদুঘরে সংরক্ষিত।) আবিষ্কারের পর বলেন, উইঘুরদের ইতিহাস ৬৪০০ বছরের।

উইঘুরদের অধিকার ও স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিশ্বব্যাপি কাজ করা সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস' মনে করে তাদের জনপদের ইতিহাস ৪০০০ বছরের পুরোনো।

অন্যদিকে চীন সরকারের বক্তব্য হলো, 'উইঘুররা তিয়েলা গোত্র হতে উদ্ভূত একটি জাতিগোষ্ঠী। যারা ৯ম শতকে উইঘুর খাগনাতের পতনের পর মঙ্গোলিয়া হতে জিনজিয়াংয়ে এসে বসতি গাড়ে। আর উইঘুর খাগনাতের স্থান দখল করে হান গোষ্ঠী; হান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। কালের পরিক্রমায় জিনজিয়াংয়ের প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় উইঘুররা।' যদিও চীনা সরকারের এই বক্তব্যের সাথে একমত নন আধুনিক অনেক ইতিহাসবিদ। তারা এখনকার উইঘুরদের খাগনাতের পতনের পর মঙ্গোলিয়া থেকে আগত উইঘুর বলে মনে করেন না। বরং তারা মনে করেন উইঘুররা এখানকারই আদি অধিবাসী; জিনজিয়াংয়েরই প্রাচীন স্থানীয় জনগোষ্ঠী।

উইঘুরদের ভৌগলিক অবস্থান

উইঘুররা স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তানের অধিবাসী। পূর্ব তুর্কিস্তান প্রাচীন সিল্ক রোডের পাশে অবস্থিত মধ্য এশিয়ার একটি দেশ, যার চতুর্পার্শ্বে চীন, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়ার অবস্থান। উইঘুররা চীনের যে অংশে বাস করছে এটিকে তারা বলে 'আলতিশাহর'। আলতিশাহর বলতে কোন ছয়টি শহরকে বুঝানো হয়েছে তার কোন সঠিক তথ্য জানা যায় না। হতে পারে বর্তমান জিনজিয়াংয়েরই আশেপাশের শহর মিলে এই আলতিশাহর কিংবা হতে পারে পার্শ্ববর্তী অন্যান্য রাষ্ট্র যেমন কাজাকিস্তান, তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া, আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের উইঘুরপ্রধান কিছু অঞ্চল নিয়ে এই আলতিশাহর গঠিত।

কারা খানিদ খানাতে (৮৪০-১২১২)	
রাজধানী	বালাসাগুন, কাশগড়, সমরকন্দ
প্রধান ভাষা	পার্সিয়ান, তুর্কি, আরবি মধ্য চায়নিজ (প্রশাসনিক)
ধর্ম	টেংরিজম (৮৪০-৯৩৪) ইসলাম (৯৩৪-১২১২)
সরকার (খাগান, খান) ৮৪০-৯৩৪ (১ম) ৯৩৪-১২১২ (২য়)	রাজতন্ত্র বিলসে কুল কাদির খান উসমান উলুগ সুলতান
সময়কাল, প্রতিষ্ঠা- সমাপ্তি	৮৪০-১২১২
সীমানা	৩০,০০,০০০ বর্গ কিমি. ১২০,০০০০ বর্গমাইল
পূর্ববর্তী প্রজন্ম	পরবর্তী প্রজন্ম
উইঘুর খাগনাত খোতানের সামনিদ রাজ্য	খারাজমিয়ান কারা খিতাই

কারা খানিদ খানাত বা খানদের শাসনকাল নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

তুর্কিদের ইতিহাস

তুর্কি খাগনাত পশ্চিম তুর্কি পূর্ব তুর্কি	৫৫২-৭৪৪
খাজার খাগনাত	৬১৮-১০৪৮
জুইয়ানতিও	৬২৮-৬৪৬
গ্রেট বুলগেরিয়া দানিয়ুব বুলগেরিয়া ভলগা বুলগেরিয়া	৬৩২-৬৬৮
কাংগার উইনিয়ন	৬৫৯-৭৫০
তুর্ক শাহি	৬৬৫-৮৫০
তুর্গেশ খাগনাত	৬৯৯-৭৬৬
উইঘুর খাগনাত	৭৪৪-৮৪৪
কারলুক ইয়াবগু রাজ্য	৭৫৬-৯৪০
কারা খানিদ খানাত পশ্চিম কারা-খানিদ পূর্ব কারা-খানিদ	৮৪০-১২১২
গানঝু উইঘুর রাজ্য	৮৪৮-১০৩৬
কোচো	৮৫৬-১৩৩৫
পেচেনেগ খানাত	৮৬০-১০৯১
কিমেক কনফেডারেশন	৭৪৩-১০৩৫
কিউম্যানিয়া	১০৬৭-১২৩৯
ওঘুজ ইয়াবগু রাজ্য	৭৫০-১০৫৫
গজনভি সাম্রাজ্য	৯৬৩-১১৮৬
সেলজুক সালতানাত (রোম সাম্রাজ্য)	১০৩৭-১১৯৪
কেরাইত খানাত	১১শ শতাব্দী-১৩শ শতাব্দী
খারাজমাইন সাম্রাজ্য	১০৭৭-১২৩১
নাইমান সাম্রাজ্য	১২০৪
কারলুঘিদ রাজ্য	১২২৪-১২৬৬
দিল্লি সালতানাত (মামলুক, খালজি, তুঘলুক বংশ)	১২০৬-১৫২৬
গোল্ডেন হোর্ড	১২৪০-১৫০২
মামলুক সালতানাত (কায়রো) বাহরি বংশ	১২৫০-১৫১৭

সিআইএর ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক অনুযায়ী চীনের মোট জনসংখ্যার ১ থেকে ২ শতাংশ মুসলিম। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদনে দেখা যায়, মুসলিমরা চীনা জনসংখ্যার ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০০৯ সালের এক হিসাব অনুযায়ী, এসব দেশের মধ্যে চীনের জিনজিয়াংয়ে ১ কোটি ২০ হাজারের মতো উইঘুর বসবাস করে।

কাজাখস্তানে ২ লাখ ২৩ হাজার, উজবেকিস্তানে ৫৫ হাজার, কিরগিজস্তানে ৪৯ হাজার, তুরস্কে ১৯ হাজার, রাশিয়ায় ৪ হাজার, ইউক্রেনে ১ হাজারের মতো উইঘুর বাস করে।

১৯১১ সালে মাঞ্চু সাম্রাজ্য উৎখাতের মাধ্যমে পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনা শাসন চালু হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনচেতা বীর উইঘুররা এই বৈদেশিক শাসনের সামনে মাথা নোয়ায়নি। এ কারণে ১৯৩৩ ও ১৯৪৪ সালে তারা দু'বার চীনাদের সঙ্গে সাহসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ভাগ্য তাদের অনুকূলে ছিল না। এ কারণে ১৯৪৯ সালে আবারও তারা চীনা কমিউনিস্টদের হাতে পরাজিত হয় আর জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গড়ে ওঠে। তখন সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির গভর্নর ছিলেন সাইফুদ্দিন আজিজি। সাইফুদ্দিন আজিজি সেক্যুলার শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিস্ট সরকারের পুতুল প্রশাসক ছিলেন। তথাপি অঞ্চলটিকে মাওবাদী কমিউনিস্ট চিন্তাধারার প্রবর্তক মাও সেতুংয়ের নামে নামকরণ করতে চাইলে তিনি প্রতিবাদ করেন। জিনজিয়াংকে তারা মাওজিয়াং করতে চেয়েছিল।

পূর্বতুর্কিস্তান বা জিনজিয়াংয়ের মাটি-পানি

শিন বা জিন বা ঝিন অর্থ 'নতুন' আর জিয়াং বা চিয়াং বা ঝিয়ান অর্থ 'সীমানা বা ভূমি বা অঞ্চল'। সেই অর্থে এর নাম নয়া ভূমি বা নতুন অঞ্চল। উইঘুর শব্দের মতো জিনজিয়াং শব্দটিকেও বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে দেখা যায়। যেমন, জিনজিয়াং, জিনজিয়ান, ঝিনঝিয়াং, শিনঝিয়াং, শিনচিয়ান বা শিনচিয়াং। লিখিত রুপ উইঘুর ভাষায়: شىنجاڭ, চীনা ভাষায়: 新疆; ইংরেজিতে: Xinjiang.

এর নাম 'নয়া অঞ্চল' রাখা কি প্রমাণ করে না যে এটি কখনোই চীনের অংশ নয়? আসলে এটি কখনোই চীনের অংশ নয় বরং ক্ষমতার বলে দখল করা নতুন একটি অঞ্চল মাত্র। এর আগে কখনো চীন সম্রাটরা একে দখল করতে এসেও সম্পূর্ণ রুপে দখল করেননি বরং স্বাধীনতা দিয়েছেন,

অঞ্চলের স্বকীয়তা বজায় রেখে কর্তৃত্ব করেছেন। কারণ এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকা, আচারআচরণ, স্বভাবপ্রকৃতি ভিন্ন রকম। যা মূল চায়নিজ জীবনধারার সাথে মেলে না। কিন্তু বর্তমান কমিউনিস্ট সরকার একে সর্বাংশে দখল তো করেছেই এর স্বকীয়তা বিনষ্টের পুরো নীলনকশা বাস্তবায়নও করছে। এখানকার সহজ সরল পবিত্র জীবনধারা পাল্টে দিতে চাচ্ছে। বিশ্বজনমত অগ্রাহ্য করে গায়ের জোরে তা করেও চলেছে।

প্রশাসনিকভাবে জিনজিয়াং এর নাম 'শিনচিয়ান উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল' চীনা ভাষায় 新疆维吾尔自治区 যার ইংরেজি প্রতিবর্ণলিপি Xīnjiāng Wéiwú'ěr Zìzhìqū, ইংরেজিতে Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), স্থানীয় উইঘুর ভাষায় شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى যার ইংরেজি প্রতিবর্ণ জিনজিয়াং চীনের উত্তর পশ্চিাঞ্চলের একটি প্রশাসনিক পর্যায়ের স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল। এটি চীনের সর্ববৃহৎ প্রদেশ এবং পৃথিবীর কোন দেশের ভেতরকার ৮ম বৃহত্তম উপবিভাগ। আয়তন ৬ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গমাইল। জিনজিয়াং এ রয়েছে আকসাই চীন অঞ্চল; যা চীন শাসন করে কিন্তু ভারত তার মালিকানা দাবি করে অর্থাৎ ভারতের সাথে বিরোধপূর্ণ অঞ্চল। জিনজিয়াং এর সীমান্ত রয়েছে মঙ্গোলিয়ার বায়ান, খোভদ এবং গোভি আলতাই প্রদেশ, রাশিয়ার আলাতাই রিপাবলিক, কাজাখিস্তানের পূর্ব কাজাখিস্তান এবং আমতাই প্রদেশ, কিরগিজিস্তানের ইজিক কুল, নায়রান এবং ওশ অঞ্চল, তাজিকিস্তানের গোরনো-বাদাখশান স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশ, পাকিস্তানের গিলগিট বালতিস্তান অঞ্চল এবং ভারতের জম্মু-কাশ্মীর। দুর্গম কারাকোরাম, কুনলুন এবং তিয়ানশান পর্বতাঞ্চলগুলোই মূলত জিনজিয়াংয়ের সীমান্তজুড়ে, বিশেষ করে পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমান্ত এলাকাজুড়ে। জিনজিয়াংয়ের সীমান্তে তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল, গানশু এবং কিংঘাই এলাকাও রয়েছে। ঐতিহাসিক সিল্ক রোডও বয়ে গেছে জিনজিয়াংয়ের পূর্ব হতে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বিপুল তেল এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে জিনজিয়াংয়ে। বর্তমানে এটি চীনের সর্ববৃহৎ প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন অঞ্চল।

জিনজিয়াং অনেকগুলো নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠীর বসাবস। তন্মধ্যে উইঘুর, হান, কাজাখ, তিব্বতি, হুই, তাজিখ, কিরগিজ, মঙ্গলীয়, এবং রাশিয়ান উল্লেখযোগ্য। প্রায় এক ডজনেরও বেশি স্বশাসিত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

রয়েছে জিনজিয়াংয়ে। ইংরেজি ভাষায় কোন কোন গবেষক এ অঞ্চলকে 'চায়নিজ তুর্কিস্তান' নামে ডাকেন। জিনজিয়াং উত্তরে জাংগারিয়া ও দক্ষিণে তারিম অববাহিকা দ্বারা বিভক্ত যেগুলো মূলত পাহাড়ি অঞ্চল নামে খ্যাত। জিনজিয়াংয়ের মাত্র ৯.৭ ভাগ ভূমি মানব বসতির জন্য উপযুক্ত। ২০১৫ সালের এক হিসেব অনুযায়ী জিনজিয়াংয়ের সমুদ্র অঞ্চল ৪.৩ ভাগ থেকে বেড়ে ৯.৭ ভাগে দাড়িয়েছে।

ইতিহাসের বিভিন্ন দলিলদস্তাবেজ ঘেটে দেখা যায়, এই অঞ্চলের দখল নিতে প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে রাজা-বাদশাহ-সম্রাটগণ লড়াই করে এসেছেন। আধুনিক পৃথিবীতে আঠার শতকে জিনজিয়াং কিং শাসকদের অধীনে আসে। যার শেষ পর্বে প্রজাতন্ত্রী চীন গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের দখলে চলে যায় চীনা গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সুরক্ষার জন্য সীমান্তে মোতায়েন করা হয় এক্সপিসিসি বা বিংতুয়ান বাহিনী (Xinjiang Production and Construction Corps XPCC or Bingtuan)। ১৯৫৫ সালে জিনজিয়াংকে প্রদেশ হতে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে উন্নীত করা হয়। এরপর থেকেই স্থানীয় হানদের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে অত্র অঞ্চলে পূনর্বাসন শুরু হয়। এবং সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

হানদের এই আত্তীকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে এবং লালফৌজের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে বহু মানুষ নির্যাতিত, নিহত হয়। বিপুল সংখ্যায় কাজাখ জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী কাজাখস্তানে পালিয়ে যান। এরপর থেকে উইঘুর মুসলমানদের সঙ্গে চীনা কর্তৃপক্ষের বিরোধ সৃষ্টি হয়। একসময় তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। গত শতাব্দীর শেষে উইঘুর মুসলমানরা স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। চীনের জিনজিয়াংয়ে ১ কোটি ২০ লাখের মতো উইঘুর লোক বসবাস করে।

এক নজরে জিনজিয়াং প্রদেশ (২০১৯) ...

নাম	'শিনচিয়ান উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল'
রাজধানী	উরুমকি বা উরুমচি
বিভাগসমূহ	জেলা ১৪টি, কাউন্টি ৯৯টি, শহর ১০০৫টি
সরকার সচিব	ছেন ছুয়াংকুও
চেয়ারম্যান	শোহরাত জাকির
আয়তন	১৬৬৪৮৯৭ বর্গ কিমি. বা ৬৪২৮২০ বর্গ মাইল
-এলাকার ক্রম	১ম
-সর্বোচ্চ উচ্চতা	৮৬১১ মিটার বা ২৮২৫১ ফুট,
-সর্বনিম্ন উচ্চতা	১৫৪ মিটার বা ৫০৫ ফুট
জনসংখ্যা	
-মোট	২,১৮,১৫, ৮১৫জন (২০১০); ২, ৩৬, ০০, ০০০
-ক্রম	২৫তম
-ঘনত্ব	১৩/বর্গ কিমি.(৩০/বর্গ মাইল)
-ঘনত্ব ক্রম	২৯তম
জনপরিসংখ্যান	
-জাতিগত গঠন	৪৫.৮৪% উইঘুর ৪০.৪৮% হান ৬.৫০% কাজাক ৪.৫১% হুই ২.৬৭%অন্যান্য
-ভাষা ও উপভাষা	ম্যান্ডারিন (সরকারি) উইঘুর (সরকারি) কাজাখ, কির্গিজ, ওইরাত, মঙ্গোলীয়, অন্যান্য আরো ৪৩টি ভাষা
আইএসও ৩১৬৬	সিএন-৬৫
জিডিপি (২০১৭)	চীনা ইউয়ান ৯.৬২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারে ১৪ হাজার কোটি (২৫তম)
-মাথাপিছু	চীনা ইউয়ান ৪০, ৭৫৬ মার্কিন ডলার ৬,১৩৭ (১৬তম)
মানব উন্নয়ন সূচক	২৭তম
ওয়েবসাইট	www.xinjiang.gov.cn

ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্বিকভাবে জিনজিয়াং প্রদেশ প্রধান দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। একটির নাম জাংগারিয়া, তিয়ানশান পর্বতের উত্তরাঞ্চল

এবং আরেকটি তারিম ব্যাসিন, তিয়ানশান পর্বতের দক্ষিণাঞ্চল। কিং শাসনের আগে তারা পৃথকভাবে বসবাস করত। পৃথক শাসনে শাসিত হতো। ১৮৮৪ সালে এই দুটি অঞ্চলকে একক শাসনে নিয়ে আসেন কিং রাজা। ১৭৫৯ সালে জাংগারিয়া অঞ্চলে বসবাস করত যাযাবর তিব্বতী বৌদ্ধরা আর তারিম ব্যাসিনের মরুদ্যানে বসবাস করত তুর্কিভাষী মুসলিম কৃষকরা, যাদেরকে এখন উইঘুর বলা হয়। ১৯৮৪ সালের আগ পর্যন্ত তারা আলাদাভাবেই শাসিত হত। স্থানীয় উইঘুররা তারিম ব্যাসিনকে আলতিশাহর নামে চেনে।

কিং শাসকরা বৌদ্ধ মঙ্গলীয়দের উত্তরাঞ্চলীয় তিয়ান শান আর তুর্কি মুসলিমদের দক্ষিণ তিয়ানশান সম্পর্কে ভালো করে জানত। তাই তারা প্রথমে পৃথকভাবেই শাসন করে। পরে তারা চিন্তা করে দুটি অঞ্চল মূলত একই প্রকৃতির। একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের অধীনে শাসিত হওয়াই উত্তম। আর সেই স্বতন্ত্র প্রদেশ বা স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলই হলো জিনজিয়াং।

চীনের সরকারি হিসেব মতে ১৮৮৪ সালে প্রদেশ হিসেবে স্বীকৃতি পায় জিনজিয়াং। ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবর চীন গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য প্রদেশের মতো জিনজিয়াং চীনের স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। তবে নামে স্বায়ত্বশাসন হলেও উইঘুরদের নূন্যতম ভোটাধিকারও নেই। সম্পূর্ণ কমিউনিস্ট সরকার কর্তৃক কেন্দ্রশাসিত সরকার।

ভৌগলিক অবস্থা

উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত যথাক্রমে আলতাই শান পাহাড়, তিয়েনশান পাহাড়, আর খুনলুনশান পাহাড় বিন্যস্ত। পর্বতমালার মধ্যে চুনকার বেসিন আর থালিমু বেসিন অবস্থিত। লোকেরা তিয়েনশান পাহাড়ের দক্ষিনাঞ্চলকে নানচিয়াং, অর্থাৎ দক্ষিণ জিনজিয়াং, তিয়েনশান পাহাড়ের উত্তরাঞ্চলকে বেইচিয়াং অর্থাৎ উত্তর জিনজিয়াং আর হামি ও থুলুফান বেসিনকে তুংচিয়াং অর্থাৎ পূর্ব-জিনজিয়াং বলে থাকেন। জিনজিয়াংয়ের শহর আর গ্রামাঞ্চল উভয়ই মরুদ্যানে অবস্থিত। দুটো বড় বেসিনের সীমারেখায় একটার পিছনে আরেকটা মরুদ্যান দেখার মতো দৃশ্য বটে।

জিনজিয়াংয়ে চীনের বৃহত্তম অভ্যন্তরীন নদী থালিমু নদী, বৃহত্তম অভ্যন্তরীন মিঠা পানি হ্রদ বাস্টান হ্রদ আর সামুদ্রিক পৃষ্ঠর কাছাকাছি রয়েছে থুলুফান বেসিন। জিনজিয়াংয়ের আবহাওয়া আদর্শ খরা এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

এর তাপমাত্রার বিরাট পার্থক্য রয়েছে, অলতাই এলাকার তাপমাত্রা চীনের নিম্নতম তাপমাত্রার রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু থুলুফান এলাকা দীর্ঘকাল ধরে চীনের উচ্চতম তাপমাত্রার রেকর্ড বজায় রেখেছে।

চীনের দুই-তৃতীয়াংশের মরুভূমি জিনজিয়াংয়ে অবস্থিত। এর মধ্যে তাকলামাগান মরুভূমির আয়তন ৩ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গকিলোমিটার। তাকলামাগান চীনের বৃহত্তম মরুভূমি, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম চলমান-মরুভূমি। চুনকার বেসিনের খুলবানথুংকুত মরুভূমির আয়তন ৪৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। এটি চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম মরুভূমি। জিনজিয়াংয়ের মরুভূমি প্রচুর তেল ও গ্যাস সম্পদ আর খনিজপদার্থ সম্পদে সমৃদ্ধ।

জিনজিয়াংয়ের রূপরেখা

জিনজিয়াং চীনের উত্তর পশ্চিম এবং ইউরোপ-এশিয়া মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। জিনজিয়াংয়ের আয়তন ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে জিনজিয়াং চীনের এক বৃহত্তম প্রদেশ। জিনজিয়াংয়ের পশ্চিম আর উত্তর ৮ টি দেশের সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত যথাক্রমে মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া ফেডারেল, কাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারত। সীমান্ত রেখা ৫৪০০ কিলোমিটার। সীমান্ত রেখার দিক থেকে এটি চীনের দীর্ঘতম ও সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক বন্দর সমৃদ্ধ এক প্রদেশ।

জ্বালানি শক্তি

জিনজিয়াংয়ের কয়লা আর তেলের মজুদ পরিমাণ উভয়ই চীনের মোট মজুদ পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ। এছাড়া চীন প্রাকৃতিক গ্যাসের যথেষ্ট সমৃদ্ধ। জিনজিয়াং ইতিমধ্যে উত্তর-পশ্চিম চীনের বৃহত্তম তেল-ক্ষেত্র ও সম্ভাবনাময় অনেকগুলো তেলক্ষেত্রের আধার। ৭ লক্ষ ৪০ হাজার বর্গকিলোমিটারের জিনজিয়াং এ আনুমানিক ২০৮০ কোটি টন তেল ও ১০ ট্রিলিয়ন ঘনমিটারের প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ মজুদ রয়েছে। যা চীনের স্থলভাগের তেল-সম্পদের মোট পরিমানের ৩০ শতাংশ। একে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা চীনের তেল-শিল্পের আশার সমুদ্র বলে ডাকেন। ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে চালু হওয়া পশ্চিম দিকের গ্যাস পূর্ব দিকে পাঠানোর প্রকল্প চালু হয়। এতে জিনজিয়াংয়ের প্রাকৃতিক গ্যাস পূর্ব-চীনের সাংহাই আর তার আশেপাশের এলাকায় পাঠানো হয়।

জিনজিয়াংয়ের কয়লা সম্পদের মোট মজুদ পরিমাণ ২,০০,০০০ কোটি টনেরও বেশী। যা পুরো চীনের মজুদ পরিমানের ৪০ শতাংশ। সমগ্র চীনে যে কোন অঞ্চলের হিসেবে সর্বাধিক। তাবান ছেন শহরের বায়ুশক্তি চালিত পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা চীনের বৃহত্তম বায়ুশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা।

জিনজিয়াংয়ের অর্থনীতি

স্থানীয় শিল্প

দুগ্ধজাত পণ্য, মদ, কোমল পানীয়, দৈনিক ব্যবহার্য রসায়ন শিল্প, সুগন্ধিদ্রব্য, মসলা, রত্ন ও জেদ পাথর প্রক্রিয়াকরণ, চিনি উৎপাদন জাতীয় ব্যবহার্য দ্রব্য প্রভৃতি দশ-বারোটি ক্ষেত্র নিয়ে জিনজিয়াংয়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিল্প গঠিত। টমোটোজাত দ্রব্য, আঙ্গুর মদ, ফলের পানীয়, বীটজাত চিনি, রত্ন ও জেদ পাথরের প্রক্রিয়াকরণ এবং দেশিয় বিভিন্ন কুটির শিল্প নিয়ে এ অঞ্চলের প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প বেশ সমৃদ্ধ। তাছাড়া টাটকা দুধের পানীয়, দই এবং ভেষজ কাঁচামালে তৈরি নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় চীনের অন্যান্য প্রদেশের মানুষ ও পর্যটকদের কাছে খুবই সমাদৃত।

পশুপালন

জিনজিয়াংয়ে বহুজাতের গবাদিপশু রয়েছে বলে এটি চীনের এক গুরুত্বপূর্ণ চারণভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই জিনজিয়াং নামিদামি ঘোড়ার জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও গবাদিপশুর মধ্যে বিভিন্ন উন্নত জাতের ভেড়া, ঘোড়া, গরু, ছাগল, গাধা, খচ্চর, উট, চমরী গাই প্রভৃতি এখানে রয়েছে। জিনজিয়াংয়ের খাঁসি মাংসের উৎপাদন পরিমাণ চীনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। জিনজিয়াংয়ের গবাদি পশুর মোট পরিমাণ ৪ কোটিরও বেশি।

জিনজিয়াংয়ের প্রাকৃতিক তৃণভূমির মোট আয়তন হলো ৫ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার। এটা কৃষি, বন ও পশুপালনে ব্যবহার্য জমির মোট আয়তনের ৮৭ শতাংশ। প্রাকৃতিক এই বিশাল তৃণভূমি জিনজিয়াংয়ের গবাদি পশু পালন কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে। প্রাকৃতিক এই তৃণভূমিটিতে গোটা জিনজিয়াংয়ের ৭০ শতাংশের গবাদি পশু পালন হয়ে

থাকে। শুধু মাংসের চাহিদার জন্য নয় বরং নতুন নতুন জাতের গবাদি পশু পালন করার খামার হিসেবেও এ অঞ্চল প্রাচীনকাল হতে পৃথিবী বিখ্যাত। তবে কমিউনিস্ট দখলের পর সেখানে শূকরের খামার গড়ে তোলা হয় ব্যাপক হারে। এবং সরকারিভাবে নতুন জাতের পশু তালিকায় উত্তম-লোমের ভেড়া, চীনা মেরিনো ভেড়া, জিনজিয়াং ছাগল ছানা, জিনজিয়াং বাদামি রঙ গরু, ইলি ঘোড়া এসব প্রাণীর সাথে সাথে ইলি সাদা রঙ শূকর আর জিনজিয়াং কালো রঙ শূকরও নিজেদের গবেষণায় উদ্ভাবন করা হয়।

কৃষি

জিনজিয়াংয়ে যেমন প্রখর রৌদ্রের দেখা মেলে তেমনি মাটি পানির ভেতর বাইরে মেলে অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ। স্থানীয় লোকেরা পানি-সম্পদ সমৃদ্ধ মরুদ্যানে আবিস্কার করেছে বিপুল কৃষি সম্পদ। জিনজিয়াংয়ের প্রধান শস্য হলো গম, ভূট্টা, ধান প্রভৃতি। আর অর্থকরী শস্য হলো তুলা, বীট আর হোপস। এর মধ্যে তুলার উৎপাদন পরিমাণ চীনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। জিনজিয়াং চীনের বৃহত্তম প্লাশ-তুলার উৎপাদন-কেন্দ্র। এর উৎপাদন পরিমাণ চীনের প্লাশ-তুলার মোট উৎপাদনের ৯৫ শতাংশেরও বেশি। এখানকার প্লাশ-তুলার গুণগতমান মিসরের বিশ্ব-বিখ্যাত প্লাশ-তুলার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

জিনজিয়াং ফলের দেশ নামে পরিচিত। চীনের মধ্যে জিনজিয়াংয়ের ফল আকারে যেমনি বড় খেতেও তেমনি সুস্বাদু। উৎপাদিত বিভিন্ন জাতের ফলের মধ্যে আঙুর, হামি তরমুজ, তরমুজ, আপেল, সুগন্ধি নাশপাতি, পিচ ডালিম চেরি, ডুমুর-ফল, পাতান-খোবানি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোকে নাতিশীতোষ্ণমন্ডলীয় ফল বলা হয়। এগুলোর মধ্যে থুলুফানের আঙ্গুর, হামি-তরমুজ প্রভৃতি ফল অত্যন্ত রসালো ও মিষ্টি বলে পৃথিবী বিখ্যাত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিনজিয়াংয়ের কৃষি ধাপে ধাপে শিল্প পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে টমেটো, বীট, গাজর, সেফ-ফুল, মরিচ, আঙ্গুর। এছাড়া রঙিন তুলাকে বিভিন্ন শিল্পকারখানায় কাঁচামাল হিসেবে গ্রহণ করার ফলে এর উৎপাদন বেড়েছে।

অন্যান্য শিল্প

বর্তমানে জিনজিয়াংয়ের শিল্প-অর্থনীতি দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেয়ে ইস্পাত ও লৌহ, কয়লা, তেল, যন্ত্রপাতি, রসায়ন, নির্মাণ-উপকরণ, বস্ত্রবয়ন, চিনি তৈরী, কাগজ তৈরী, চামড়া, সিগারেটসহ বহুজাতের এক পরিপূর্ণ শিল্প-ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। আঞ্চলিক সম্পদের প্রাচুর্য কাজে লাগানোর মাধ্যমে জিনজিয়াংয়ের বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এখন জিনজিয়াংয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রায় ৬০ হাজার শিল্পপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো তেল, কয়লা, ধাতুঢালাই, বিদ্যুৎ, বস্ত্রবয়ন, রসায়ন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ উপকরণ ও খাদ্যজাতীয় প্রায় ২০০০ ধরনের দ্রব্য তৈরি করে।

জিনজিয়াংয়ের গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় শিল্প-প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে দুশানচি ইথিলিন প্রকল্প, তেল ও রসায়নের পলিয়েস্টার প্রকল্প, উরামুচি শহরের তেল ও রাসায়নিক কারখানার ২ নং রসায়ন সার প্রকল্প, মানাস বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প ও চিংতাশানখৌ পানি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, হোং ইয়েনছি বিদ্যুৎ কারখানার চতুর্থ পর্যায়ের সম্প্রসারণ-প্রকল্প প্রভৃতি। তাবানছেন বায়ু চালিত পরীক্ষামূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হলো চীনের বৃহত্তম বায়ু চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন জাতি

কাজাখ জাতি

জিনজিয়াংয়ে এখন ১২ লক্ষ কাজাখ জাতির লোক বাস করে। তারা প্রধানত 'উত্তরের কাজাখ জাতি স্বায়ত্তশাসন বিভাগে' বসবাস করেন। কাজাক জাতির নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে। কাজাখ জাতির অধিকাংশ লোক পশুপালন করে জীবন ধারণ করে। যারা কৃষি কাজ করে স্থির জীবনযাপন শুরু করেছেন এমন অল্প কিছু লোক ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক ঋতু অনুসারে এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমিতে স্থানান্তরিত হয়ে যাযাবর জীবনযাপন করেন। কাজাখ জাতি অনেকটা আমাদের বাংলাদেশিদের মতোই আন্তরিকতাপূর্ণ ও অতিথিপরায়ণ জাতি। অতিথি আসলে তারা বাড়ির সবচেয়ে ভালো খাদ্য দিয়ে এবং খাসি জবাই করে অতিথিকে আপ্যায়ন করেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের একটি বিশেষ রীতি রয়েছে। খাওয়ার সময় স্বাগতিকরা প্রথমে মাথাসহ এক থালা খাসির মাংস অতিথিদের সামনে পরিবেশন করেন। অতিথি খাসির মাথাটা তুলে ধরে খাসির ডান চেহারার একটুকরা মাংস কেটে খান এবং খাসির কান কেটে

স্বাগতিকের অল্প-বয়সী বাচ্চাকে খাইয়ে দেন। তারপর ছাগলের মাথাটা স্বাগতিককে ফেরত দেন। কাজাখ জাতির নারী-পুরুষ সবাই দক্ষতার সাথে ঘোড়া চালাতে জানেন। যুবকরা কুস্তি ও খাসি ধরার প্রতিযোগিতা পছন্দ করেন। উৎসব বা কোনো বিশেষ আনন্দের দিনে পশুপালকরা নানান ধরনের ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। মেয়েদের পশ্চাদ্ধাবন নামে খেলাটি যুবক যুবতীদের অনেক প্রিয় খেলা। খেলার সময় পুরুষরা ঘোড়ায় চড়ে সামনে দৌড়ায় আর মেয়েরা পিছনে ধাওয়া করে। এভাবে অনেক সময় বিয়ের জন্য বর কনেও ঠিক করা হয়।

কিরগিজ জাতি

কিরগিজ জাতির লোকসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। এদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা রয়েছে। কিরগিজ জাতি প্রধানত জিনজিয়াংয়ের পশ্চিম দিকের পামির মালভূমির গিজলাসু কিরগিজ স্বায়ত্তশাসিত বিভাগে বসবাস করে। কিরগিজ জাতি পশুপালন প্রধান জাতি। তারা গ্রীষ্মকালে সমতলভূমি আর নদীর আশেপাশে এবং শীতকালে সূর্যমুখী উপত্যকায় থাকে। কিরগিজ জাতি মাটির তৈরি বাড়িঘরে বাস করে। তাদের সে চার কোনার বাড়িতে থাকে একটি কুলঙ্গি তার সমান ছাদ, পাশে খোলা জানালা। কিরগিজরা তাদের বাড়িঘরের চারপাশে শাকসব্জি ও ফলমূল চাষ করে। কিরগিজ জাতির খাদ্যও নানা ধরনের। এদের দুগ্ধজাত দ্রব্যের মধ্যে মাখন, পনির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিরগিজ জাতির রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বিশেষ ধরনের পোশাক। পুরুষরা পশমী টুপি পরতে আর নারীরা মাঝখানে রুপালি-বোতাম লাগানো কাপড় পরতে পছন্দ করেন। মেয়েরা বিয়ের আগে চুলে অনেক বেণী এবং বিয়ের পর দুই বেণী বাঁধেন।

জিনজিয়াংয়ের পর্যটন

হোতান বা হ্যথিয়েন

প্রাচীনকালে ইয়নথিয়েন নামে পরিচিত হ্যথিয়েন বিখ্যাত পশ্চিম অঞ্চলের অন্যতম সভ্য দেশ ছিল। হ্যথিয়েন এশিয়া-ইউরোপ মহাদেশের পশ্চাদ ভূমিতে এবং সিল্ক রোডের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। বিভিন্ন জাতির লোক রয়েছে এখানে। এখানে এসে মিশেছে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি। বিভিন্ন দেশের দূত ও ব্যবসায়ীরা ঘন ঘন এখানে আসা যাওয়া করতেন। হ্যথিয়েনের উত্তর দিকে নির্জন তাকরামাকান মরুভূমি, দক্ষিণ দিকে খুনলুনশান পর্বত। এখানে রয়েছে ঝকঝকে রহস্যময় তুষার পাহাড় ও মরুভূমি। কল্পলোকের মতো বর্ণিল হ্রদের জলাভূমি ও তৃণভূমি এখানকার অন্যতম আকর্ষণ। রয়েছে জালের মতো বন। হ্যথিয়েনের জেদ পাথর, রেশম, কার্পেট আর ফলমূল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কারণে হ্যথিয়েনকে জেদপাথরের নগর, রেশমের রাজধানী আর ফলমূলের দেশ বলা হয়।

কাশগড় বা কাশি

মুসলিম বিশ্বে কাশগড় নামে পরিচিত বিখ্যাত স্থানটিকে চীনারা কাশিকার বা কাশি নামে ডাকে। সিল্ক রোডের মুক্তা নামে কাশগড় বিশ্ববিখ্যাত। চীনারাও কাশগড়ের মুসলিম ঐতিহ্য স্বতন্ত্র লোকজ সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিয়ে একে 'প্রাচীন সাংস্কৃতিক নগর' বলে ডেকে থাকে। কাশগড় থালিমু বেসিনের পশ্চিম দিকের এক মরুদ্যান। একে 'উত্তর মহাপ্রাচীরের দক্ষিণ ইয়াংসি নদী এলাকা' বলে আখ্যায়িত করেন অনেকে। কাশগড় চীনের তুলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন এলাকা। কাশগড় পর্যটন-সম্পদে সমৃদ্ধ। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। মরুভূমি ভ্রমণ, হিমবাহ এক্সপ্লোর আর পাহাড়-ভ্রমণ বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

কাশগড়ের ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। এখানে রয়েছে মানব বসতির বহু নিদর্শন। সুবিখ্যাত আতিকার মসজিদ, আবাকহকা রানির কবরস্থান, মাঃ কাশিকালীর কবরস্থান, ইয়েরছিয়াং খান রাজবংশের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি

বেশ কয়েকটি দর্শনীয় স্থান। এসব দর্শনীয় স্থানে উইঘুর সংস্কৃতি আর স্থাপত্য-শিল্পের নানা নমুনা চিত্রায়িত হয়েছে। গোটা জিনজিয়াং অঞ্চলের মধ্যে কাশগড় নিজের সুগভীর ঐতিহাসিক সংস্কৃতি, বৈচিত্রময় রীতিনীতি মনরোম প্রাকৃতিক দৃশ্য সমৃদ্ধ যা দেশিবিদেশি পর্যটকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। এমন কি বলা হয়ে থাকে যে, কাশগড় না গেলে জিনজিয়াং যাওয়া বৃথা।

তুরফান বা থুলুফ্যান

মধ্য জিনজিয়াংয়ের নিচু বেসিনে এমন একটি জায়গা রয়েছে জায়গাটিকে সবাই "হোচৌ অর্থাৎ অগ্নি বিভাগ" ডাকেন। জায়গাটির পুথাওকৌ এলাকায় নানা উন্নতমানের আঙুর উৎপন্ন হয়। জায়গাটি হলো তুরফান বা থুলুফ্যান। বিশেষ ভৌগলিক অবস্থার কারণে থুলুফ্যানের ভূগর্ভের পানি সম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। একারণে এখানে আঙুর আর তরমুজ প্রভৃতি ফলমূল প্রচুর উৎপন্ন হয়। আবহাওয়া শুষ্ক এবং বৃষ্টি কম বলে এখানকার ফল বেশী রসালো ও মিষ্টি হয়। অনেক লোক থুলুফ্যানের মিষ্টি ফলের জন্যই সেখানে ভ্রমণ করতে যান। থুলুফ্যানকে "আঙুরের রাজ্য", "আঙুরের শহর" বলা হয়। আর সেখানকার লোকদের বলা হয় "আঙুরের ভেতরকার মানুষ"। ইতিহাস থেকে জানা যায়, ২০০০ বছর আগে থেকে এখানে আঙুরের চাষ হতো।

থুলুফ্যানের রাস্তায় বেরুলে যেখানে সেখানে বিরাটাকারের প্রাচীনতম আঙুর বাগান, রাস্তায় হোক গলিতে হোক বা বাড়িঘরের সামনে হোক, পিছনে হোক সর্বত্রই আঙুরের ঝাকা দেখা যায়। সেখানকার কিসমিস বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি হয়। উষ্ণ বায়ুতে স্বাভাবিকভাবে শুকানো সবুজের কিসমিস টক এবং মিষ্টি বলে সবার কাছে সমাদৃত। থুলুফ্যান শহরের স্থানীয় সরকার বিশেষভাবে আঙুর রাস্তা নির্মান করেছে। বহু আঙুর-বারান্দা, আঙুর পার্ক আর আঙুর-যাদুঘর পর্যটকদের পরিদর্শনের প্রস্তুত করে রাখা আছে। এখন থুলুফ্যানে যাওয়া অতিথিরা পুথাওকৌ গেলে সেখানকার সুন্দর দৃশ্য দেখার সাথেসাথে নিজেরা গাছ থেকে ছিড়ে নানান ধরনের টাটকা আঙুর চেখে দেখতে পারেন।

হাজার বৌদ্ধমূর্তি-গুহা

জিনজিয়াং থেকে সিল্ক রোডের মহাসড়ক ধরে এগুলে অনেক প্রাচীন ও বিখ্যাত সরাইখানা, দুর্গ, পাথুরে গুহা-মন্দির, দূত-স্টেশন, কবরস্থান আর

আলোক-সংকেত টাওয়ার চোখে পড়বে। কাজিরের হাজার বৌদ্ধ-গুহা, বাজকারিকের হাজার বৌদ্ধ-গুহা প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গুহা। এগুলোর দেয়ালে চীন, ভারত আর পারস্যের সাংস্কৃতিক নিদর্শন খোদাই-করা রয়েছে। বাজকারিক কথাটা উইঘুর ভাষার শব্দ। এর অর্থ হলো পাহাড়ের অর্ধেক পথে। বাজকারিকের হাজার বৌদ্ধ-গুহা থুলুফ্যান শহরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গুহাটি খনন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সেখানে মোকাও গুহার থাংরাজবংশ আমলের শিল্প নিদর্শনও রয়েছে।

প্রাচীনতম লৌলান নগর

দক্ষিণ জিনজিয়াংয়ের লোবুপো জায়গার উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীনতম লৌলান নগর সিল্ক রোডে প্রবেশ করার এক গুরুত্বপূর্ণ সদর দরোজা। অবশ্য লৌলান এখন জনশূন্য এলাকা। চারিদিকে মরুভূমি, বসবাসের বিরূপ পরিবেশ। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ২ শতাব্দীতে লৌলান পশ্চিমাঞ্চলের এক সমৃদ্ধতম এলাকা ছিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হলো, নামকরা লৌলান রাজ্য সমৃদ্ধশালী হওয়ার পাঁচ-ছ'শ বছর পর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রাচীনতম লৌলান নগর কিভাবে অদৃশ্য হলো? সুদীর্ঘকাল ধরে দেশী বিদেশী প্রত্নতত্ত্ববিদ আর বৈজ্ঞানিকদের কাছে সে এক আজিব রহস্য।

বর্তমানে লৌলান দেশী-বিদেশী এডভেঞ্চার প্রিয়দের একটি পছন্দের স্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম নানান ধরনের জটিল কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছিল এবং অবশেষে বাতাস ও বালির ঝড়ে লৌলান নগর বিশাল মরুভূমিতে ঢাকা পড়ে যায়। বলা হয় প্রাচীনতম লৌলান নগরের আয়তন এক লক্ষ ২০ হাজার বর্গমিটার। এর দেয়াল মাটি, খাগড়া আর গাছের ডাল দিয়ে তৈরি হয়। লৌলানে এখন শুধু ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ মন্দিরের ভাগাড়। লৌলানের প্রাচীন কবর থেকে ৩৮০০ বছররে পুরোনো শুকনো মৃতদেহ-"লৌলান সুন্দরী" উদ্ধার করা হয়। প্রাচীনতম লৌলান নগরে এখনো ভাঙ্গা মৃৎপাত্রাদির টুকরা, পশমী কাপড়ের টুকরা, তাম্র মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, রেশমী কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি পড়ে থাকতে দেখা যায়।

খানাস হ্রদ

খানাস হ্রদ উত্তর অঞ্চলের বুলচিন জেলার জেলা-রাজধানী থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে। খানাস হ্রদ আলতা পাহাড়ের গভীর বনে অবস্থিত এক পাহাড়ী হ্রদ। "খানাস" মংগোলীয় ভাষার একটি শব্দ। এর অর্থ হলো উপত্যকার হ্রদ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে খানাস হ্রদের উচ্চতা হলো ১৩৭৪ মিটার। হ্রদের গভীরতা ১৮৮.৫ মিটার। আয়তন ৪৫.৭৩ বর্গকিলোমিটার। খানাস হ্রদের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে তুষার আবৃত শৃঙ্গ। ঝলমলে হ্রদ আর পাহাড়ের দৃশ্য অতি মনোরম। জায়গাটি চীনের একমাত্র জায়গা যেখানে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার আঞ্চলিক প্রাণী আর উদ্ভিদের চমৎকার বিন্যাস ঘটেছে। কর্তৃপক্ষের মতে এখানে প্রায় ৮০০ ধরনের গাছ, ৩৯ ধরনের পশু, ১১৭ ধরনের পাখি, ৪ ধরনের উভয়চর সরীসৃপ, ৭ ধরনের মাছ, ৩০০ ধরনের কীটপতঙ্গ আছে। এগুলোর মধ্যে অনেক ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ জিনজিয়াং অথবা গোটা চীনেও বিরল। এখানে বন আর তৃণভূমি পালাক্রমিকভাবে বিন্যস্ত এবং নদনদী ও হ্রদ বহুল। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে পর্যটকদের কাছে এর অনেক চাহিদা রয়েছে।

জিনজিয়াং প্রদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনপরিসংখ্যান

জাতি	১৯৪৫	১৯৮২	১৯৯৬	২০০২	২০১০	
উইঘুর	২৯৮৮৫২৮	৫৯৯৫৯৪৭	৭৯১৬০১৩	৮৬৯২৩০০	১০০০১৩০২	৪৫.৮%
হান	২২২৪০১	৫২৮৩৯৭১	৬৪৩২৮১৬	৭৫৯৫৭০০	৮৮২৯৯৯৪	৪০.৫%
কাজাখ	৩৮৫৭৫	৯০৩৩৩৭	১২৫৮৫২১	১৩৩৩৫০০	১৪১৮২৭৮	৬.৫%
হুই	৯৯৬০৭	৫৬৭৬৮৯	৭৬০১৮১	৮৫৪৬০০	৯৮৩০১৫	৪.৫%
কিরগিজ	৬৯৯২৩	১১২৩৬৬	১৬০৪৮৩	১৭১৩০০	১,৭৩,৭০০	০.৮%
মোঙ্গল	৫৯৬৮৬	১১৭৫১০	১৫৫৪১৫	১৬৩৮০০		০.৭%

তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া

জিনজিয়াংয়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস

Historical population

Year	Pop.	±%
১৯১২ [১১৮]	২,০৯৮,০০০	
১৯২৮ [১১৯]	২,৫৫২,০০০	+২১.৬%
১৯৩৬-৩৭ [১২০]	৪,৩৬০,০০০	+৭০.৮%
১৯৪৭ [১২১]	৪,০৪৭,০০০	৺৭.২%

১৯৫৪ [১২২]	৪,৮৭৩,৬০৮	+২০.৪%
১৯৬৪ [১২৩]	৭,২৭০,০৬৭	+৪৯.২%
১৯৮২ [১২৪]	১৩,০৮১,৬৮১	+৭৯.৯%
২০০০ [১২৬]	১৮,৪৫৯,৫১১	+২১.৮%
২০১০ [১২৭]	২১,৮১৩,৩৩৪	+১৮.২%

সূত্র: National Bureau of Statistics of China. Archived from the original on July 27, 2013.

জিনজিয়াং প্রদেশে হানদের সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে আসা হয়।

জিনজিয়াং প্রদেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা তালিকা (১ মিলি. = ১০ লাখ)

জাতি	১৯৪৫	১৯৮২	১৯৯৬	২০০৮
মোট জনসংখ্যা	৩.৬ (মিলি.)	১৩.১ (মিলি.)	১৬.৮ (মিলি.)	২১.৩ (মিলি.)
উইঘুর	৮২.২ (শতকরা)	৪৫.৭ (শতকরা)	৫০.৬ (শতকরা)	৪৬.১
হান	৬.২	৪০.৩	৪১.১	৩৯.২
হুই	২.৮	৪.৩	৪.৯	৪.৫
কাজাখ	১.১	৬.৯	৮.০	৭.১
অন্যান্য	৭.২	২.৮	২.৮	৩.১

থ্যসূত্র: **Chaudhuri, Debasish,** "A Survey of the Economic Situation in Xinjiang and its Role in the Twenty- First Century," *China Report*, **41**, 1: 1–28, 2005 & 2010

রাজধানী উরামকি; বৈষম্যের সাক্ষী

উইঘুরপ্রধান জিনজিয়াং প্রদেশের রাজধানী উরামকি বা উরামকি। উরামকি শব্দটির উইঘুর রূপ-ئۈرۈمچى; চায়নিজ রূপ- 乌鲁木齐 ; প্রতিবর্ণীকরণ *Wūlǔmùqí*), সংক্ষিপ্তরূপ **Wushi** (Chinese: 乌市 ; প্রতিবর্ণীকরণ- *Wūshì*); এটি একটি Prefecture level city (প্রিফেকচুর লেভেল সিটি) বা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক শহর। প্রশাসনিক অফিস আদালত এবং কর্মকর্তাদের বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু।

ওয়ার্ল্ড গিনেস রেকর্ডে এই শহরটির নাম রয়েছে। রেকর্ডটি হলো উরামকির জাংগারিয়া বেসিন সমুদ্র থেকে ২৬৪৮ কিমি. বা ১৬৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। যা 'নিকটবর্তী সমুদ্র থেকে সর্বোচ্চ দূরত্বের শহর' হবার রেকর্ড।

এক নজরে উরামকি সিটি

দেশ	চীন
স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল	শিনচিয়ান বা জিনজিয়াং
কাউন্টি পর্যায়ের বিভাগ	৮
সিপিসি কমিটি সচিব	শু হেইরং
মেয়র	ইয়াসিম সাদিক
প্রিফেকচার পর্যায়ের শহর	১৪৫৭৭ কিমি. ৫৬২৮ ব.মা.
মূল শহর	৫৮৩ কিমি. ২২৫ ব.মাইল
জনসংখ্যা (২০১৭ আদমশুমারি) পিফেকচার পর্যায়ের শহর আনুমানিক (২০১৫) জনঘনত্ব মূল শহর (২০১৭)	৩৫,১৯,৬০০ ৩৫, ৫০, ০০০ ২৪০/কিমি. (৬৩০/ব.মা.) ৩৫,৭৫,০০০
Time zone	*De jure*: China Standard(UTC+8) *De facto*: both China Standard (UTC+8) and Ürümqi Time (UTC+6)
পোস্টাল কোড এরিয়া কোড ISO 3166 কোড	৮৩০০০০ ৯৯১ CN-XJ-01
জিডিপি (২০১৭)	চায়না মুদ্রায় ২৭৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে ৪০.৬৫ বিলিয়ন
মাথাপিছু জিডিপি	৭৭, ৯৫৮ চায়না মুদ্রা ১১, ৫৪৯ মার্কিন ডলার

উরামকি চীনের শীর্ষ বায়ু দূষণ কবলিত ১০টি শহরের একটি। বায়ু দূষণ চীনের একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অতিমাত্রায় শিল্পায়নের ফলেই যে এ দূষণের সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সম্প্রতি এক দশকে চীনা সরকার দূষণের বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ২০১৬ সালে তারা বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২০১১-২০১৬ সাল পর্যন্ত সময়ে বায়ু দূষণ রোধে ব্যয় করে ৮৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫ ট্রিলিয়ন ইয়ান। জনসচেতনতা বাড়াতে হাতে নেয় অভিনব অনেক পদক্ষেপ। ২০২০ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এতে বলা হয় রাজধানী বেইজিংসহ প্রধান প্রধান শহরগুলোতে কয়লার ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে ৫০ ভাগে। ইতোমধ্যে অনেক কয়লাভিত্তিক কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এমনকি অনেক শহরতলী ও গ্রাম এলাকার বাসাবাড়িতেও রান্নার জন্য কয়লার পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করতে

প্রশাসনিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে ২০১৮ সালে গ্যাসের দাম বেড়ে যায়।

উরামকির এতসব কলকারখানা, আকাশচুম্বী কর্পোরেট বিল্ডিং এর অধিকাংশই হান চায়নীজদের দখলে। হানরা এখন প্রায় ৪৫% অথচ আশির দশকের আগে তারা সংখ্যায় ছিল মাত্র ১০ ভাগেরও কম। কমিউনিস্ট চাইনিজরা কিরকম ভয়ংকর ভাবে ধীরেধীরে একটি জাতির হাজার বছরের ইতিহাস মুছে দিতে বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে তা বিশ্বাস করাও কঠিন। জিনজিয়াং এর রাজধানী সে বৈষম্যের সাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগে এরকম অমানবিক কর্ম পৃথিবীবাসীর সামনে ঘটে চলেছে বছরের পর বছর ধরে কিন্তু কারো যেন কোন বিকার নেই। নিচের সারণিগুলো লক্ষ্য করুন।

রাজধানী উরামকি ও এর কাউন্টি বা জেলা শহরগুলোতে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অবস্থান:

জেলা/শহর	জনশক্তি	হান	উইঘুর	হুই	কাজাখ	অন্যান
উরামকি (মিলিয়ন)	২.৪১	১.৭৫	০.৩১	০.২৪	০.০৭	০.০৪
তিয়ানশান(শতকরা)	২২.৮	২০.২	৪০.১	১৫.৪	২৩.৪	২৯.০
শাইবেইক(শতকরা)	২১.৮	২৩.০	২২.২	১৫.০	১১.৯	২৪.৬
জিনশি (শতকরা)	২১.৫	২৪.০	১৬.৪	১৩.৩	৭.৬	২৩.৯
শুইমগু (শতকরা)	১০.৯	১২.৬	৮.৫	৩.৯	৪.১	৫.৪

তথ্যসূত্র: Anthony Howell and C. Cindy Fan; Department of Geography, University of California, Los Angeles; Migration and Inequality in Xinjiang: A Survey of Han and Uyghur Migrants in Urumqi; 2010

চীনের অন্যান্য প্রদেশ

সমগ্র চীন কতগুলো প্রদেশ, স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রশাসিত মহানগরে বিভক্ত। আবার প্রদেশ ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলগুলি স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্য, জেলা, স্বায়ত্তশাসিত এবং শহরে বিভক্ত। জেলাগুলি স্বশাসিত জেলা এবং শহর মহকুমা, সংখ্যালঘু জাতির মহকুমা এবং ক্ষুদ্র নগরে বিভক্ত। এছাড়া প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলও প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বর্তমানে চীনে ৪টি কেন্দ্রশাসিত মহানগর, ২৩টি প্রদেশ, পাঁচটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং ২টি বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলসহ মোট ৩৪টি প্রদেশ পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিট আছে।

৪টি কেন্দ্রশাসিত মহানগর হলো বেইজিং, সাংহাই, থিয়েনচিন ও ছুংছিং।

ক্রম	মহানগর	সংক্ষিপ্ত নাম	রাজধানী	জনসংখ্যা	আয়তন
০১	বেইজিং	京/Jīng	বেইজিং	১,৯৬,১২,৩৬৮	১৬, ৮০০
০২	সাংহাই মিউনিসিপ্যালিটি	沪 /Hù	সাংহাই	২,৩০,১৯,১৪৮	৬,৩৪১
০৩	থিয়েনচিন মিউনিসিপ্যালিটি	津/Jīn	থিয়েনচিন	১,২৯,৩৮,২২৪	১১,৩০৫
০৪	ছুংছিং মিউনিসিপ্যালিটি	渝 /Yú	ছুংছিং	২,৮৮,৪৬,১৭০	৮২,৩০০

বর্তমানে চীনের ২৩টি প্রদেশ

চীনের ২৩ টি প্রদেশ; এক নজরে (২০১০ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী)					
ক্র	প্রদেশ	সংক্ষিপ্ত নাম	রাজধানী	জনসংখ্যা	আয়তন(বর্গ কিমি.)
০১	হপেই	চি	সিচিয়াচুয়াং	৭,১৮,৫৪,২০২	১৮৭,৭০০
০২	শানসি	চিন	থাইইউয়ন	৩৫,৭১২,১১১	১৫৬,৩০০
০৩	লিয়াওনি	লিয়াও	সেনইয়াং	৪৩,৭৪৬,৩২৩	১৪৫,৯০০
০৪	চিলিন	চি	ছাংছুন	২৭,৪৬২,২৯৭	১৮৭,৪০০
০৫	হেইলুংচিয়	হেই	হারপিন	৩৮,৩১২,২২৪	৪৫৪,০০০
০৬	চিয়াংসু	সু	নানচিং	৭৮,৬৫৯,৯০৩	১০২,৬০০
০৭	চেচিয়ং	চে	হাংচৌ	৫৪,৪২৬,৮৯১	১০২,০০০
০৮	আনহুই	ওয়ান	হ্য ফেই	৫৯,৫০০,৫১০	১৩৯,৭০০
০৯	ফুচিয়েন	মিন	ফুচৌ	৩৬,৮৯৪,২১৬	১২১,৩০০
১০	চিয়াংসি	ক্যান	নানছাং	৪৪,৫৬৭,৪৭৫	১৬৭,০০০
১১	শানতুং	লু	চিনান	৯৫,৭৯৩,০৬৫	১৫৩,৮০০
১২	হনান	ইউয়্য	চেনচৌ	৯৪,০২৩,৫৬৭	১৬৭,০০০
১৩	হুপেই	এ্য	উহান	৫৭,২৩৭,৭৪০	১৮৫,৯০০
১৪	হুনান	সিয়াং	ছাংশা	৬৫,৬৮৩,৭২২	২১০,০০০
১৫	কুয়াংতুং	ইয়ো	কুয়াংচৌ	১০৪,৩০৩,১৩২	১৮০,০০০
১৬	হাইনান	ছোং	হাইখৌ	৮,৬৭১,৫১৮	৩৪,০০০
১৭	সিছুয়াং	ছুয়ান বা শু	ছেনতু	৮০,৪১৮,২০০	৪৮৫,০০০
১৮	কুইচৌ	ছিয়েন বা কুই	কুইইয়াং	৩৪,৭৪৬,৪৬৮	১৭৬,০০০
১৯	ইউন্নান	তিয়েন বা ইউয়ুন	খুনমিং	৪৫,৯৬৬,২৩৯	৩৯৪,০০০

২০	শাআনসি	শ্যান বা ছিন	সি আন	৩৭,৩২৭,৩৭৮	২০৫,৬০০
২১	কানসু	ক্যান বা লুং	লানচৌ	২৫, ৫৭৫,২৫৪	৪৫৪,৩০০
২২	ছিংহাই	ছিং	সিনিং	৫,৬২৬,৭২২	৭২১,২০০
২৩	থাইওয়ন	থাই	থাইপেই	--	--

বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চল ২টি

ক্রম	বিশেষ	সংক্ষিপ্ত	রাজধানী	জনসংখ্যা	আয়তন(বর্গকিমি.
০১	হংকং	港 /এহম	হংকং	৭,০৬১,২০০	১,১০৪
০২	মাকাউ	澳 /স্বড়	মাকাউ	৫৫২,৩০০	২৯

স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল ৫টি

ক্রম	স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	সংক্ষিপ্ত নাম	রাজধানী	জনসংখ্যা	আয়তন (বর্গ কিমি.)
০১	অন্তমঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	অন্তমঙ্গোলিয়	হুহাওট	২,৪৭,০৬,৩২১	১১,৮৩,০০০
০২	তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	চাং	লাসা	৩,০০২,১৬৬	১,২২৮,৪০০
০৩	কুয়াংসি চুয়াং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	কুই	নাননিং	৪৬,০২৬,৬২৯	২৩৬,০০০
০৪	নিংসিয়া হুইজাতি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	নিং	ইনছুয়ান	৬,৩০১,৩৫০	৬৬,৪০০
০৫	জিনজিয়াং উইঘুরজাতি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল	শিন	উরামুচি	২১,৮১৩,৩৩৪	১,৬৬০,৪০০
তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া					

চীনের অন্যান্য মুসলিম

উইঘুর ছাড়াও চীনে রয়েছে অন্যান্য বেশ কিছু মুসলিম জাতিগোষ্ঠী। তাদের নিয়ে চীন সরকারের তেমন মাথাব্যাথা নেই। কারণ সুদূর অতীত থেকে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব তাদের মধ্যে গেঁথে গেছে। চীনাদের সাথে তারা মিশে গেছে। আবার অন্যদিক থেকে বলা যায় তাদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা কম। ইসলাম গভীরভাবে তারা অনুসরণ করে না। সেক্যুলার ও ইসলামি জীবনব্যবস্থার পার্থক্য তারা বুঝে না। ইসলামী শিক্ষা চর্চার পরিবেশ না থাকায় তাদের মধ্যে সে বোধ তৈরি হয়নি। ফলে তারা সহজেই

চীনা সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে পেরেছে। তবে তাদের মসজিদ যে নেই তেমন নয়। বরং তাদের সাথে চীনা সরকারের বেশ ভাল সম্পর্ক রয়েছে। চীনা সরকার তাদের সেসব মসজিদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে নিয়মিত অর্থায়নও করে থাকে। বিশ্ব মিডিয়ায় চীনা প্রেসিডেন্ট ও সরকারি কর্তাব্যক্তিদের মুসলিমদের সাথে হাস্যজ্বল যেসব ছবি আমরা দেখি তা মূলত সেসব সেক্যুলার মুসলিমদেরই। নিচের সারণিতে তাদের একটি অবস্থানগত চিত্র তুলে ধরা হলো-

ক্রম	জাতি	অঞ্চলে বসবাস (%)	জনসংখ্যা
০১	হুই	নিংজিয়া (১৯.০), গানশু (১২.১), হেনান (৯.৭), জিনজিয়াং (৮.৬), কিংঘাই (৭.৭), ইউনান (৬.৬), হেবেই (৫.৫), শানডং (৫.১) এই আটটি প্রদেশে মোট= ৭৪.১ ভাগ	৯৮,১৬,৮০৫
০২	উইঘুর	জিনজিয়াং (৯৯.৪)	৮৩,৯৯,৩৯৩
০৩	কাজাখ	জিনজিয়াং (৯৯.৬)	১২,৫০,৪৫৮
০৪	ডংজিয়াং	গানশু (৮৭.৯), জিনজিয়াং (১০.৯)	৫,১৩,৮০৫
০৫	খালখাস	জিনজিয়াং (৯৮.৪)	১,৬০,৮২৩
০৬	সালার	কিংঘাই (৮৩.৩),গানশু (১১.৩), জিনজিয়াং	১,০৪,৫০৩
০৭	তাজিক	জিনজিয়াং (৯৬.৩)	৪১,০২৮
০৮	বাওন	গানশু (৯১.৯), কিংঘাই (৩.৮), জিনজিয়াং	১৬,৫০৫
০৯	উজবেক	জিনজিয়াং (৯৭.৮)	১২,৩৭০
১০	তাতার	জিনজিয়াং (৯২.০)	৪,৮৯০
তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া			

উইঘুরদের সচ্চরিত্রের ব্যাপারে চীনাদের স্বীকৃতি

উইঘুরদের সম্পর্কে চীনাদের ধারণা মন্দ নয়। আসল সত্যিটা তারা জানে। তারা জানে উইঘুররা নম্র ভদ্র শালীন ও শান্তিপ্রিয়। যেমন চীনা সরকারি বাংলা রেডিও বিভাগের ওয়েবসাইটে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে...

"উইঘুরজাতি উত্তর চীনের এক প্রাচীনতম জাতি। উইঘুর জাতি নিজেকে উইঘুর ডাকে। এর অর্থ হলো ঐক্য বা সংযুক্ত হওয়া। উইঘুর জাতি জিনজিয়াংয়ের প্রধান জাতি। এর লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ। উইঘুর জাতির লোক সোটা জিনজিয়াংয়ে ছড়িয়ে আছে। তাদেরও বেশীর ভাগ দক্ষিণ থিয়েনশান পাহাড়ের কাশি (কাশগড়), হ্যথিয়েন (হোতান), আখসু

প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করে থাকেন। উইঘুর জাতির নিজের ভাষা আর অক্ষর আছে।

উইঘুর জাতির ঐতিহ্যবাহী পোশাক হলো, আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই চার কোনার ফুল-তোলা টুপি পরেন। পুরুষরা বাইরে চীনা স্টাইলের ছাবান অর্থাৎ বোতাম মাঝখানে লাগানো আছে এমন লম্বা ঢিলা পরিচ্ছদ এবং ভিতরে চীনা-স্টাইলের ফুল-তোলা শর্ট পোশাক পরতে পচ্ছন্দ করেন। নারীরা শার্ট-যুক্ত স্কার্ট এবং তার বাইরে কালো রঙ আস্তিনবিহীন কোর্ট পরতে পছন্দ করেন। তারা দুল, বালা, আংটি আর হার পরেন। অবিবাহিতা মেয়েরা মাথায় বেণী বাঁধে। এখন শহরবাসীরা এই ফ্যাশন করতে পছন্দ করেন।

উইঘুর জাতি ভদ্র ও বিনীত জাতি। প্রবীণ বা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তারা ডান হাত বুকে রেখে মৃদু ভাবে নত হয়ে সালাম দেন। উইঘুর জাতি নৃত্য ও সংগীত প্রিয় ও নিপুণ জাতি। তাদের নৃত্য শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দযপূর্ণ এবং দ্রুতবেগে ঘুরবার ও পরিবর্তনশীল নামে পরিচিত। এতে উইঘুর জাতির প্রফুল্ল ও সুখপূর্ণ স্বভাব প্রতিফলিত হয়।

উইঘুর জাতি কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে পশুপালনের কাজও করে। তাদের আছে ব্যবসা করার ঐতিহ্য। তাদের ঐতিহ্যিক হস্তশিল্প অত্যন্ত উন্নত এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিল্পসুলভ মানসম্পন্ন। তাদেরও তৈরী কার্পেট, সূচি-কর্ম, রেশমী কাপড়, তামার কেটলি, ছুরি, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি সবই-এই জাতির বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

মাও সেতুংয়ের বর্বর সাংস্কৃতিক বিপ্লব কি ফিরে এসেছে?

বামপন্থি মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবী মহলে কিংবা মিডিয়ায় মাও সেতুংকে মহান নেতা হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও বাস্তবে মাও সেতুং ও তার সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে অনেক সমালোচনা রয়েছে। এমন অদ্ভুত সব কর্মকাণ্ড তার সময়ে ঘটেছে যা সুস্থ মস্তিকে চিন্তাও করা যায় না। এবং ঘটনাগুলোর মাধ্যমে চীনাদের বর্বর মানসিকতা ও উদ্ভট আচরণের কিছুটা ধারণাও পাওয়া যায়।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে বিবিসি বাংলার অনলাইন ভার্সনে একটি ফিচার প্রকাশিত হয়। যার শিরোনাম "চীনে মাও সেতুং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্মৃতি"। যাতে ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত মাও সেতুংয়ের রেড আর্মি বাহিনীর মাধ্যমে সংঘটিত বিপ্লবে অংশ নেয়া একজন সৈনিকের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। সাক্ষাৎকারদাতার নাম সু। রেড আর্মি বা লাল ফৌজের সৈনিক হিসেবে তারা কী করেছিল তার একটা বর্ণনা সে দেয়। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরোনো যে কোন কিছু ভেঙ্গে ফেলতো। জমিদার, উচ্চবিত্ত ও শিক্ষকদের অপমানিত করতো এমনকি মেরেও ফেলতো।

..."তাদের (মাও সেতুংপন্থিদের) ভাষায় যা-ই পশ্চাৎপদ, বা ক্ষয়িষ্ণু-তার বিরুদ্ধেই রেড গার্ডরা এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতো। তারা লোকের বাড়িঘরে ঢুকে আসবাবপত্র ভেঙে দিতে লাগলো। প্রসাধনী বিক্রি করে এমন দোকানও ভেঙে দিতে লাগলো তারা। করো চুল বেশি লম্বা মনে হলে তাকে ধরে চুল কেটে দেয়া হতে লাগলো।

চারটি পুরোনো জিনিসের বিরুদ্ধে শুরু হলো তাদের অভিযান। পুরোনো অভ্যাস। পুরোনো ধ্যান ধারণা। পুরোনো ঐতিহ্য আর পুরোনো সংস্কৃতি। পুরোনো যে কোন কিছুই আক্রান্ত হলো।

আপনি যদি পুরোনো আমলের কোন সামগ্রী পান—যে কোন আসবাব, আপনার যদি মনে হয় যে এটা আধুনিক নয়—আপনি ধরে নিলেন যে সেটা পুরোনো। যদি এমন কোন কাপড় চোপড়ও পাওয়া যায়—যা খুব বেশি রকমের সুন্দর—বেশি রংচঙে—আপনি বলে দিলেন, এটাও পুরোনো। এ ক্ষেত্রে রেডগার্ডের তরুণরা যা বলবে তাই।

সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু ছিলেন ভূস্বামীরা। এরা ছিলেন এক সময়কার ধনী এলিট। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়টায় এই ভূস্বামীরা আর ধনী ছিলেন না। তারা ধনী ছিলেন ১৯৪৯ সালের আগে। কিন্তু আমরা ভাবলাম, তাদের বাড়িতে গেলে পুরোনো জিনিস পাওয়া যাবে। আমার মনে আছে, একটি পরিবার আতংকিত হয়ে পড়েছিল। তারা বললো- তোমরা যা নিতে চাও, নিয়ে যাও। কোন বাধাই দেয়নি তারা।

সু-র মতো রেডগার্ডদের জন্য এই আন্দোলন ছিল খুবই উত্তেজনাকর। হঠাৎ তারা উপলব্ধি করলো তারাই যেন দেশ চালাচ্ছে। তারা দেশের সব জায়গায় যেতে পারছে। তারা যা বলছে সবাই তা করতে বাধ্য হচ্ছে। যারা তাদের কথা শুনছিল না। তাদের জন্য প্রকাশ্যে অপমান করা হতে লাগলো। তাদের ভুল ধরিয়ে দেয়া হতে লাগলো। পুরো চীন জুড়ে

রেডগার্ডরা এই কর্মসূচি চালু করলো- এর শিকার হলেন স্থানীয় কর্মকর্তারা এমনকি ছাত্ররাও। তাদের প্রকাশ্যে তিরস্কার করা হতো, কখনো কখনো শারীরিকভাবেও লাঞ্ছিত করা হতো।

"আমার কাজ ছিল শুধু সেখানে বসে থাকা এবং নানা রকমের শ্লোগান দেয়া। তবে কখনোই তা শারীরিক লাঞ্ছনার পর্যায়ে যায়নি।"

এই রকম গণঅপমান কর্মসূচির একটা বড় লক্ষ্য ছিল শিক্ষকরা। সারা চীন জুড়ে ক্লাসরুম আর লেকচার হলে শিক্ষকদের গালাগালি এবং অপমান করতো ছাত্ররা। তাদের পরিয়ে দেয়া হতো গাধার টুপি, যা তাদের ভুল স্বীকারের চিহ্ন। কাউকে কাউকে কলমের কালি খাইয়ে দেওয়া হতো, বা মাথার চুল কামিয়ে দেয়া হতো। কারো কারো গায়ে থুথু ছিটানো হতো। অনেককে আবার মারধরও করা হতো। কিছু ক্ষেত্রে মেরেও ফেলার ঘটনাও ঘটেছে।....

এ সংক্রান্ত আরো একটি প্রতিবেদন দেখা যাক। লেখাটি চীনের দ্য পিপলস ডেইলি অবলম্বনে...

চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর অদ্ভুত ও বর্বর কিছু ঘটনা

মাও সেতুং এর অধীনে চীনের বাসিন্দাদের জীবন ছিল অদ্ভুত এবং বর্বর। তিনি যখন চীনের অধিপতি ছিলেন, এমন কিছু নিয়ম নীতি চালু করেছিলেন, যা তেমন কার্যকরী ছিল না বরং এতে তার নিজেরই ৫-৭ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। মাও সেতুং এর ব্যক্তিত্ব চীনাদের কাছে এতটাই জনপ্রিয় ও পূজনীয় ছিল যে, তার প্রভাবে চীনের মানুষ একটু অদ্ভুত স্বভাবের হয়ে গিয়েছিল। এ সময়কার চীনের অদ্ভুত কিছু ঘটনা বা অজানা গল্প রয়েছে যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

প্রথমবার 'আম' দেখে অবাক!

১৯৬৮ সালে, পাকিস্তানের তৎকালীন এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাও সেতুংকে উপহার হিসেবে এক ঝুড়ি আম পাঠিয়েছিলেন। মন্ত্রীর কাছে এটা একটা

সাধারণ সৌজন্যতা ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্তু চীনে এতে আলোড়ন ও উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছিল। মাও তার প্রচার দলের কিছু সদস্যের কাছে আমগুলো দেন, কিন্তু ব্যাপারটা তারা এমনভাবে নিয়েছিল এবং এমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল যেন, মাও স্বর্গ থেকে কোন দেবদূতকে ধরে নিয়ে এসে তাদের সামনে দিয়েছিলেন। দ্য পিপলস ডেইলি দৈনিকের একটি লেখায় লিখেছিল যে, আম পাওয়ার খুশিতে "তাদের সকলের চোখে আনন্দ অশ্রু এসে পড়েছিল" আর তারা "আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার ও উল্লাসে ফেটে পড়েছিল"।

একটি টেক্সটাইল কারখানায় তাদের আমটি একটি মঠের উপর রেখে তা এমন জায়গায় স্থাপন করেছিল যেন শ্রমিকরা কারখানায় প্রবেশের সময় সেই আমের সামনে দিয়ে যেতে পারে এবং সম্মান দেখিয়ে কারখানায় ঢুকতে পারে। আমটি যখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তখন তারা আমটির একটি প্রতিকৃতি তৈরি করে মঠের উপরে স্থাপন করেছিল যাতে শ্রমিকরা আমের পূজা সেরে নিয়ে দিনের কাজ শুরু করতে পারে।

আমকে মিষ্টি আলুর সাথে তুলনা করায় মৃত্যুদণ্ড!

সত্যিই কি আম দেখতে মিষ্টি আলুর মতন?

তখন বেশিরভাগ চীনা লোক আগে কখনোই আম দেখেনি, একজন ব্যক্তির জন্য গ্রীষ্মকালীন এই রসালো ফলটি দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা এমন ছিল যেন এটা জীবনের বড় কোন একটা অর্জন। তখন সবার এমনটাই প্রত্যাশিত ছিল। এক দন্ত্যচিকিৎসকের সুযোগ হয়েছিল একটি আম দেখার, কোন কারণে আমটি দেখে সে তেমন মুগ্ধ হয়নি। সে আমকে মিষ্টি আলুর মতো বলে নিন্দা করেছিল, যা লোকজনকে তার উপর ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। দন্ত্য চিকিৎসককে "বিপ্লব বিরোধী বক্তব্য" দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল এবং কিছুদিন পরে আমকে মিষ্টি আলুর মতো দেখতে বলায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এরপর কেউ আর আম নিয়ে উপহাস করার সাহস করেনি।

মাও যুগে ডাকটিকিট সংগ্রহ ছিল অপরাধ!

১৯৫০ সালের একটি চীনা ডাকটিকিট। মাও সেতুং তার দেশে বুর্জোয়াদের যে কোন চিহ্ন নির্মূল করা চেষ্টা করেছিলেন। অনেক সময় তা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও ধনী ভূস্বামীদের নির্মূল করার মাধ্যমে। আবার অনেক সময় তা ছিল শিশুদের ডাকটিকিট সংগ্রহে বাঁধা দেওয়ার মাধ্যমে। জনশ্রুতি আছে যে, মাও সেতুং ডাকটিকিট সংগ্রহ করাকে ঘৃণা করতেন। এ কাজকে তিনি বুর্জোয়াদের একটি বিনোদন হিসেবে দেখতেন। যখন সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু হয়, তখন ডাকটিকিট সংগ্রহ হিসেবে রাখতে তার লোকজনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

এই শাসন মাও সেতুং মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত বলবৎ ছিল তবে শখের চীনা সংগ্রাহকদের উপর চড়াও হওয়ার আগেই তারা ডাকটিকিট সরিয়ে ফেলেছিল। মজার বিষয় হলো, মাও এর এই নিষেধাজ্ঞার প্রভাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নিষিদ্ধ হওয়া সেইসব ডাকটিকিটের চাহিদা এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি এবং মূল্যবান।

শিক্ষকদের মারধর করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান!

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার জনগণকে "পুরাতন সমাজের মন্দ অভ্যাসগুলো দূর" করতে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের পুরাতন ধ্যান ধারণার পতন ঘটাতে উৎসাহিত করেছিল। ১৯৬৬ সালে কমপক্ষে ৯১টি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষককে রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং যতক্ষণ না তাদের দুর্নীতিবাজদের নথিভুক্ত করা হয়েছিল, তাদের মারধর করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে, শিক্ষকদেরও পোষাকে লাল রঙ ছুড়ে দিয়ে শিক্ষার্থীরা X চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিল এবং বোর্ডে তাদের নাম লিখে লাল রঙের X চিহ্ন দিয়ে কেটে গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর পেরেক-ফুটানো লাঠি দিয়ে তাদের পিটিয়ে এবং ফুটন্ত পানিতে ঝলসে দেওয়া হয়েছিল যতক্ষণ না তারা মারা যায়। শেষ পর্যন্ত, ১৮ জন শিক্ষাবিদ তাদের শিক্ষার্থীদের হাতে নিহত হয় এবং আরও অনেকে অপমানে আত্মহত্যা করেছিল। অন্যদিকে, মাও সেতুং নিশ্চিন্তে বসেছিলেন এবং তার

নিরাপত্তা বাহিনীকে শিক্ষার্থীদের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ না করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি পুরো দুই বছর ধরে এই অবস্থা চলতে দিয়েছিলেন।

নির্মাণ উপকরণ যোগাতে ভাঙা হয় গ্রেট ওয়াল!

১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, চীনা সরকার অনুধাবন করেছিল, আবাসনের নির্মাণ উপকরণের জন্য এত অর্থ অপচয়ের দরকার নেই। তাদের সামনে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা দেয়াল রয়েছে যা অযথাই জায়গা দখল করে আছে। তারা জনগণকে ঘর নির্মাণে গ্রেট ওয়ালের ইট খুলে ব্যবহারে উৎসাহিত করেছিল, এই সুযোগে যদি এই পুরনো জঞ্জালও পরিষ্কার হয়ে যায়। গ্রেট ওয়ালের কাছাকাছি গ্রামবাসীরা সেখান থেকে ইট খুলে তাদের বাড়ী নির্মাণে ব্যবহার করেছিল। এমনকি সরকার একটি বাঁধ নির্মাণের উপকরণের জন্য গ্রেট ওয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছিল।

'বাঘ জনগণের শত্রু' ঘোষণা দিয়ে বাঘ প্রায় নির্মূল!

১৯৫৯ সালে, চীনে কৃষকরা বাঘের আক্রমণের মুখে পড়লে, মাও বাঘের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। মাও বাঘ, নেকড়ে এবং চিতাবাঘকে "জনগণের শত্রু" এবং এদের নির্মূল করা উচিত বলে ঘোষণা করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির কয়েকটি 'বালাই-নাশক' প্রচারাভিযানে, জনগণকে শিকারী প্রাণীদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে উৎসাহিত করেছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে, চীনারা বিশ্বের ৭৫ শতাংশ দক্ষিণ এশীয় বাঘ হত্যা করেছিল এবং এইসব প্রাণীদের বিলুপ্তির পথে নিয়ে এসেছিল।

লোকজন লাল ট্রাফিক বাতি দেখে চলবে, সবুজ বাতিতে থামবে

রেড গার্ড যেকোন রকমের বিপ্লববিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতি সর্বদা চোখ রাখত। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে তাদের নজরে পড়লো এমন একটি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ণ কাজের। লোকজন লাল ট্রাফিক বাতি দেখলে তাদের গাড়ি থামিয়ে দিত। যেহেতু পার্টির রঙ লাল ছিল, লাল বাতিতে থামা এবং সবুজ বাতিতে চালনা করা "বিপ্লবের অগ্রগতিতে বাঁধা" মনে করা শুরু করলো পার্টির একদল সদস্য। তারা এর বন্ধের দাবিতে মিছিল শুরু করেছিল। তখন থেকে তারা ঘোষণা করেছিল, লাল বাতিতে চলতে তারা

লোকজনকে বাধ্য করবে। সৌভাগ্যক্রমে, চীনের প্রিমিয়ার বা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই রেড গার্ডদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই থামিয়ে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই তার লোকদের সাথে বৈঠকে বসেন এবং আশ্বস্ত করেন যে লাল বাতিতে থামা প্রতীকরূপে কিভাবে "সকল বিপ্লবী কর্মকান্ডের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেয়", বরং এর মাধ্যমে কোন দাঙ্গার আক্রমণ বা ট্রাফিক দুর্ঘটনা এতে সহজে এড়ানো সম্ভব।

টাই রাখার দায়ে গ্রেপ্তার!

টাইকে মনে করা তো পুঁজিবাদী চিহ্ন। লেখক লিয়াং হেং এর মতে, মাও সেতুং এর শাসনামলে লোকজনকে ভালো পোশাক পরিধানের জন্য শাস্তি পেতে হতো। লিয়াং এক গল্পে লিখেছিলেন, তার বাবার কাছে একটি গলায় পরার টাই পাওয়ার কারণে তার বাবাকে প্রায় কারাগারে পাঠানোর মতো অবস্থা তৈরি হয়েছিল। রেড গার্ডের সদস্যরা লিয়াংয়ের বাবার জিনিসপত্রে একটি টাই খুঁজে পেলে তারা লিয়াংয়ের বাড়িতে হামলা করেছিল। রেড গার্ডের এক সদস্য টাইটি তুলে ধরে ঘোষণা করেছিল এটা "পুঁজিবাদী" চিহ্ন। যখন তারা লিয়াংয়ের বাবার ঘরে তার একটি স্যুট ও কাফলিংক পেল, তখন লিয়াংয়ের বাবাকে তারা "দুর্গন্ধযুক্ত বুদ্ধিজীবী" বলে তিরস্কার করা শুরু করেছিল, তারপর সে তার সব কাপড় ও বই একসাথে করে পুড়িয়ে দিয়েছিল। লিয়াংয়ের বাবা কারাবরণ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল এই মর্মে যে তার জিনিসগুলো পুড়িয়ে দেওয়া "একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ" এবং এটা ভাল ব্যাপার। তারপরেও তার রক্ষা হয়নি। রেড গার্ডের সদস্যরা যাওয়ার আগে তার রেডিও এবং মাসের বেতন নিয়ে গিয়েছিল।

দলের প্রতি নিবেদিত প্রমাণে নরমাংস ভক্ষণ!

মাও সেতুং এর চীনে, নরমাংস ভক্ষণ প্রথা ছিল একটি বড় সমস্যা। কয়েকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, কিছু শিক্ষার্থী যারা তাদের প্রিন্সিপালদের হত্যা করেছিল, বিপ্লব বিরোধীদের বিরুদ্ধে বিজয় উদযাপনের উপায় হিসেবে তাদের লাশের মাংস খেয়েছিল। সরকার চালিত একটি ক্যাফেটেরিয়াতে প্রতিবাদস্বরূপ বিশ্বাসঘাতকদের মরদেহ মাংস হুকে ঝুলিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছিল এবং এদের মাংস দুপুরের খাবারে পরিবেশন করা হয়েছিল। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল গুয়াংজি প্রদেশে। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে, কেবল সেই প্রদেশে কমপক্ষে ১৩৭ জন লোককে হত্যা করে

খাওয়া হয়েছিল। মরদেহগুলো লোকজনের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ধারণা করা হয় কয়েক হাজার লোক নরমাংস ভক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। যারা এটা করেছিল তারা কেউই নিরুপায় ছিল না। নরমাংস ভক্ষণের এই কর্মকাণ্ড পার্টির প্রতি কোন ব্যক্তি কতটা উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত তা প্রদর্শনের উপায় হিসেবে করা হয়েছিল।

আমেরিকাকে এক লক্ষ নারী উপঢৌকন!

১৯৭৩ সালে মাও এর শেষের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনার আশায় তিনি হেনরি কিসিঞ্জারের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন। প্রথম দিকে, কিসিঞ্জার খুব গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু মাও এর মনে ছিল অন্য কিছু। মাও কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন, চীন একটি "অতি দরিদ্র দেশ"। বাণিজ্য চুক্তি করার মতো তেমন কিছুই নেই নারীরা ছাড়া। সেসময় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক লক্ষ নারী পাঠানোর প্রস্তাব করেন। মাও বলতেন, তার দেশে নারীর সংখ্যা বেশি এবং এরা অনেক সমস্যার কারণ। কীভাবে নারীরা তার দেশের ক্ষতি করছে তা যখন মাও বার বার বলতেন, তখন তার দলের এক সদস্য তাকে সাবধান করেছিলেন, যদি তার কথা বাইরে প্রকাশ হয়, "এটি জনগণের মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি করবে।" মাও বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, মৃত্যু পথযাত্রী ও ক্লান্ত হলেও, তাকে খুব চিন্তিত মনে হয়নি। "আমি কিছুতেই ভয় পাই না" চীনের অধিপতি কাশতে কাশতে বলে উঠতেন।

উইঘুরদের বইপত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়

মাও সেতুংয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠি ও শ্রেণিপেশার মানুষের মতো উইঘুররাও ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। উইঘুরদের জ্ঞানকেন্দ্র ছিল কাশগড়। এই কাশগড়ে ছিল প্রাচীন কিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা মাদরাসা। সেসব মাদরাসা থেকে অনেক বড় বড় শায়েখ, আলেম, সাহিত্যিক, কবি, ভাষাবিদ, গবেষক তৈরি হতো। সেখানে তৎকালীন প্রাজ্ঞ, জ্ঞান তাপসরা যেমন ছাত্রদের ইলম শিক্ষা দিতেন তেমনি তারা রচনা করতেন মূল্যবান অনেক কিতাব। উইঘুর ভাষায়, চীনা ভাষায়, তুর্কি ভাষায়, আরবি ভাষায়, রাশিয়ান ভাষাসহ উজবেক, কিরগিজ এবং এ জাতীয় অনেক স্থানীয় ভাষায়ও সেখানে প্রতিনিয়ত জ্ঞান চর্চা হতো।

মাও সেতুংয়ের লালবাহিনী অন্যান্য প্রাচীন জিনিস ভাঙ্গা এবং শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি অমর্যাদাকর কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় কাশগড় হোতান ইত্যাদি মুসলিম জনবহুল এলাকায়ও তাদের তাণ্ডবলীলা চালায়। মসজিদ, মকতব, ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক হামলা চালায়, ভাঙচুর করে। মাদরাসার বিশাল বিশাল কিতাবখানাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেখানকার শিক্ষকদের ওপর হামলা, নির্যাতন চালায়। গুম, খুন করে। এমনকি বাড়ি বাড়ি গিয়েও ব্যক্তিগত পাঠাগারের বই পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হয়। যা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রদত্ত স্বাক্ষাৎকারে তৎকালীন লালবাহিনীর কর্মীরা স্বীকার করেছে।

কাশগড়ের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ধারাবাহিকতা তখন থেকেই ব্যহত হয়। মাদরাসায় ছাত্র শিক্ষক সংখ্যা কমতে থাকে। যেকারণে গত কয়েক দশকে উইঘুর ভাষায় উচ্চ শিক্ষার বই পুস্তকের অভাব দেখা দেয়। উচ্চশিক্ষার জন্য বাধ্য হয়ে সেক্যুলার শিক্ষামুখি হতে হয় উইঘুরদের।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার উইঘুররা

আশির দশক থেকে চীনের দ্রুতবর্ধমান অর্থনীতি শুরু হয়। কিন্তু সে গতিশীল অর্থনীতি বা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হয়নি উইঘুরদের। নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন।

প্রাদেশিক র‍্যাংকিং	প্রদেশ বা জিনজিয়াং এর প্রিফেকচুয়ার বা জেলা	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)
	হোতান (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	১১১১
	কিজিসলু কিরগিজ(দক্ষিণ জিনজিয়াং)	১৭২৫
	কাশগড় (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	২০৩০
৩১	গুইঝউ	৩১০০
	ইলি (উত্তর জিনজিয়াং)	৩৩৫৬
৩০	গানশু	৩৪৮২
২৯	উইনান	৩৫১৬
২৮	তিব্বত	৩৬৩৩
	আকসু (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	৩৮৪১
	তুমুশুকে (জিনজিয়াং পিসিসি)	৪৩৭০
২৭	গুয়ানঝি	৪৪২৭
২৬	আনহুই	৪৫৬১
২৫	জিয়াংঝি	৪৫৬২
২৪	শিচুয়ান	৪৬৮৬
	আলতেই (উত্তর জিনজিয়াং)	৪৮৪৮
২৩	হেনান	৫০২৫
২২	হাইনান	৫১২৯
২১	কিংঘাই	৫২৩১
২০	হুনান	৫৩০৪
১৯	শানঝি	৫৩২৭
১৮	জিনঝিয়াং (ওভারঅল)	৫৩৭২
১৭	হেইলংজিয়াং	৫৬৫৭
১৬	নিংঝিয়া	৫৭২৯
	তাচেং (উত্তর জিনজিয়াং)	৫৭৯০
১৫	হেবেই	৫৭৯৬
	বেইতুন (জিনজিয়াং পিসিসি)	৫৮২৩
	বরতালা (উত্তর জিনজিয়াং)	৬০৪২
	চীনা (সব মিলিয়ে)	৬০৯১
১৪	শানঝি	৬১০৮
১৩	হুবেই	৬১১১
	তুরপান (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	৬১৮৯
১২	চংগিং	৬১৯১
	তিয়েমেংগুয়ান (জিনজিয়াং পিসিসি)	৬৩২২
১১	জিলিন	৬৮৭৭
	হামি (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	৭২২৬
	উজিয়াকু (জিনজিয়াং পিসিসি)	৭৬১৯
	চাংঝি (উত্তর জিনজিয়াং)	৮১১৩
১০	শানদং	৮২০১
৯	ফুজিয়ান	৮৩৫৯
৮	গুয়াংদং	৮৫৭০
	আরাল (জিনজিয়াং পিসিসি)	৮৫৯৩
৭	লিওয়াওনিং	৮৯৫৮
	উরামকি (উত্তর জিনজিয়াং)	৯৪৩৮
৬	ঝেজিয়াং	১০০২২
৫	আন্তঃ মঙ্গোলিয়া	১০১৮৯

	শিহেজি (জিনজিয়াং পিসিসি)	১০১৯৩
	বেইংঘোলিন (দক্ষিণ জিনজিয়াং)	১০৩৫৯
৪	জিয়াংশু	১০৮২৭
৩	শাংহাই	১৩৪৭১
২	বেইজিং	১৩৯৭৭
১	তিয়ানজিন	১৪৭৫০
	কারামেই (উত্তর জিনজিয়াং)	২১৩৮৯
পিসিসি মানে "Xinjiang Production and Construction Corps" এটি চীনের সামরিক বাহিনীর অধীনে একটি অর্থনৈতিক সংগঠন বা বাণিজ্যিক গোষ্ঠি। এর অধিভুক্ত জেলাগুলোকে সিপিসি বলা হয়। সূত্রঃ আল জাজিরা		

উপরের ছকে লক্ষ্য করেছেন উইঘুর জনবহুল তিনটি অঞ্চলই সমগ্র চীনের ৫৩টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে মাথাপিছু সর্বনিম্ন আয়ের। উইঘুরদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা বুঝাতে আর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে কি?

উইঘুররা কেন চোখের বালি হুইরা কেন চোখের মনি?

আচার আচরণে শালীন, ভদ্র ও শান্তিপ্রিয় স্বীকৃতি দেওয়ার পর কেন আবার উইঘুরদের সাথেই বৈরী আচরণ করে চীনারা? কেন কমিউনিস্ট সরকার তাদের বিরুদ্ধেই বছরের পর বছর ধরে জাতিগত নিধন কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে? আর অন্যদিকে হুই মুসলিমদের তারা কিছুই বলছে না কেন? চীনে মুসলিম নির্যাতন নিয়ে একটু পড়াশোনা করা যে কারো মনেই এসব প্রশ্ন আসবে। সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যা পেলাম তাই এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব।

উইঘুর মুসলিমেরা সংখ্যায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের মোট মুসলিম জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। কিন্তু চীনের সবচেয়ে বড় মুসলিম জনগোষ্ঠী 'হুই'রা। চীনের জনসংখ্যার ৯২ ভাগই হান নৃগোষ্ঠীভুক্ত। অবশিষ্ট ৮ ভাগের অন্তর্গত হলো ৫৫টি নৃগোষ্ঠী। এতগুলো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যে আবার সংখ্যাগুরু হলো 'হুই'। জনসংখ্যায় এরা প্রায় দেড় কোটি, যেখানে উইঘুরদের সংখ্যা ১ কোটির কিছু বেশি।

হুইদেরও মুসলিম হবার জন্য উইঘুরদের মতোই নিষ্পেষিত-নিগৃহীত হতে হয় না বরং ধর্মীয়ভাবে অধিক স্বাধীনতা ভোগের পাশাপাশি

অর্থনৈতিকভাবেও সুবিধাজনক অবস্থানে আছে হুইরা। রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক উইঘুরদের মতো শীতল নয়।

আমরা জানি শুধু চীনেই নয়, সোভিয়েত ভেঙে সৃষ্ট মুসলিম দেশসমূহ, পাকিস্তান ও পাশ্চাত্যের কিছু দেশেও রয়েছে উইঘুর মুসলিমদের বাস। ওদিকে চীনা উইঘুরদের প্রায় ৯০ ভাগেরই বাস দেশটির উত্তর-পশ্চিমের জিনজিয়াং প্রদেশে। প্রদেশটির পুরো নামই 'জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল'।

চোখের দেখাতেই উইঘুর আর মূলধারার হান চীনাদের আলাদা করা যায়। তফাৎ যেন অনেকটা রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে ককেশানদের মতোই স্পষ্ট। শুধু নৃতাত্ত্বিকভাবেই নয়, তাদের ভাষাও আলাদা। উইঘুররা মূলত তুর্কি ভাষায় কথা বলে, যা লেখা হয় আরবি হরফে।

অন্যদিকে হুইদের বাস সমগ্র চীনজুড়ে। তারপরও উইঘুরদের মতো হুইদেরও 'নিজস্ব' স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল আছে, যার নাম 'নিংশিয়া'। এছাড়া কানসু প্রদেশের লিনজিয়া শহরটিকে বলা হয় 'কুরআন বেল্ট', যেটি মূলত হুই অধ্যুষিত এলাকা।

হুই মুসলিমদের পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে ১,২০০ বছর আগে আরব-পারস্য থেকে এসেছিলেন চীনে। চীনা নারীদের বিয়ে করে এখানেই থিতু হয়েছিলেন তারা। সময়ের ফেরে তাদের রক্ত এতটাই চীনের মূলধারায় মিশেছে যে, সাদা টুপি বা হিজাব না থাকলে হানদের থেকে হুইদের তফাত করা বেশ দুষ্কর। মান্দারিনই তাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা। শূকর আর মদ বাদে মূলধারার চীনাদের সাথে খাদ্যাভ্যাসেও হুইদের বড় কোনো তফাত নেই।

মূলধারার হান চীনাদের সাথে হুই মুসলিমদের তফাত কমই তা ইতোপূর্বের আলোচনাতেই খানিকটা উঠে এসেছে। তারা সমাজের মূলস্রোতে এতটাই আত্তীকৃত যে, তাদের এলাকাগুলোতে গেলে মসজিদকে প্যাগোডা ভেবে যে কেউ ভুল করবে। ঐতিহ্যবাহী চীনা আদলের সাথে আরব্য স্থাপত্যশৈলীর সমন্বিত রূপ তাদের মসজিদগুলো।

হুইরা মূলত ইসলামের সুফিবাদী আদর্শের অনুসারী। কনফুসিয়াসের দর্শনের সাথে তাদের সুফিবাদী আদর্শের একরকম সমন্বয় তারা ঘটিয়েছে।

ব্যবসা করতে গিয়ে হুইরা শেকড় বিস্তার করেছে গোটা দেশেই। চীনের সব উন্নত শহরে গেলেই হুইদের চোখে পড়বে। এমনকি নিষিদ্ধ নগরী লাসা (তিব্বতের রাজধানী)-এর অধিকাংশ দোকানপাটই হুইদের

দখলে। চীনের দাপ্তরিক ভাষা মান্দারিন, হুইদের মাতৃভাষাও তা-ই। ফলে সরকারি চাকরিতেও তাদের অংশগ্রহণ সহজ, অন্তত উইঘুরদের চেয়ে বেশি।

অন্যদিকে উইঘুরদের নিজস্ব শক্তিশালী ভাষা থাকায় মান্দারিন শেখায় আগ্রহ কম। শক্তিশালী সংস্কৃতির যে কোন জনগোষ্ঠিরই সাংস্কৃতিক জাত্যাভিমান প্রবল। যেমন আমাদের বাংলাদেশীদের মধ্যে ছিল। ৫২'র ভাষা আর ৭১'এ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করি আমরা। উইঘুররাও এ জাত্যাভিমানে আধিপত্যবাদী হানদের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতিকে মানতে চায় না। মূলধারায় মিশতে তাদের যেমন অনীহা তেমনি সাংস্কৃতিকভাবে উইঘুরদের 'নিকৃষ্টতর' জ্ঞান করবার প্রবণতাও আছে তথাকথিত মূলধারার চীনাদের।

একে তো জিনজিয়াং আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় প্রদেশ বলে চীন একে খোয়াতে চায় না। সেই সাথে ইউরোপ, আফ্রিকার সাথে সহজ যাতায়াতের জন্য জিনজিয়াংয়ের রুটকেই ব্যবহার করে চীন। আবার সাংস্কৃতিক কারণে উইঘুররা মূলধারায় মিশতে অনাগ্রহী, বিপরীতে চীনও কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। কঠোর নজরদারি চালানো হয়। ফেইস ও ভয়েস রিকগনিশন, আইরিস স্ক্যানিং, ডিএনএ নমুনা ও থ্রিডি শনাক্তকরণ পদ্ধতিতে চালানো হয় এসব নজরদারি। স্বজাতির মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তির কাজটি করে থাকে উইঘুরদের কেউ কেউই। কেউ ধূমপান বা মদ্যপান নতুন করে ছাড়লো কি না বা চীনা সংবাদ দেখে কি না, বাড়িতে ধারালো ছুরি কাঁচি আছে কিনা—এসব পর্যন্ত নজরদারি করা হয়! ইতোপূর্বে তিব্বতের লামা বৌদ্ধদের ওপরেও একই ধরনের নজরদারি চালিয়েছিল তারা। ফলে চীনের এই বাড়াবাড়ির কারণ যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি সার্বভৌমত্ব সম্পর্কিত।

সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে উইঘুরদের মতো হুইরা কখনো চীনা সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়নি। হুই মুসলিমদের ঐ অর্থে রাজনীতিতেও বিশেষ আগ্রহ নেই। ঠিকঠাকভাবে ধর্ম পালন করতে পারলেই চলে তাদের! ফলে উইঘুরদের মতো রাষ্ট্রীয় রোষানলে পড়তে হয়নি হুই মুসলিমদের।

অন্যদিকে মূলধারায় হান আধিপত্যবাদের ব্যাপারেও হুইদের আপত্তি সামান্যই। চীনের শেষ 'কিং' সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একবার নাংশিয়া ঘাঁটি থেকে বিদ্রোহ করেছিল তারা। ঐ একটি রেকর্ড বাদ দিলে সেনাবাহিনী প্রশ্নে হুইরা অনুগতই ছিল বরাবর।

ক্ষমতাসীনদের দ্বারা বৈষম্যের শিকার তারাও হয়েছে, কিন্তু আলাদা রাষ্ট্রের দাবি কখনো তোলেনি। উইঘুরদের কাছে হুইরা হলো রাষ্ট্রের তাঁবেদার। অন্যদিকে রাষ্ট্রের চোখে হুইদের ভাবা হয় 'ভালো মুসলিম'! এই 'ভালো মুসলিম'রা স্বাভাবিকভাবেই ধর্মপালনের ক্ষেত্রে তাই বাড়তি স্বাধীনতা রাষ্ট্রের কাছ থেকে পান।

জিনজিয়াংয়ে উইঘুররা রোজা রাখতে পারেন না। কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উইঘুররা খাচ্ছেন কি না, সেটা প্রশাসনিকভাবে নিশ্চিত করা হয়! ওদিকে হুই মুসলিমরা ঠিকই রোজা রাখতে পারেন। উইঘুররা বিদেশ গমনের জন্য সহজে পাসপোর্টও পান না। সেখানে সৌদি আরবে হজ করতে যাওয়া হুই মুসলিমদের সংখ্যা বাড়ছে বছর বছর!

হুইদের স্বায়ত্তশাসিত নিংশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ঈর্ষণীয়। সেখানকার হালাল ফুড ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক আয় প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার। ওদিকে ২০১৮ সালের তথ্য অনুযায়ী সেখানকার জিডিপিও ৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফলে ধর্মের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও ভরপুর ভোগ করছে হুইরা। অন্যদিকে ৩২ প্রদেশের মধ্যে উইঘুরপ্রধান তিন প্রদেশই সর্বনিম্ন আয়ের প্রদেশ তা উপরের একটি ছকে দেখেছেন।

এদিকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলো একতরফাভাবে উইঘুরদের শান্তি-বিঘ্নকারী, সন্ত্রাসী হিসেবে দেখানো হয়। জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা গণমাধ্যম গবেষক লিয়াং ঝেংয়ের গবেষণায় উঠে এসেছে চীনা গণমাধ্যমের উইঘুর বৈরিতার কথা।

৯/১১ পরবর্তী 'ওয়ার অন টেরর'-এই আগুনে ঢেলেছে ঘি। দেশে যদি কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে আর অপরাধী যদি 'হান' না হয়, তবে ধরেই নেয়া হয় যে এটা উইঘুরদেরই কাজ (অথচ আরো ৫৪টি নৃগোষ্ঠী আছে চীনে)! এই স্টেরিওটাইপ থেকে আবার হুই মুসলিমেরা মুক্ত। গণমাধ্যমও তাদের ব্যাপারে অতটা বৈরী নয়।

নিংশিয়াতে ২০০৫ সালে 'ভার্চুয়াল রিলিজিয়াস স্টেট' প্রতিষ্ঠা করেন হুই ধর্মগুরু হং ইয়ান। পনের লক্ষাধিক অনুসারী আর অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা নিয়ে পতিষ্ঠিত হয় 'হং মেন' নামক এই স্টেট। পাকিস্তানে পড়াশোনাকালে ওসামা বিন লাদেনসহ কট্টর মৌলবাদী নেতার সঙ্গে আলাপ ছিল ধর্মগুরু হং ইয়ানের। তবুও তিনি পার পেয়ে গেছেন তার 'হং মেন' সমেত। কেন?

কারণ হং ইয়ান চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অত্যন্ত আস্থাভাজন একজন ব্যক্তি। হাওয়াই ইউনিভার্সিটির এশিয়ান স্টাডিজের অধ্যাপক দ্রু গ্লাদনির মতে, হুইদের সাথে সামাজিক ও ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়ানোর কৌশল হিসেবেই ধর্মহীন আদর্শের রাষ্ট্রে এমন একটি ধর্মীয় সমাজ প্রতিষ্ঠাকে প্রশ্রয় দিয়েছে চীন! সরকারের সাথে সুসম্পর্কের জন্যই হুই ধর্মগুরু হং ইয়ান বা হুই মুসলিমদের ঐ অর্থে হুমকি মনে করে না তারা।

যেহেতু চীনা সরকার আদর্শিকভাবে ধর্মহীনতাকেই ধারণ করে, সেহেতু হুইদের ধর্মপালনও যে একেবারে নির্বিঘ্ন, তা নয়। অন্যদিকে কট্টর সালাফি মতবাদের প্রসারও বাড়ছে এককালের সুফিবাদী হুইদের মধ্যে। সালাফি মতবাদে নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদকে বাতিল করে ধর্মীয় জাতিরাষ্ট্র গঠনে জোর দেওয়া হয়। সালাফি মতবাদকে চীন তার সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের স্থিতির পক্ষে হুমকি হিসেবেই দেখে। সাম্প্রতিক সময়ে তাই খানিকটা লাগাম টানা হয়েছে হুইদের স্বাধীনতাতেও।

গত বছর কানসু প্রদেশের লিনজিয়াতে ১৬ বছরের কম বয়সী মুসলিমদের জন্য যেকোনো ধরনের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা মসজিদে ধর্মের পাঠ নেওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। অবৈধভাবে সম্প্রসারণ ও বিদেশি সাহায্য নেবার দায়ে ঐ এলাকারই একটি মসজিদ আগস্টে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল সরকার। যদিও গণআন্দোলনের মুখে সেটিকে উচ্ছেদ করা যায়নি।

জিনজিয়াং ও তিব্বতকে মূলস্রোতে আনতে না পেরে মূলস্রোতকে বরং এই দুই স্থানে ঢোকাতে চায় সরকার। হান ও হুই গোষ্ঠীর লোকজনকে বেশি বেশি করে এই দুই স্থানে বসতি স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। উইঘুরদের এলাকাগুলোয় আগে তাদের যতটা প্রভাব ছিল, সেটি কমে এসেছে এই অন্তঃঅভিবাসনে।

জিনজিয়াংয়ের সেনা বা রাষ্ট্রাধীন খামার ও খনিতে কাজ করতে শুরুতে বিপুল পরিমাণ হানকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সেখানে হুই মুসলিমদেরও কর্মসংস্থান-পুনর্বাসন করা হয়। বর্তমানে সাড়ে চল্লিশ ভাগ হানের পাশাপাশি সাড়ে চার ভাগ হুই মুসলিমও বাস করছে প্রদেশটিতে।

এসব কারণে উইঘুরদের তরফে বাড়ছে জাতিগত অসন্তোষ। ২০০৯ সালে জিনজিয়াংয়ের রাজধানী উরামকি শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে

শোর উঠেছিল, "হান মারো, হুই মারো"! বোঝাই যাচ্ছে, হুইদেরকে হান আধিপত্যবাদের সমর্থক ও সমার্থক ব্যতীত অন্য কিছুই ভাবে না উইঘুররা!

কিন্তু যেহেতু তিব্বতের লামা-বৌদ্ধ স্বাধীনতাকামীদের প্রতি রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ জারি আছে এবং হুই মুসলিমরা উইঘুরদের মতো এতটা বঞ্চিত নয়, সেহেতু একটি ব্যাপার স্পষ্ট, উইঘুরদের প্রতি বেইজিংয়ের এই বৈষম্যমূলক আচরণ আসলে ভূখণ্ড হারাবার ভয় থেকেই, ইসলামবিদ্বেষ থেকে নয়! অন্যদিকে সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার আকুলতায়, একীভূত জাতি গঠনের স্বার্থে ও উইঘুরদের প্রতি এই আচরণের বৈধতা দেবার উদ্দেশ্যে চীন যে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাতিবিদ্বেষ ও ইসলামভীতি উসকে দিচ্ছে সেটিও একইভাবে সত্য। অতএব জাতি হিসেবে উইঘুরদের স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে বসবাসের অধিকার চাওয়ার অধিকার যেমন আছে তেমনি মুসলিম হিসেবে অপর মুসলিমের পাশে দাঁড়ানোর অধিকারও মুসলিমদের আছে।

দেশে দেশে উইঘুর

উইঘুরদের মোট জনসংখ্যা কত তা নিয়ে মতভেদ আছে। উইঘুরদের বিশ্বব্যাপি জনপ্রিয় সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস' এর হিসাব মতে উইঘুর জনসংখ্যা প্রায় ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি। কিন্তু চীন সরকারের হিসাব মতে এ সংখ্যা ১১.২ মিলিয়ন বা এক কোটি ১২ লাখের মতো। উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত উইঘুরদের জনসংখ্যা চিত্র ভিন্নরকম।

ক্রম	দেশ	জনসংখ্যা
০১	চীন	১৫,০০০,০০০ (২০১৮)
০২	কাজাখিস্তান	২,৪৫,১০০ (২০১৪)
০৩	উজবেকিস্তান	৬৫,২২০ (২০০১৭)
০৪	কিরগিজস্তান	৬৫,০০০ (২০১৭)
০৫	তুরস্ক	৭০,৮০০ (২০১৭)
০৬	সৌদি আরব	৫০,০০০ (২০১৩)
০৭	পাকিস্তান	২৫,০০০ (২০১৪)
০৮	অস্ট্রেলিয়া	১০,০০০ (২০১৮)
০৯	রাশিয়া	৩৬৯৬ (২০১০)
১০	কানাডা	১৫৫৫ (২০১৬)
১১	আমেরিকা	১০০০+
১২	জাপান	১০০০ (২০১২)
১৩	ইউক্রেন	১৯৭ (২০০১)

উইঘুরদের ভাষা

উইঘুর ভাষা মূলত তুর্কি ভাষা। লেখা হয় আরবি-ফার্সি বর্ণমালায়। চীনের সরকারি হিসেব মতে ১ থেকে দেড় কোটি জিনজিয়াংবাসী উইঘুর এ ভাষায় কথা বলে। আর উইঘুরদের দাবি দুই থেকে আড়াই কোটি লোক এ ভাষায়

কথা বলে। প্রাচীন এই ভাষা ৮ম শতাব্দীতে 'উইঘুর খানাতি' গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবহৃত হতো যা তুর্কির অরখুন ইনিসাই অভিলিখনের অনুরূপ। ইদুকুত খানাতি উইঘুর এবং খাকানিয়াদ উইঘুরদের সাহিত্যিক ভাষা প্রায় একই। আর আধুনিক উইঘুরদের ভাষা উরাল-আলতেইক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উরাল-আলতেইক ভাষা তুর্কির পূর্বশাখার একটি ভাষাগোষ্ঠী। যা উজবেক, কাজাখ এবং তার্কিশ ভাষার অনুরূপ।

ঐতিহাসিকভাবে উইঘুর ভাষার সাতটি ভিন্ন লেখ্যরূপ রয়েছে। এখনকার উইঘুররা আরবি প্রতিলিপি বর্ণমালায় উইঘুর ভাষা লেখে। তবে ২০০৬ সালে অঞ্চলিক সরকার জিনজিয়াং এর নৃগোষ্ঠি বা উপজাতিদের ভাষা ও লেখ্যরূপ কমিটি করে দেয়। সেই কমিটি উইঘুর বানান ল্যাটিন বর্ণে লেখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

উইঘুর তুর্কি ভাষার কারলুক শ্রেণিভুক্ত একটি ভাষা। যার সাথে উজবেক ভাষারও মিশ্রন রয়েছে। অন্য অনেক তুর্কি ভাষার মতো উইঘুর ভাষারও রয়েছে স্বরবর্ণের বিন্যাস, সমাসপদের বিন্যাস, বিশেষ্য পদসমূহের বা ব্যাকরণগত লিঙ্গ বিন্যাস না থাকার রীতি। উইঘুর একটি বাম-শ্রেণিভুক্ত ভাষা যার বাক্য গঠন ধরন হলো 'কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া'। যেমন বাংলা বাক্য 'আমি ভাত খাই' এর গঠনরূপ হলো আমি=কর্তা, ভাত=কর্ম, খাই=ক্রিয়া বা 'কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া'; কিন্তু ইংরেজি বাক্য I eat rice. এর গঠনরূপ হলো, I=কর্তা, eat=ক্রিয়া, rice=কর্ম বা 'কর্তা+ক্রিয়া+কর্ম'।

নিচের ছকটিতে উইঘুরদের ব্যবহৃত কিছু শব্দ...

ইংরেজি	বাংলা	উইঘুর
Father	পিতা	Ata
Mother	মাতা	Ana
Son	পুত্র	Oghul
Man	পুরুষ	Er
Girl	বালিকা	Qiz
Person	ব্যক্তি	Kishi
Bride	বর	Kelin
Mother in Law	শাশুড়ি	Qeyinana
Heart	অন্তর, হৃদয়	Yurek
Blood	রক্ত	Qan
Head	মাথা	Bash

Hair	চুল		Soch, qil
Eye	চোখ		Koz
Eyelash	ভ্রু		KIrpik
Ear	কান		Qualaq
Nose	নাক		Burun
Arm	বাহু		Qol
Hand	হাত		Ilik
Finger	আঙুল		Barmaq
Knee	হাঁটু		Tiz
Foot	পায়ের পাতা		Ayaq
Belly	পেট		Qerin
Horse	ঘোড়া		At
Cattle	গবাদিপশু		Siyir
Dog	কুকুর		It
Fish	মাছ		Beliq
House	বাড়ি		Oy
Tent	তাবু		Chadir, Otaq
Way	পথ, রাস্তা		Yol
Bridge	ব্রিজ, সেতু		Kovruk
Fire	আগুন		Ot
Ash	ছাই, ভস্ম		Kul
Boat,ship	নৌকা, জাহাজ		Keme
Water	পানি		Su
Sun/Day	সূর্য/দিন		Quyash, Kun
Cloud	মেঘ		Bulut
Star	তারকা		Yultuz
Ground,Earth	জমিন, মাটি		Tupraq
Hilltop	পর্বতচূড়া		Tope
Tree/wood	গাছ/কাঠ		Yahach
God	প্রভু		Tengri
SKz	আকাশ		Kok
Long	দীর্ঘ		Uzun
New	নতুন		Yengi

Fat	ফ্যাট		Semiz
Full	পূর্ণ		Toluq
White	সাদা		Aq
Black	কালো		Qara
Red	লাল		Qizil
1	এক		Bir (بىر)
2	দুই		Ikki (ئىككى)
3	তিন		Uch (ئۈچ)
4	চার		Tort (تۆت)
5	পাঁচ		Besh (بەش)
6	ছয়		Alti (ئالتە)
7	সাত		Yetti (يەتتە)
8	আট		Seggiz (سەككىز)
9	নয়		Togguz (توققۇز)
10	দশ		On (ئون)
100	একশত		Yuz
1,000	এক হাজার		Ming
1,000,000	দশ লাখ		Bir Milliyon
1,000,000,000	একশত কোটি		Bir Milliyard

উইঘুরদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিছু বাক্য ইংরেজি ও বাংলাসহ তুলে ধরা হলো।

ইংরেজি	বাংলা	উইঘুর
Hello. (Greeting)	ওহে! (অভিবাদন)	Ässalamu läykum.
Hello. (Answering)	ওহে! (অভিবাদনের জবাব)	Wä'äläykum ässalam.
Hi!	হাই!	Yahshimusiz!
Good morning!	শুভ সকাল	Atiganlikingz khayrilik bolsun!
Good evening!	শুভ সন্ধ্যা	Kachlikingz khayrilik bolsun!
Hey, friend!	ওহে বন্ধু!	Hei, adash/aghin!
I missed you so much!	আমি তোমাকে খুব মিস করি!	Sizni bak seghinip kattim!

Welcome!	স্বাগতম!	Qarshi alimiz!
How are you?	তুমি কেমন আছ?	Yakshimasiz? / Qandaq ahwalingiz?
What's new?	নতুন কোন খবর আছে?	Nima boldi?
Nothing much!	তেমন কিছু নেই!	Eich ish!
Thank you very much!	আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!	(Kop) rakhmat.
You're welcome!	আপনাকে স্বাগতম!	Tuzut qilmang!
No problem!	কোন সমস্যা নেই!	Arzimaydu /erzimeidu ئەرزىمەيدۇ
Sorry!	দুঃখিত	Kechurung.
What is your name?	তোমার নাম কি?	Ismingiz nime?
My name is ____.	আমার নাম...	Mining ismim _____.
Nice to meet you.	দেখা হওয়ায় ভাল লাগছে।	Toushkinimga hushalman.
Good night!	শুভরাত্রি!	Kachlikingz khayrilik bolsun
See you later!	আবার দেখা হবে!	Kiyin korishayli!
Good bye!	বিদায়!	Khayr khosh!
Can I help you?	আমি কি সাহায্য করতে পারি?	Sizga yardam kirakmu?
Where is the bathroom/pharmacy?	পায়খানা/ফার্মেসীটি কোথায়?	Hajatkhana/dorikhana qayarda?
Go straight.	সোজা যাও/যান।	Udul minging.
I'm looking for John.	আমি জনকে খুঁজছি।	Man Jon ni izdawatiman
How much is this?	এটার দাম কত?	Buning bahasi qancha?
Leave me alone.	আমাকে একা থাকতে দিন।	mini ewar kilma
I'll call the police.	আমি পুলিশ ডাকবো।	sahchi'ni tilfun kilimen
Stop! Thief!	থাম! চোর!	Tohta! Oghri!
I need a doctor.	আমার ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন।	mang'a dohtur kirek

নিচে একটি ইংরেজি অনুচ্ছেদের উইঘুর ভাষারুপ এবং এর প্রতিষ্ঠিত প্রতিবর্ণরুপ সমূহ দেয়া হলো...

Sample texts in Uyghur

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

Arabic alphabet (UEY)

ھەممە ئادەم زاتىدىنلا ئەركىن، ئىززەت-ھۆرمەت ۋە ھوقۇقتا باپباراۋەر بولۇپ تۇغۇلغان. ئۇلار ئەقىلگە ۋە ۋىجدانغا ئىگە ھەمدە بىر-بىرىگە قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتىگە خاس روھ بىلەن مۇئامىلە قىلىشى كېرەك.

Cyrillic alphabet (USY)

Һемме адем занидинла еркин, иззет-һөрмет ве hокукта бапбаравер болуп туғулған.Улар екилге ве вийдан'ға иге hемде бир-бириге кәриндашлиқ мунасивитиге хас роh билен билен муамил қилиши кэрек.

Latin alphabet (UYY)

Həmmə adəm zatidinla ərkin, izzət-hərmət wə hoķuķta babbarawər bolup tuƣuluƣan.Ular əkilƣə wə wijdanƣa igə həmdə bir-birigə ķerindaxlik munasiwitigə hax roh bilən mu'amilə ķilixi kerək.

Latin alphabet (ULY)

Hemme adem zatidinla erkin, izzet-hörmet we hoquqta hemde bir-birige qérindashliq munasiwitige xas roh bilen muamile qilishi kérek.babbarawer bolup tughulghan. Ular eqilghe we wijdan'gha ige.

উইঘুরদের ধর্ম

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় উইঘুররা প্রথমে শামানবাদ এবং টেংরিবাদে বিশ্বাস করতো। এরপর তাদের ধর্মবিশ্বাস স্থানান্তরিত হয়

মানিকাইবাদে। এরপর বৌদ্ধধর্মে এবং ইসলাম আসার আগে সর্বশেষ খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করতো উইঘুররা।

শামানিজম বা Shamanism হচ্ছে একটি মানবতাত্ত্বিক বিষয় যা আত্মিক জগতের সাথে যোগাযোগের নিমিত্তে বিশ্বাস ও ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যস্থতাকারী বা Intermediary হলেন শামানরা। এই শামানদের মাধ্যমেই অপর জগতের বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ করা হয় বলে তাদের বিশ্বাস ছিল। আধুনিক অনেক গবেষক মনে করেন, যারা শামানিজম করেন তাদের আমেরিকা মহাদেশে শামান, ভারত উপমহাদেশে তান্ত্রিক, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বাউল/ওঝা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার আশে পাশের তদ্বীয় বর্গএলাকা সহ সামগ্রিক মিয়ানমার অঞ্চলে মগ বৈদ্য বলা হয়।

টেংরিজিম এর মানে খুঁজতে গিয়ে বাংলা ইংরেজি বিভিন্ন অভিধানে দেখা যায় টেংরি মানে পশুর পায়ের নিচু অংশ বা গোড়ালি। যা এখন মানুষের পায়ের গোড়ালি বুঝাতে বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, 'পিটিয়ে পায়ের টেংরি ভেঙ্গে দেব'। আর উইকিপিডিয়ার মতে, তুর্কি ও মঙ্গোলিয়ানরা টেংরি নামের এক দেবতার পূজা করতো। আর সেই পূজা-আর্চনার বিধিবিধানকে বলা হয় টেংরিজম। টেংরিজমের সাথে শামানিজম, এনিমিজম টোটেমিজ জাতীয় ধর্মবিশ্বাসেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। ধারণা করা হয় এগুলো সমসাময়িক যুগেরই বিভিন্ন অঞ্চলের ধর্ম বিশ্বাস।

উইঘুরদের ধর্মীয় চেতনা যেমন প্রখর, ধর্ম পালনে তারা যেমন একনিষ্ঠ তেমনি চীনা সরকার তাদের ধর্ম পালনে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি করে। উইঘুরদের পূর্বে তিব্বত অঞ্চল। তিব্বতের অধিকাংশই বৌদ্ধ। বৌদ্ধদেরও দমিয়ে রাখার চেষ্টা করে চীন। দালাইলামা নামের একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরুর নাম বিশ্ববাসীর প্রায় মুখস্থ মিডিয়ার কল্যাণে। অথচ উইঘুরদের শত নির্যাতনের খবর, যুগের পর যুগ ধরে চলা নিষ্পেষণ কেউ দেখে না কোন মিডিয়ায় আসে না। উইঘুররা তাই প্রায়ই দুঃখ করে বলে, 'বৌদ্ধদের একজন দালাইলামা আছে, আছে হলিউড, কিন্তু আমাদের কেউ নেই'।

উইঘুরদের অধিকাংশ হানাফী মাজহাবের অনুসারী। তবে ইরান থেকে আগত সামান্য কিছু শিয়া রয়েছে কাজিকিস্তান সীমান্তবর্তী এলাকায়। তারা ইসমাইলী শিয়া। এছাড়া কাজাখ ও কিরগিজ জাতিও হানাফী মাজহাবের অনুসারী। উইঘুরদের মধ্যে সুফিবাদ খুব জনপ্রিয় ছিল। সুফিবাদ মানে সুফি

দরবেশদের সাদামাটা সহজ সরল জীবন যাপন। অন্য অনেক দেশের মতো সুফিবাদের নামে মাজার পূজা কবর পূজা না।

সুফিবাদের পর ওয়াহাবী মতবাদ বা আধুনিক সংস্কারপন্থী ইসলাম বেশ জনপ্রিয়তা পায়। সংস্কারপন্থি বলতে বিশুদ্ধ কুরআন ও হাদিস চর্চার দিকে ফেরা, ফেরকাবাজি নয়। এখন সালাফি মানহাজেরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

মুসলিমদের মধ্যে সূক্ষ্ম ও নীরব পার্থক্য জিইয়ে রাখতে চীনা সরকারেরও কালো হাত রয়েছে। চীন সরকার নিজস্ব অর্থায়নে 'চীনা এসোসিয়েশন অব মুসলিম' নামে মুসলিম সংঘ তৈরি করেছে। এই এসোসিয়েশনের হেড অফিস বেইজিং-এ। সম্পূর্ণ সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার এই প্রতিষ্ঠান সারা দেশে বড় বড় মসজিদগুলোতে ইমাম নিয়োগ করে থাকে। তাদের রয়েছে নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার ছাত্র ইসলাম, কারিগরি, দেশি ভাষা শিখে। তাদের অধিকাংশই ইসলাম পালনে অতটা আন্তরিক নয়। এমনকি অধিকাংশ ইমামরই মুখে দাড়ি নেই।

চীনা সরকারপন্থি আলেমরা সরকারি নানান সুবিধা ভোগ করে। সরকারের নির্দেশ মতো বক্তৃতা বিবৃতি দেয়। যেমন ২০০৯ সালে উরামকি দাঙ্গার পর চীনা গ্রান্ড ইমাম চেন গুয়াংগিয়ান এক বিবৃতিতে সেই দাঙ্গার জন্য উইঘুদের দায়ী করেন। তাদের একটি সংগঠন আছে। 'ইসলামিক এসোসিয়েশন অব চায়না' নামের সেই সংস্থা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়।

বিশ্বে সম্ভবত একমাত্র চীনেই মহিলাদের জন্য পৃথক মসজিদ রয়েছে যেখানে একজন মহিলা ইমামের নেতৃত্বে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাত অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু মতবিরোধপূর্ণ এ সংস্কৃতিটি উইঘুরদের মধ্যে নেই। হুই মুসলিমদের মধ্যে এর প্রচলন দেখা যায়। পুরুষদের বড় বড় মসজিদগুলোর পাশে পৃথক ভবনে নারীদের মসজিদ দেখা যায়। এছাড়া মুসলিমপ্রধান পাড়া মহল্লায় ছোট আকারের মহিলা মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। বিবিসির এক রিপোর্ট মতে ১৮২০ সাল থেকে চীনে এরকম মহিলা ইমামতির রেওয়াজ চালু হয়েছে। মহিলাদের ইমামতির শর্তও তারা পুরোপুরি পালন করে না। মহিলা ইমাম পুরুষদের মতো মুসুল্লিদের সামনে পৃথক হয়ে না দাড়ানোর শর্তটি তারা মানে না।

উইঘুরে খ্রিস্টানও আছে

উইঘুর জাতিগোষ্ঠির শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলিম তদুপরি অন্য ধর্মের লোকদের কিছু লোকও দেখা যায়। তবে তাদের মধ্যে শুধু কিছু খ্রিস্টানদের খবরই জানা যায়। তাদের সংখ্যা ০.০১% ভাগ। চীনে খ্রিস্টানদের মিশনারি কার্যক্রম ও তাদের জীবনধারা নিয়ে ওয়েবসাইট www.chinaaid.com এর দাবি অনুযায়ী "চীনে প্রথম খ্রিস্টানরা পা ফেলে খ্রিস্টপূর্ব ৬৩৫ সালে। গত এক শতাব্দী ধরে তারা মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। খ্রিস্টানদের ওই ওয়েবসাইট অনুযায়ী উইঘুরদের কেইরাত উপজাতিটি তুর্কি থেকে উইঘুর অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করে এবং ১০০৯ সালে প্রায় ২ লাখ কেইরাত খ্রিস্টান বা ব্যাপ্টাইজড হয়। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুরো কেইরাত উপজাতিটিকেই খিস্টান ধরা হতো। তাদের দাবী অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে মধ্য এশিয়ায় প্রায় ৮ মিলিয়ন খ্রিস্টান রয়েছে। কিন্তু ১৪শ শতকে এসে উইঘুরদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। তারা মুসলিম হয়ে যায়। ১৮৯২ সালে সুইডিশ মিশনারি সোসাইটি উইঘুরদের মাঝে আবার কাজ শুরু করে এবং কাশগড়ে প্রায় ৩০০ উইঘুরকে খ্রিস্টান বানায়। কিন্তু ১৯৩৩ সালে আব্দুল্লাহ খান স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্তানের প্রথম সরকার প্রধান হলে তিনি সেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'এটা আমার দায়িত্ব যে আমি আমাদের লোকদের খ্রিস্টান বানাতে চেষ্টাকারীদের যমের দেখা পাইয়ে দেব। কারণ তোমরা তোমাদের ধর্ম প্রচার করে আমাদের লোকদের ঈমানহারা করছ।" এরপর থেকে সেখানে খ্রিস্টধর্মের প্রচার কমে যায়।

জিনজিয়াংয়ের ধর্ম

জিনজিয়াং বা শিনচিয়ানবাসীর ধর্ম বিষয়ে চায়না বাংলা রেডিওর ওয়েবসাইটে বলা হয়, "জিনজিয়াং এখনো একটি ধর্মবহুল অঞ্চল। ইসলাম ধর্ম জিনজিয়াংয়ের সামাজিক জীবনে অপেক্ষাকৃত বিরাট প্রভাব বিস্তার করে

আছে। এখন জিনজিয়াংয়ের বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম ধর্মের মসজিদ এবং লামা ধর্মের মন্দির, ক্যাথলিক ধর্মের গির্জাসহ অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান-কক্ষের সংখ্যা মোট ২৩০০০। এগুলো বিভিন্ন জাতির ধর্মাবলম্বী জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করে। জিনজিয়াংয়ের ধর্মসংগঠনগুলোর মধ্যে প্রধানত ইসলাম ধর্ম সমিতি, ইসলাম ধর্ম বিদ্যালয় আর বৌদ্ধ ধর্ম সমিতি প্রভৃতি।

এখন জিনজিয়াংয়ে উইঘুরজাতি, কাজাখজাতি, হুইজাতিসহ মোট ১০টি সংখ্যালঘু জাতি ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করে। জিনজিয়াংয়ের লোকসংখ্যার ৫৬.৩ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৯০ লক্ষ লোক ইসলাম ধর্ম বিশ্বাস করেন।

জিনজিয়াংয়ের মঙ্গোলীয় জাতির অধিকাংশ লোক অর্থাৎ প্রায় ৮০০০০ লোক তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করেন। জিনজিয়াংয়ে মোট ৪০টি তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের মন্দির আছে। জিনজিয়াংয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৩০০০০, গির্জার সংখ্যা ২৪। এছাড়াও জিনজিয়াংয়ে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ৪০০০, গির্জার সংখ্যা ২৫। তাছাড়া জিনজিয়াংয়ে রুশজাতির শতাধিক লোক তুংচেন ধর্ম বিশ্বাস করেন, এদের জন্য দুটি গির্জা আছে।

একাধিক ধর্মের সংযুক্ত স্থল

ইতিহাসে পরপর বৌদ্ধধর্ম, চিংচিয়াও ধর্ম, মোনি ধর্ম আর ইসলাম ধর্ম জিনজিয়াংয়ে প্রচলন ছিল। এজন্য বলা হয়ে থাকে জিনজিয়াং বিশ্বের এমন একমাত্র জায়গা যেখানে চারটি বড় ধর্ম সংযুক্ত হয়েছে।

খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম জিনজিয়াংয়ের সিল্ক রোড ধরে পূর্ব দিক থেকে মধ্য সমতলভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবেশ করে। চিং ধর্ম খৃষ্টান ধর্মের এক শাখা। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চিং ধর্ম জিনজিয়াংয়ে প্রবেশ করে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালানোর পর জানা গেছে, প্রাচীনকালের জিনজিয়াংয়ে শুধু চিং ধর্ম প্রচলিত ছিল তা নয়, জিনজিয়াং চিং ধর্মের এক কেন্দ্রস্থলও ছিল। পরে ইসলাম ধর্মের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে চিং ধর্ম জিনজিয়াংয়ের ঐতিহাসিক মঞ্চ থেকে সরে যায়। খ্রিস্টব্দের ৬৯৪ সালে মোনি ধর্ম চীনে প্রবেশ করে। ১৯ শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত তুনহুয়াংয়ের মোকাও গুহায় আর জিনজিয়াংয়ের থুলুফানে বিপুল পরিমাণের মোনি ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মোনি ধর্ম উত্তর-পশ্চিম চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং গভীর ও সুদূর প্রভাব ফেলেছিল। খ্রিস্টাব্দের ১০ শতাব্দীর মধ্যকালে ইসলাম ধর্ম সিল্করোড ধরে কাশগড়ে প্রবেশ করে।

১৬-১৭ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্ম গোটা জিনজিয়াং-এ ছড়িয়ে পড়ে। এখন জিনজিয়াংয়ের উইঘুরজাতি, কাজাখজাতি, হুইজাতি, উজবেকজাতি, কারকাজজাতি, তাজিকজাতি আর তাতার জাতিসহ মোট ১০টি জাতি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী।

উইঘুরদের শিক্ষাব্যবস্থা

প্রাচীনকাল হতেই উইঘুররা সুশিক্ষিত ও মার্জিত স্বভাবের মানুষ। এই অঞ্চলের ইতিহাসে দেখা যায় উইঘুররা শিক্ষায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির তুলনায় অনেক এগিয়ে ছিল। কোচ আমলের বৌদ্ধ উইঘুররা মোঙ্গল রাজার দরবারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হতেন। সেসময় তারা সমাজে অনেক সম্মানিত ছিলেন।

ইসলামী যুগে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ছিল প্রথমে মসজিদ পরে মাদরাসা কেন্দ্রিক। কিং রাজার সময়ে কিছু কনফুসিয়াস আদর্শের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু হয় জিনজিয়াংয়ে। আর উনবিংশ শতকে এসে খ্রিষ্টান মিশনারিদের স্কুল খোলা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম শিশুদের জন্য স্কুলি ছিল মসজিদ ও মাদরাসাভিত্তিক। যেগুলো মকতব নামে পরিচিত ছিল। মকতবই ছিল প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে একটি নির্দিষ্ট কারিকুলাম ছিল। তাতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতিই বেশি জোর দেওয়া হতো এবং সে শিক্ষা হতো অনেকটাই মৌখিক। ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও দেখা যেত। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সেসব প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে সেক্যুলার পাঠ্য বিষয়ও অন্তর্ভূক্ত হতে থাকে। মাদরাসায় কবিতা, যুক্তিবিদ্যা, আরবি ব্যকরণ এবং ইসলামি আইন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত। জাদিদী তুর্কি মুসলিমরা, যারা রাশিয়া থেকে এসেছিল, শিক্ষায় আধুনিক কারিকুলাম অর্ন্তভুক্ত করে। এবং তুর্কিস্তানি জাতীয়তাবাদ প্রথম অর্ন্তভুক্ত হয় তাদের হাত ধরেই।

সাম্প্রতিক সময়ে জিনজিয়াংয়ে ধর্মীয় শিক্ষা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যে কোন ধরনের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিষিদ্ধ করে চীন সরকার। তবে আশির দশক থেকে হুই মুসলিমপ্রধান এলাকাগুলোতে কিছু বেসরকারি ইসলামিক স্কুলের অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু তাও জিনজিয়াং প্রদেশে নয় বরং অন্যান্য প্রদেশে। হুই মুসলিমদের জন্য। বিভক্তির দেয়াল তোলার

অভিযোগে জিনজিয়াংয়ে এ সুযোগ রাখা হয়নি। পিআরসি বা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রথমদিকে (১৯১২-১৯৮০) উইঘুরদের জন্য দুটি অপশনই চালু ছিল। তাদের নিজেদের ভাষায় নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের আলোকে ইসলামি কারিকুলাম অনুযায়ী পড়তে পারত। আবার সেক্যুলার শিক্ষার কারিকুলামে চাইনিজ ভাষার স্কুলেও পড়তে পারত। অধিকাংশ উইঘুর তখন নিজস্ব ভাষায় ইসলামি তাহজিব তমুদ্দনের আলোকে রচিত কারিকুলামে সন্তানদের পড়াতেন।

চীন সরকার ৬০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে উইঘুর ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম কমাতে শুরু করে। আর ৯০'র দশকের মাঝামাঝি এক নতুন ধরনের শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি হয় ওই দুই পদ্ধতির মিশেলে।

২০০২ সাল থেকে জিনজিয়াং ইউনিভার্সিটিতে উইঘুর ভাষায় বিভিন্ন কোর্স বন্ধ করে দেওয়া হয়।

২০০৪ সাল থেকে শ্রেণিকক্ষে যতটা সম্ভব শুধু চায়নিজ ভাষা ব্যবহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

হান চায়নিজদের থেকে উইঘুরদের বিদ্যালয় হতে ঝড়ে পড়ার হার বেশি। এর কারণ যতটা না ভাষা তার চেয়ে বেশি অর্থ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় অনেকেই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ হতে বিরত থাকে। সহশিক্ষা উইঘুররা নিষেধ মনে না করলেও উইঘুর মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় স্কুল ত্যাগ করে বেশি।

আশির দশক থেকে চীনারা উইঘুরদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থায়ন বন্ধ করে দেওয়ার কথা দেশি বিদেশি অনেক সোর্স থেকেই জানা যায়। ২০০৭ সালে আমস্টারডাম ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত The Madrasah in Asia গবেষণাপত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায় Muslim education in China. এই অধ্যায়ে মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে একটি ফিল্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ফারিশ এ নূর, জোগিন্দার সিকান্দ এবং মার্টিন ভান ব্রুইনেসেন সম্পাদিত ওই পত্রিকার চায়না বিভাগের লেখক জ্যাকি আরমিজো বলেন, "১৯৯৮ সালে ঝাওতঙ্গের বাইরে একটি গার্লস স্কুলে পরিদর্শনে যাই। স্কুলটি ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এটিই জিনজিয়াং তথা দক্ষিণ চীনের প্রথম গার্লস স্কুল মনে করা হয়। ছোট্ট মাঠের চারপাশে লাসোয়া কয়েকটি ছোট ছোট ভবন। প্রধান শিক্ষক জানালেন, স্থানীয়দের স্কুলে আনতে অনেক কাঠখড় পোহাতে হয়। যারা আসছে তাদের চাইনিজ ভাষার মৌলিক জ্ঞানটুকু নেই। তাই রেগুলার ক্লাসের

বাইরে অতিরিক্ত সময় দিতে হয় চীনা ভাষা শেখার জন্য। স্কুলে কোনো ফি নেওয়া হয় না এবং দূরদূরান্ত থেকে আগতদের জন্য হোস্টেল সুবিধাও আছে। স্কুলের অর্থায়ন হয় স্থানীয়দের কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে। এছাড়া অন্যান্য প্রদেশের মুসলিমরাও সহযোগিতা করেন।

...২০০১ সালে স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতা সালিমার সাথে কথা বলে আমি আরো অনেক কিছু জানতে পারি। সালিমা পাকিস্তানে দশ বছর পড়াশুনা করে ইউনানে ফিরে আসেন। তিনি একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮১ সালে যখন তার বয়স ষোল বছর তখন তিনি বাড়ি থেকে দুদিনের পথ পড়ি দিয়ে শাদিয়ানের মাদরাসায় যেতেন। সেখানে ১০০জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২০ জন ছিল ছাত্রী। দুই বছর পর তার শিক্ষাকাল শেষ হলে আরো উচ্চতর শিক্ষার জন্য উত্তরপশ্চিমে গানশু অঞ্চলের একটি শতভাগ মহিলা ইসলামিক স্কুলে যাবার কথা ছিল। সেখানে না গিয়ে তিনি ঝাওতংএ ফিরে আসেন এবং একটি ছোট মসজিদভিত্তিক মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় তিনি অত্র এলাকায় একটি মহিলা মাদরাসা বা ইসলামিক গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এলাকাটি পুরো চীনের মধ্যে সবচেয়ে গরীব এলাকা। তিনি একটি পরিকল্পনা দাড় করান এবং দশটি মসজিদের কর্তাব্যক্তিদের সাথে মহিলা মাদরাসা প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। প্রথমে কিছু লোক বিরোধিতাও করেছিল। কিন্তু তিনি তার সুন্দর যুক্তি দিয়ে সবাইকে বুঝাতে সক্ষম হন। এভাবেই মসজিদের লাগোয়া দুইরুমের এই মাদরাসাটি ১৯৮৫ সালে যাত্রা শুরু করে।"

যদিও চীন সরকারের নিয়ম অনুযায়ী শিশুদের নয় বছরের প্রাথমিক শিক্ষাজীবন বাধ্যতামূলক এবং বিনা বেতনের তবুও নাটকীয়ভাবে গত বিশ বছরে (২০০১ সালের এই তথ্য ওই গবেষণা পত্রে সংযোজিত হয়) এই অঞ্চলে সরকারি সহযোগিতা কমে গেছে। ফলে স্থানীয় ছাত্রদের নানান রকম ফি দিতে হয় স্কুলের ব্যয় মিটাতে। ফলস্বরূপ দরিদ্রপ্রধান এলাকাগুলোতে দেখা গেল পরিবার থেকে একজনকে স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে লাগলো পরিবারগুলো এবং স্বাভাবিকভাবেই বালক সন্তানকে তারা পাঠাত।

চীন সরকারের তথ্য অনুযায়ী সেদেশের প্রায় ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু বা উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারে। এছাড়া উপজাতি বা নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য ১১টি প্রদেশে প্রায় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করা হয়েছে বলেও সরকার দাবি করে। কিন্তু সম্প্রতি শ্রেণিকক্ষে চীনা ভাষায় লেকচার দেবার নির্দেশনা দেয়ায় বিপাকে পড়েছে নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। উইঘুর, তিব্বতি ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা চীনা ভাষা তেমন না বুঝায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে তাদের ভাষা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে একবছরের চীনা ভাষা শিক্ষা কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু এতে করে তাদের জীবন থেকে মূল্যবান একটি বছরও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলে দেখা যাচ্ছে উচ্চশিক্ষা একরকম কঠিন হয়ে গিয়েছে।

আবার পড়াশুনা শেষ করে চাকরির বাজারে আরেক সমস্যায় পড়তে হয় নৃগোষ্ঠীর মানুষদের। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ভাল পদে চাকরিতে মূল জনগোষ্ঠীর হানরা অলিখিত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। অনেক সময় কর্তৃপক্ষের ওপর জোর খাটিয়ে হলেও তারা চাকরি নিয়ে নেয়। চাকরি খোঁজার জন্য নৃগোষ্ঠীগুলোকে নিজ নিজ এলাকায় কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে আসতে হয়। এভাবে শত কাঠখড় পুড়িয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘুরা আগ্রহ পান না। এর মধ্যে উইঘুরদের অবস্থা আরো করুণ। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০০-৭০০ নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী সুযোগ পায় তন্মধ্যে উইঘুর শিক্ষার্থী ৫০জনও হবে কিনা সন্দেহ।

উইঘুরদের স্বাস্থ্যচিকিৎসা

চীনা চিকিৎসাবিদ্যা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘু উভয় শ্রেণির মানুষদের হাতে ভিন্নভিন্ন পদ্ধতি প্রকরণে সমৃদ্ধি পেয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান ও সংস্কৃতির প্রভাবে সংখ্যালঘু জাতি গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ধরণের ঔষধপত্র। এসব জাতির মধ্যে তিব্বতী, মঙ্গোল, উইঘুর, কোরীয়, চুয়াং, দাই, ঈ, মিয়াও, লাহু উল্লেখযোগ্য।

কিছু জাতিগোষ্ঠীর যেমন রয়েছে নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি, তেমনি রয়েছে বিশেষ তত্ত্বও। কিছু কিছু জাতির পণ্ডিতদের কাছে দুর্লভ কিছু চিকিৎসাবিষয়ক বই-পুস্তক সংরক্ষিত রয়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজনে তারা সেইসব বই দেখে চিকিৎসা দেন। আবার কোন কোন জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে শুধু মুখে খাওয়ার ঔষধ। আবার কিছু জাতিগোষ্ঠীর আছে যারা হান জাতির ঔষধ ও বিদেশী ওষুধ দিয়ে নিজেদের ঔষধ বানায়। যেমন, তিব্বতীরা ঔষধে হান ওষুধ আর প্রাচীন ভারতীয় ঔষধের উপকরণ মিশিয়ে নতুন ঔষধ তৈরি করে। মঙ্গোলীয় ওষুধে থাকে হান, তিব্বতী আর রুশ ঔষধের উপকরণ।

উইঘুর চিকিৎসাবিদ্যা

পূর্ব ও পশ্চিমের চিকিৎসাবিদ্যা মধ্য এশিয়ার এই স্থলবেষ্টিত জিনজিয়াংয়ে এসে মিলিত হয়, যার ফলে স্থানীয় জাতিগোষ্ঠীর চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। কাজেই উইঘুর চিকিৎসাবিদ্যা নিজের পদ্ধতির ভিত্তিতে অন্যান্য অঞ্চল ও সংখ্যালঘু জাতির চিকিৎসাবিদ্যার নির্যাস নিয়ে একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাবিদ্যা প্রণয়ন করে। ব্রিটিশ লেখক, গবেষক, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পার্সি সাইকস তার বিখ্যাত *Through Deserts and Oases of Central Asia* গ্রন্থে বলেন, 'উইঘুরদের চিকিৎসা হলো ইউনানী চিকিৎসা'। আর ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতিটি এসেছে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা থেকে। বর্তমানে ইউনানী চিকিৎসার যেমন আধুনিকায়ন হয়েছে তেমনি অনেক আধুনিক চিকিৎসার উপকরণও উইঘুররা ব্যবহার করছেন। উইঘুরদের অনেক নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতি ও উপকরণ চীনের মূল চিকিৎসায়বিদ্যায় সংযোজিত হয়েছে।

ঔষধ তৈরি সংক্রান্ত এক জরিপে দেখা গেছে, জিনজিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে সব মিলিয়ে ৬০০ ধরনের ঔষধ রয়েছে। যার মধ্যে

৩৬০ ধরণের ঔষধ অন্যান্য প্রদেশেও চলমান এবং ১৬০ ধরনের ঔষধ তাদের নিজেদের ঘরোয়াভাবে তৈরি বিশেষ ঔষধ। নিজেদের উৎপাদিত ঔষধের অনুপাত ২৭ শতাংশ। উইঘুর ঔষধপত্রে সুগন্ধী গাছ-গাছড়া আর বিষাক্ত গাছ-গাছড়া উভয়ই ব্যবহৃত হয়। উইঘুর ঔষধ তৈরিতে কস্তুরী, এমবারগ্রিস, লাইলাক ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

অন্যদিকে হুই চিকিৎসাবিদ্যা হচ্ছে হান আর আরব-ইসলামী চিকিৎসাবিদ্যার মিশ্রণ। চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ষের যুগে অর্থাৎ চীন আর ইউয়ান রাজার আমলে প্রকাশিত হুই হুই ইয়াও ফাং নামে একটি বইতে হান বড়ি, মালিকা, পাউডার ও তরল ওষুধ এবং আরব ঔষধ যেমন সুগন্ধী দ্রব্য, কলুনারিয়াম, ফলের রস মিশ্রিত এলকোহল জাতীয় পানীয় এবং সিরাপ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুদীর্ঘ উন্নয়নের ধারায়, হুই চিকিৎসাবিদ্যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে খাবারের সঙ্গে ঔষধ মেশানো, বা খাবার খেতে খেতে নিরাময় লাভ ইত্যাদি। যেমন তিলের তেলের সঙ্গে মিরাবিলাইট মিশিয়ে কোষ্ঠকাঠিন্য, গলনালীর প্রদাহ এবং প্রাথমিক পর্যায়ের ক্যান্সারের নিরাময় করা হতো।

তবে রোগ প্রতিরোধ, নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে চীনা ভেষজ ঔষধের সুনাম বিশ্বজোড়া। সেসব ঔষধ ভেষজ, প্রাণীজ, খনিজ, কিছু রাসায়নিক এবং জৈব পদার্থ নিয়ে তৈরি। চীনা ঔষধের আবিস্কার ও প্রয়োগের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। তবে চীনা চিকিৎসাবিদ্যা কথাটি চীনে পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যার প্রবেশের পরই পরিচিতি পেয়েছে। চীনা চিকিৎসাবিদ্যার লক্ষ্য হচ্ছে পশ্চিমা চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে তার পার্থক্য তুলে ধরা, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা।

চীনা ভেষজ ওষুধের ইতিহাস

চীনা ইতিহাসে এই গল্প প্রচলিত আছে, শেন নোং নামের এক লোক একই সময়ে অনেক গাছ-গাছড়া খেয়ে বিষক্রিয়ার শিকার হয়ে মারা যান। এতে বোঝা যায়, চিকিৎসাবিদ্যা আবিষ্কার করতে গিয়ে চীনাদের কতই না দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ২২ শতাব্দি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে অর্থাৎ সিয়া, শাং এবং চৌ রাজামলে এলকোহলিক ঔষধ আর স্যুপ ঔষধের আবির্ভাব ঘটে। চৌ রাজামলে (খ্রিস্টপূর্ব ১১ শতাব্দি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭১)

"কবিতার বই" বা চীনা ভাষায় "শি চিং গ্রন্থে" চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে কিছু লেখা হয়েছিল। এটিই হচ্ছে প্রাচীন চীনা চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে সবচেয়ে পুরনো বই। "নেই চিং" নামে আরেকটি বই, যেটিতে সবার আগে চীনা চিকিৎসাবিদ্যার তত্ত্ব লিখিত ছিল, তাতে উঁচু তাপমাত্রার জ্বর হলে রোগীর শরীর শীতল করতে বলা হয়। এতে ওষুধে পাঁচটি ভিন্ন সুগন্ধ যোগ করা এবং শরীরের ভেতরে তেতো ভাব হলে উদরাময় বা পাতলা পায়খানা হতে পারে, এমন সব কথাগুলোও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলোই চীনের চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি।

প্রাচীনতম চীনা ভেষজ ওষুধের বইটির নাম "শেন নোং বেন ছাও চিং"। এখানে "বেন" মানে শেকড় আর "ছাও" মানে ডগা। বইটি লেখা হয় ছিন আর হান রাজামলে (খ্রিস্টপূর্ব ২২১- খ্রিস্টীয় ২২০), ছিন রাজ আমলের আগে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের কাজের ভিত্তিতে। বইটিতে যে ৩৬৫ ধরণের ঔষধের উল্লেখ রয়েছে, তার অনেকগুলোই আধুনিক ক্লিনিকে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূলতঃ এই বইটি প্রাচ্যের চিকিৎসাবিদ্যার গোড়াপত্তন করে। থাং রাজামলে (খ্রিস্টীয় ৬১৮-৯০৭) অর্থনীতির উন্নয়ন প্রাচ্যের চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশে ভূমিকা রাখে। থাং রাজ সরকার থাং বেন ছাও নামে পৃথিবীর প্রথম ঔষধ বিজ্ঞানের বই লেখায়। এই বইতে ৮৫০ ধরণের সচিত্র ভেষজ গাছ-গাছড়া অন্তর্ভূক্ত হয়, যেগুলো প্রাচ্যের চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে সহায়ক হয়। মিং রাজামলে (খ্রিস্টীয় ১৩৬৮-১৬৪৪), ভেষজ চিকিৎসাবিদ লি শি জেন ২৭ বছর সময় ব্যয় করে "বেন ছাও গাং মু" নামে একটি গ্রন্থ সম্পন্ন করেন। এই বইটিতে ১৮৯২ ধরণের ভেষজ ওষুধ অন্তর্ভুক্ত হয়, যার ফলে তা হয়ে পড়ে চীনের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বই যার মাঝে সর্বাধিক ভেষজ ঔষধের প্রকারবৈচিত্র অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৪৯ সালে নয়াচীন প্রতিষ্ঠার পর, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, শনাক্তকরণ বিজ্ঞান, রসায়ন, ওষুধ বিজ্ঞান আর ক্লিনিকাল মেডিসিন ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে প্রভূত গবেষণার কাজ হয়। এই সব গবেষণাকর্ম ভেষজ ঔষধের উৎস শনাক্তকরণ এবং ভেষজ ঔষধের সত্যতা আর কার্যকারিতা নিরূপনের জন্যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি যুগিয়ে দেয়। পরবর্তীতে ঔষধের উৎস নিয়ে একটি দেশব্যাপী জরিপ হয়, এবং তারই সুফল হচ্ছে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ চোং ইয়াও চি। ১৯৭৭ সালে ভেষজ ঔষধের অভিধান প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হয়। এতে ৫৭৬৭টি ভেষজ ঔষধের নাম পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রেফারেন্স বই, গবেষণা পুস্তক, পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিন বা সাময়িকী বেরোয় চীনা

চিকিৎসাবিদ্যার ওপর। পাশাপাশি চীনা চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, শিক্ষাদান আর উৎপাদন প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠে। আর এসব ক্ষেত্রেই উইঘুরদের চিকিৎসা পদ্ধতি ও উপকরণগুলোর বর্ণনাও থাকে। কারণ এখন উইঘুররা চীনেরই অংশ।

উইঘুরদের ভাষা ও সাহিত্য চর্চা

তারিম জলাভূমির লোকেরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত। কেউ সাকা বা খোতানিজ ভাষায়, কেউ তোচারিয়ান ভাষায় আবার কেউবা গান্ধারী। তুর্কি থেকে আগত লোকদের ভাষা ভাষাবিদদের তালিকাভুক্ত হয় ৯ম শতকে। স্থানীয়দের ভাষার সাথে মিলেমিশে ধীরে ধীরে তাদের ভাষা একটি নতুন ভাষাধ্বনি তৈরি করে। ১১ শতকে এসে সে ভাষা 'মাহমুদ আল-কাশগড়ী'র হাতে লিখিত রূপ পায়। কাশগড়ী উল্লেখ করেন, স্থানীয়রা তুর্কি ভাষা ঠিকমত জানত না। তারা প্রথমে খোতনিজ ভাষায় কথা বলত। এটা কারাখানিদ যুগের কথা। পরে আল কাশগড়ী এবং 'ইউসুফ বালাসগুন' তাদের তুর্কি ভাষাকে খাকানিয়া বা রাজকীয় ভাষা বলে বর্ণনা করেন। এই খাকানিয়া ভাষাকে "কাশগড়ের ভাষা" অথবা শুধু তুর্কি ভাষাও বলা হতে থাকে তখন থেকে। আধুনিক উইঘুর ভাষাকে তুর্কি ভাষা পরিবারের কারলুক শাখা বলে গণ্য করা হয়। এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

উইঘুররা বিভিন্ন বর্ণমালায় তাদের ভাষা লিখেছে। আরবি বর্ণমালায়, চাগতাই বর্ণমালায়, চাগতাইকে আবার কোনা ইয়েজিক বা প্রাচীনলিপি বলা হত। বিংশ শতাব্দীতে নানা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের ভাষালিপিও নানারূপ ধারণ করে। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত উইনিয়ন বা রাশিয়া কর্তৃত্ব নিয়ে নিলে উইঘুরদের ওপর তারা সিরিলিক বর্ণ ব্যবহারে নির্দেশ দেয়। ফলে আরবি বর্ণে উইঘুর লেখা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। সমাজতান্ত্রিকরা যেহেতু শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলত এবং জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল তাই তারা প্রথম নিজেদের অভ্যন্তরীন সংস্কারেই বেশি নজর দেয় এবং উইঘুরদের ভাষালিপিতে হাত দেয়নি। এ সুযোগে উইঘুররা নিজেদের আরবি বর্ণের মাতৃভাষা চর্চার সুযোগ পায়। ১৯৫৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন বা মাও সেতুংয়ের কমিউনিস্ট

রাষ্ট্র হবার পর রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক খারাপ হবার কারণে হোক কিংবা উইঘুরদের মন জয় করার উদ্দেশ্যে হোক আবার সিরিলিক থেকে আরবি বর্ণমালা বা উইঘুরদের নিজস্ব বর্ণমালা ব্যবহারের সরাসরি নির্দেশনা দেয় চীন সরকার। তবে ৯০'র দশকের শুরু থেকেই দ্রুত শিল্পোন্নয়নের চীনে উইঘুর জাতি ও তাদের ভাষার ওপর প্রচ্ছন্ন সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়।

সামরিক বাহিনী ও কমিউনিস্ট রাজনীতিবীদদের যৌথ তত্ত্বাবধানে জিনজিয়াং প্রদেশে স্বায়ত্বশাসন চালু করার মাধ্যমে উইঘুরদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নীলনকশা বাস্তবায়ন শুরু হয়। স্কুল কলেজগুলোতে যেখানে উইঘুর ভাষা চর্চা হতো সেখানে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সর্বশেষ ২০১০ সালের পর চীন সরকার আরবির পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে উইঘুর ভাষা লেখার কঠোর নির্দেশনা দেয় এবং আরবি বর্ণ লেখা, আরবিতে লেখা বই-পুস্তক উইঘুরদের জন্য অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করে।

কিং রাজারা চীনের ভাষার ওপর প্রথম একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য ভাষা অভিধান প্রণয়ন করে। যার নাম Pentaglot Dictionary. এতে চাগতাই তুর্কি ভাষা হিসেবে যে ভাষা অন্তভুক্ত হয়েছিল সেটিই আসলে আজকের উইঘুর ভাষা। খ্রিস্টান মিশনারিরা উইঘুর ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা জোরদার করে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে। জর্জ ডব্লিউ হান্টার, জোহান্নাস আবতারানিয়ান, মাগনুস, ফ্রেডরিক হইজার, ফাদার হেনড্রিকস, জোসেফ মাসরুর আন্না, আলবার্ট এন্ডারসন, গুস্তাভ আলবার্ট প্রমুখ খ্রিস্টান মিশনারি উইঘুর ভাষায় লেখালেখি ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তারা এ ভাষাকে পূর্বতুর্কী ভাষা বলে মন্তব্য করেন। এরমধ্যে জোহান্নাস আবতারানিয়ান একজন তুর্কি কিন্তু খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে চীনে আসেন ধর্ম প্রচার করতে। বিশেষ করে উইঘুরদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করাই ছিল তার লক্ষ্য। ১৯৫০ সালে উইঘুর ভাষায় বাইবেল রচিত হয়। তবে 'আলতিশাহর-জাঙ্গারিয়ান উইঘুর ভাষা পরিচয়টি প্রথম ব্যবহার করেন সোভিয়েত শিক্ষিত উইঘুর পণ্ডিত আব্দুল কাদির হাজী ১৯২৭ সালে।

সাহিত্য চর্চা

প্রাচীন উইঘুর ভাষায় সাহিত্য বলতে বৌদ্ধ ও মানিকিয়ান ধর্মগ্রন্থগুলোর উইঘুরভাষায় লিপিবদ্ধকরণই ছিল। অল্প কিছু কবিতা, গল্প ও বর্ণনামূলক

লেখাও ছিল। তবে কারাখানিদ যুগেই উইঘুরদের সাহিত্য বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে মনে করেন আধুনিক উইঘুর পণ্ডিতরা। অনেক সাহিত্যই সেসময়ে রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন ইসলামি বই, তুর্কিজাতির ইতিহাস সংক্রান্ত বই উল্লেখযোগ্য এবং বহুল পরিচিত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে সংরক্ষিত আছে। ইউসুফ খান হাজিব এর ১০৬৯-৭০ সালে রচিত Kutadgu Bilig গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। ইংরেজিতে যার অর্থ 'উইজডম অব রয়েল গ্লোরি' বাংলায় 'রাজ দরবারের প্রজ্ঞা'।

সমকালীন আরেকটি বই বেশ গুরুত্বের সাথে এখনো সংরক্ষিত। বইটির নাম *Dīwānu l-Luġat al-Turk* "A Dictionary of Turkic Dialects"। বাংলায় যার অর্থ 'তুর্কি উপভাষার অভিধান'। প্রকাশিত হয়েছিল ১০৭২ সালে। আহমেদ উকনেকি নামের আরেক সাহিত্যিকের *Etebetulheqayiq*. নামের বইটিও উল্লেখযোগ্য।

উইঘুরদের ধর্মীয় বইপুস্তকে তাজকিরাহ বা ইসলামী ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিদের জীবনী প্রাধান্য পেয়েছে। তুর্কি ভাষায় 'তাজকিরা-ই খাজেগান' নামের এমনি একটি জনপ্রিয় বই রচনা করেছিলেন সাদিক কাশগড়ী নামের একজন পণ্ডিত। ১৬০০ সাল হতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়ে এরকম অসংখ্য তুর্কি ভাষায় তাজকিরাহ বা জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। সেসব গ্রন্থের উপজীব্য ছিল স্থানীয় সুলতান বা শাষক, যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা কোন সেনাপতি কিংবা ধর্মপ্রচারক মহান কোন দরবেশ। আধুনিক কালে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যকর্ম সম্ভবত আবদু রেহিম ওটকুর রচিত "ইজ ওইঘাংঘান জিমিন" জর্দুন সাবির রচিত 'এনাযুর্দ' এবং জিয়া সামেদি রচিত উপন্যাস "মাইমখান" বা মিস্টরি অব দা ইয়ারস বা শত বছরের রহস্য।

উইঘুরদের ভাষা ও সংস্কৃতিতে রাশান ভাষার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বিশেষ করে কাজাখস্তানে। কাজাখাস্তানে বসবাসরত কয়েক লক্ষ উইঘুরদের শিক্ষা গবেষণায় রাশান সরকার এখনো অনুদান ও প্রণোদনা দিয়ে আসছে। যদিও এ পরিমাণ দিন দিন কমছে। আগে অনেক রাশান উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসেবে 'উইঘুর জাতিগোষ্ঠীর জীবনধারা'কে বেছে নিত। এ নামে কোর্স ছিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এখন কাজাখস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুধু উইঘুররাই এ বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করে।

উইঘুরদের সংস্কৃতি চর্চা

সঙ্গীত

আমাদের দেশের মতো উইঘুররা স্থানীয় বিভিন্ন বাদ্য বাজনা দিয়ে গান করতে অভ্যস্ত। নিজস্ব সঙ্গীত, নৃত্য আর শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ উইঘুররা আমাদের দেশের মতোই জারি সারি পালাগানের আসর বসায়। সেক্যুলার কালচারে অভ্যস্ত অধিকাংশ মানুষ নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে এসব আসরে যোগ দেয়। নারী-পুরুষ সম্মিলিত বাদক দল, নৃত্যদলও রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পড়ে নারী শিল্পীরা নৃত্য করে। একক, দলগত কিংবা দ্বৈত সবরকম নৃত্যই দেখা যায়। কামিজ, সেলোয়ার আর মাথায় স্কার্ফ পড়ে নারীরা। পুরুষরা পড়ে পঞ্জাবী পাজামা ও বহুল পরিচিত চৌকোনা কাশগড়ী টুপি। বর্ণিল এসব পোশাক পড়ে বাদক দল গোল হয়ে বসে। কারো হাতে একতারা, কারো হাতে সারিন্দা বা বেহালা আবার কেউবা বাশি কিংবা ঢোল নিয়ে বসে পড়ে বাদক দলের সাথে। তবে আরবের দফের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি আসরে একদল বাদক ছোট্ট ঢোলের মতো একমুখ খোলা দফ নিয়ে গানের তালে তালে বাজাতে থাকে। মাঝখানে ছিপছিপে গড়নের সুন্দরী কিশোরী বা অষ্টাদশী একজন নাচতে থাকে ঐতিহ্যবাহী ঢঙ্গে। সে গানের তান বা নাচে কোন উন্মাতাল অবস্থা নেই। মার্জিত, শালীন আর রুচিসম্পন্ন আমাদের বাঙ্গালী সঙ্গীতাসরের তুলনায়।

বিশ্বায়ন আর পশ্চিমা সংস্কৃতির জোয়ারে বাঙ্গালীর মতো তারাও ভেসে যাচ্ছে বলা যায়। আধুনিক সঙ্গীতস্রোতের নামে তারাও পশ্চিমা বাদ্য, সুর ও কম্পেজিশনের পথে হাটছে। ব্যান্ডসঙ্গীত, রক চলছে। ছায়াছবি ধরনের গান কিম্বা, মিউজিক ভিডিও বানানো হচ্ছে। এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এত নির্যাতিত তারা এসব করার সময় পায় কিভাবে বা কারা এসব বানায়। এর জবাব হলো, সব উইঘুর নির্যাতনের শিকার নয়। সর্বকালে, সবসময় এমনকিছু সুবিধাভোগী দালালশ্রেণি থাকে যারা নিজ জাতির প্রতি দায়িত্বহীন, সুবিধাবাদী, ভোগবাদী, আত্মবিস্মৃত। ইউরোপ আমেরিকার উইঘুর সংগঠনগুলোকে এ ধরনের কালচারাল প্রোগ্রাম বেশি আয়োজন করতে দেখা যায়। চীন সরকার ওই সব আত্মবিস্মৃত লোকদের খুব পছন্দ করে। তাদেরকে বিভিন্ন কাজে লাগায়। বিনিময়ে ভোগবাদী জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। আর তারাই এধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

তাদের ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীতের নাম মোকাম। ১২টি মোকাম মিলে গাওয়া একটি গানকে উইঘুরদের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ধরা হয়। আরবি মাকামাত শব্দ থেকে মোকাম এসেছে। যার অর্থ স্থান, কেন্দ্র। গত ১৫০০ বছরে মধ্যে এ গান তৈরি হয়েছে বলে গবেষকদের ধারণা। উত্তর-পশ্চিম চীন এবং মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এ মোকাম গান গাওয়া হত। যা পরবর্তীতে ইউরেশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশেও প্রচলিত হয়। এই মোকাম গানের আবার ভিন্ন ভিন্ন সুর ও তান তৈরি হয় জিনজিয়াংয়ের এলাকাভেদে। দোলান, ইলি, কুমুল আর তুরপানের সুর ভিন্ন ভিন্ন। সবচেয়ে সমৃদ্ধ সুর ধরা হয় পশ্চিম তারিম অববাহিকার অঞ্চলের সুরকে। ১৯৫০ সালে তুরদি আখুন এবং ওমর আখুন কর্তৃক গাওয়া সুরকে মূল সুর ধরে এ অঞ্চলে একটি ভিন্নধারার গান প্রচলিত হয়। অবশ্য লোকজ শিল্পীরা তাদের গানকে তুর্কি তাকসিম নামক একদল শিল্পির গাওয়া গানের অনুরূপ মনে করে।

জাতিসংঘের উইনেস্কো উইঘুরদের এই মোকাম সঙ্গীতকে অবস্তুগত ঐতিহ্য বলে ঘোষণা করেছে। আমাননিসা খান বা আমানি শাহান (১৫২৬-১৫৬০) এই মুকাম জাতীয় ১২টি সঙ্গীত সুর সংগ্রহ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। রাশিয়ান পণ্ডিত পান্তুসভ লিখেন যে, উইঘুররা নিজেরা তাদের এসব সঙ্গীত যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। তাদের ৬২ রকম সঙ্গীতযন্ত্র বা বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। আর প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এর কোন না কোন একটি যন্ত্র অবশ্যই পাওয়া যাবে। উইঘুরদের মাঝে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হওয়া যন্ত্র হলো দোতার, যা আমাদের দেশের দোতারার মতোই দেখতে।

নৃত্য

উইঘুরদের মধ্যে সানাম নামের এক ধরনের নৃত্য বেশ জনপ্রিয়। এটা সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানে, উৎসবে কিংবা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়। গান এবং বাদ্যের তালে তালে এ নৃত্য প্রদর্শন করে এক বা একাধিক শিল্পী। সামা হলো এক ধরনের দলগত নাচ যা নওরোজ উপলক্ষে নাচা হয়। আরো যেসব নৃত্য উইঘুরদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো হলো দোলন নৃত্য, শাদিয়ানি নৃত্য, নাজিরকম নৃত্য। উইঘুরদের হ্যান্ডড্রাম বাজনাকে বলা হয় ড্যাপ। যা নৃত্যের তালে তালে বাজানো হয়।

শিল্পকর্ম

১৯ শতকের শেষ হতে বিংশ শতকের শুরু পর্যন্ত সময়ে জিনজিয়াংয়ের সিল্ক রোড এলাকাগুলোতে বৈজ্ঞানিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা জোরদার করা হয়েছিল। গবেষকদল তাদের অভিযানে খুঁজে পান ঐতিহাসিক নানান নিদর্শন। তারা খুঁজে পান অসংখ্য গুহা মন্দির, ধ্বংসপ্রাপ্ত আশ্রম। সেখানে যেমন ছিল দেয়ালচিত্র, মিনিয়েচার বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম তেমনি ছিল অসংখ্য পুথি পুস্তিকা, বই পত্র, দলিল দস্তাবেজ। প্রায় ৭৭টি পাহাড় কেটে বানানো গুহার সন্ধান পান গবেষকদল। যার অধিকাংশই আয়তকার বা চৌকোনবিশিষ্ট; চতুর্পাশে গোলাকার খিলান; চারটি ভাগে বিভক্ত প্রতিটি ভাগেই রয়েছে বুদ্ধের প্রতিকৃতি। আবার কোন কোন উপর-দেয়ালে গৌতম বুদ্ধের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগুরুদের প্রতিকৃতি আঁকা। সেসব ধর্মগুরু বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন ভারতীয় রয়েছে তেমনি রয়েছে পারস্য কিংবা উইরোপীয়। উইঘুরদের মধ্যে ইসলাম আসার পর সেখানকার শিল্পকর্ম পরিবর্তন হতে থাকে। হিন্দু-বৌদ্ধদের ধর্মীয় মূর্তি বা প্রতিকৃতির বদলে স্থান করে নেয় আব্বাসীয় আমলে তৈরি করা দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যময় মসজিদ। পারস্য, তুরস্ক, আন্দালুসিয়া কিংবা বোখারা, সমরকন্দের মতো প্রশস্ত দেয়াল আর বিশালাকার মিনারবিশিষ্ট রাজসিক মসজিদগুলো আজও টিকে আছে কাশগড়, উরামকি, হোতান, কিজিকসুর জমিনজুড়ে। কিন্তু কমিউনিস্ট চীনা প্রজাতন্ত্র কায়েম হবার পর অসংখ্য মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। উগ্রবাদী হানদের নির্মম আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে প্রশান্ত, মার্জিত এবং ভদ্র উইঘুর সমাজ। সর্বশেষ অবস্থা তো বলাইবাহুল্য। অধিকাংশ উইঘুর মুসলিমের কোনো পরিবার নেই। কাশগড়, আকসু, উরামকি, হোতানের ঘরে ঘরে কান্নার রোল। এমনকি অনেক ঘরে কান্না করারও কেউ নেই। ঘরের সবাইকেই ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উইঘুরদের খাবারদাবার

উইঘুর মুসলিমদের খাবারে মধ্য এশিয়া এবং চায়নিজ স্বাদের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান খাবার আমাদের মতোই পোলাউ। ওদের ভাষায় 'পলু' বা 'পিলাফ'। পলুর সাথে তারা সাধারণত গাজর কুচিকুচি করে কেটে দেয়, সাথে থাকে পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করা ভেড়া বা গরুর ভাজা গোশত। পলুতে তারা কিসমিশ ও এপ্রিকট বা খুবানিও দেয়। কাবাবও

অনেক জনপ্রিয়। উইঘুর ভাষায় কাবাবকে বলে কাপলার বা চুওয়ানর *Kawaplar* (Uyghur: *Кавaплap*) or *chuanr* আমাদের দেশের বটি কাবাব বা গ্রিলের মতোই হোটেলে সেসব পাওয়া যায়। খাবারগুলো খুবই জনপ্রিয়। এমনকি অন্যান্য প্রদেশে বা বিদেশ থেকেও অনেক পর্যটক তাদের এ খাবার শখ করে খেয়ে যান। আরেকটি জনপ্রিয় উইঘুর খাবার হলো লেহমন। সম্ভবত আরবি লাহমুন (গোশত) থেকে এসছে। আটার খামির দুহাতে নিয়ে পুরুষ রাধুঁনিটি রাবারের মতো টানতে থাকে। এভাবে দুহাতের নিপূণ কর্মে খামিরটি পাকাতে পাকাতে নুডুলসের মতো বানিয়ে ফেলা হয়। নুডুলসের কাছাকাছি বা সেমাইয়ের মতো অসংখ্য পাক দেযা শেষে চুলায় সেদ্ধ করা হয়। ৫/৭ মিনিট সেদ্ধ করে গরুর গোশতের ঝোলের সাথে নুডুলসগুলো দেয়া হয়। ঝোলের সাথে আরো থাকে টমেটো, পিপুল, পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ এবং বাধাকপি। অনেকটা আমাদের দেশের নুডুলসের সাথে স্যুপ মিশিয়ে খাওয়ার মতো। কিন্তু খাবারটি পুরো চীনে একমাত্র উইঘুররাই বানিয়ে থাকে। কাশগড়, উরামকি, হোতানের পথে পথে হোটেলগুলোতে এ খাবার লাইনধরে খেতে দেখা যায়। এ লেহমান পর্যটকদেরও প্রথম পছন্দ।

কাশগড়ে প্রচুর গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস পাওয়া যায়। ফলে মাংসকেন্দ্রিক খাবার উইঘুরদের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে দেখা যায়। সকালের নাশতায় উইঘুররা সাধারণত চায়ের সাথে ঘরে বানানো রুটি খায়। এছাড়া মাংস, দধি, মধু, কিশমিস, কাঠ/কাজু বাদামও খায়। মেহমানদারি করে চায়ের সাথে নান রুটি দিয়ে। আর খাবারের শুরুতে ফল থাকা চিরাচরিত নিয়ম। উইঘুরদের সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলোতে ফলের বাগান থাকবেই। আমাদের গ্রামে যেমন বাড়িতে লাউ, সিম, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গার ঝাকা/মাচা দিয়ে দিতেন আমাদের মা-দাদিরা তেমনি উইঘুররা ঘরের সাথে বারান্দায়, বাড়ির উঠানে আঙ্গুরের চাষ করে। ঝাঁকায় থোকা থোকা আঙ্গুর ঝুলতে থাকে।

উইঘুরদের আতিথেয়তার জুড়ি নেই। তারা উঠানে চেয়ার পেতে রাখে সবসময়। যে কেউ বাড়িতে আসলে বসতে পারে। যে কেউ ঘুরে ঘুরে আঙ্গুর বাগান দেখতে পারে। ছিড়ে খেতে পারে। অনেক সময় বাড়ির কিশোরী-তরুণীরা মেহমানদের তাদের ঐতিহ্যবাহী গানের সুরে সুরে নেচে দেখায়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরো কিছু খাবার হলো সাংজা-আটার সাথে মসলা মিশিয়ে ভাজ হয়, আমাদের দেশের আলুর চপের মতো। শামসা-

ভেতরে ভেড়ার গোশত ঢুকিয়ে আটা দিয়ে বানানো হয়, আমাদের দেশের সমুচার মতো। সমুচা কি শামসা থেকেই এসেছে? ইউতাজি-একাধিক স্তর বিশিষ্ট রুটি। গোশনান-ভেড়ার গোশতের টুকরা টুকরা করে কড়াই ভাজা। পামিরদিন ভেতরে ভেড়ার গোশত ঢুকিয়ে আটার দলাটিকে সেদ্ধ করে বানানো হয় এই খাবার। শরপা-ভেরার গোশতের স্যুপ। তথুচ-আমাদের দেশের তন্দুর রুটির মতো। গিরদে-আমাদের বাকরখানির মতো তবে আরো পুরু।

উইঘুরদের পোশাকাদি

উইঘুর মুসলিমদের অন্যতম পোশাক হলো চাপান আর দোপা টুপি। চাপান পড়ার অন্যতম উদাহরণ আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই। হামিদ কারজাই তার গায়ে পাঞ্জাবীর উপরে যে দোপাট্টার মতো ঢোলা কোট পড়েন তাই চাপান। আর দোপা হলো চারকোনা টুপি। আমাদের দেশের এমব্রয়ডারি করা মোটা কাপড়ের শক্ত টুপির মতোই সে টুপি তবে পার্থক্য শুধু দোপা একটু চৌচালা ঘরের মতো চারকোনা বিশিষ্ট। চাপান আর দোপা পুরুষরা পড়ে। আর মহিলারা মাথায় খণ্ড কাপড় আর গায়ে সেলওয়ার কামিজ। সেলওয়ার কামিজকে তারা বলে সেলওয়া তেলপেক।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে তুর্কি নারীদের মতো জিনজিয়াংয়ের উইঘুর নারীরাও সারা শরীর ও মুখ-মাথা ঢেকে বাজার সদাই করতেন বলে উল্লেখ করেন বিশিষ্ট গবেষক ও তাতার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক আহমেদ কামাল। জনাব কামালের Land Without Laughter গ্রন্থে পূর্ব তুর্কিস্তানের জীবনযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। পার্সি সাইকস ও এলা সাইকস নামক দুজন পশ্চিমা লেখক ও পর্যটক অবশ্য এক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেন "নারীরা তাদের মুখের নেকাব খুলেই বাজারে যেতে, ব্যবসা করতে চাইতেন কিন্তু মোল্লা তথা ধর্মীয় গুরুরা তাদের নেকাব পড়তে বাধ্য করতেন। এমনকি যেসব নারীরা বাজারে মুখ খোলা রেখে চলাফেরা করতেন তাদেরকে মারধর করা হতো।"

তুর্কিস্তানি মুসলিমরা তাদের পুরো মাথার চুল ছোট করে রাখেন। এই অল্প চুলের মাথা শীতকালে তারা বিশেষ ধরনের পশমি টুপি দিয়ে ঢেকে

রাখেন। তবে বিশেষ কিছু দিন ছাড়া। এই বিশেষ দিনগুলোকে বলা হয় আজুজ আইয়াম। আজুজ আইয়াম হলো বছরের নির্দিষ্ট কিছু দিন, যেমন বসন্তকালে সাত বা এগারদিন পর্যন্ত নখ কাটা, চুল কাটা অমঙ্গলজনক মনে করা হয়। বিশ্বাস করা হয়, এসময় পুরুষরা চুল কাটলে তাদের মাথাকাঁপা রোগ হয় এবং নারীদের মাথা আচড়ালেও একই রোগ হয়। আবার নখ কাটলে হাতকাঁপা রোগ হয়। এসময় তারা কাপড় কাচা থেকেও বিরত থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বের হয় না। বের হলে কাফন-খাট এসে তুলে নিয়ে যাবে। [সূত্রঃ Community Matters in Xinjiang, 1880-1949: Towards a Historical Anthropology ... By Ildikó Bellér-Hann]

আসলে এই বিশ্বাস কুসংস্কার ছাড়া কিছুই না। বুঝা যাচ্ছে ইসলামী শিক্ষা থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকার ফলে এসব কুসংস্কার মুসলিম সমাজে বাসা বেঁধেছিল।

কাশগড়ের ইয়েংগিশার উইঘুর হস্তশিল্প, ছুরি, চাকু নির্মাণের জন্য বিখ্যাত জায়গা। ছুরিকে উইঘুর ভাষায় বলা হয় পিশাক/পিচাক। আর ছুরিগুলোকে বলা হয় পিচাকছিলিক। উইঘুর পুরুষেরা তাদের সাথে সবসময় ছুরি তলোয়ার রাখতেন। এটা তাদের ঐতিহ্য। কিন্তু আধুনিক প্রজাতন্ত্রী কমিউনিস্ট চীন কায়েম হবার পর ধীরে ধীরে এই সংস্কৃতি উঠিয়ে দেয়া হয়। নিরাপত্তা ও সহিংসতার অজুহাত দেখিয়ে ব্যক্তিগত ছুরি রাখাও নিষিদ্ধ করা হয়। *[সূত্রঃJulie Makinen (17 September 2014). "For China's Uighurs, Knifings Taint An Ancient Craft". Los Angeles Times. Archived from the original on 16 July 2016.]*এমনকি এখন স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের প্রতি দুই বাড়ির জন্য একটি ছুরি রাখার নির্দেশ দেয়।

উইঘুরদের ইসলামী নাম রাখা নিষেধ!

উইঘুরদের নাম মুসলিম রীতিতেই রাখা হয়ে আসছিল সুদীর্ঘকাল হতে। আর এটাই তো স্বাভাবিক। একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামী নাম ছাড়া অন্য কিছু কল্পনা করতে পারে? ইসলাম পালনে একনিষ্ঠ উইঘুররা তাই নিজ

সন্তানদের ইসলামী নাম রেখে আসছিল। কিন্তু ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসে চীনের জিংজিয়াং প্রদেশে ঘোষণা দেওয়া হয়- সন্তানের এমন কোনও নাম রাখা যাবে না, যা শুনে মনে হয় সে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সরকারের দাবি, চীনে উগ্রপন্থাকে রুখতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সেই তালিকায় রয়েছে 'জেহাদ', 'সাদ্দাম', 'ইসলাম', 'কুরআন', 'মদিনা'র মতো কয়েক ডজন নামও। সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এইসব নাম রাখা হলে শিশুরা সবরকম সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এমনকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু করা বা সরকারি স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত হবে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লিউ) জানিয়েছে, 'ধর্মীয় উগ্রপন্থাকে উসকে দিতে পারে' শ্রেফ এমন ধারণার ভিত্তিতেই নাম রাখার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ইসলামি শব্দ নিষিদ্ধ করেছে চীন। ধর্মীয় উগ্রপন্থা ঠেকানোর নামে এটি ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর নতুন প্রতিবন্ধকতা'।

'রেসট্রিক্টেড নেমস ফর এথনিক মাইনোরিটিজ' শিরোনামে ২৯টি নামের তালিকা প্রকাশ করে চীন। তালিকায় থাকা নামগুলো হলো, ১. মুজাহিদ ২. জিহাদ ৩. জুনদুল্লাহ ৪. তালিব ৫. ময়দুন, ৬. মোহাম্মাদ, ৭. মুসলিমা ৮. ইমাম, ৯. মুজাহিদিন ১০. ওয়াহাব ১১. সাদা (সম্ভবত সাদ) ১২. মুহতেহিত ১৩. ওসামা ১৪. জিকরুল্লাহ ১৫. নাসিরুল্লাহ ১৬. মুসলিম, ১৭. বাগদাদ ১৮. সিরিয়া ১৯. কিলহিরে ২০. সুমাইয়া ২১. জিকিরিয়্যা (জাকারিয়া) ২২. সাদাম (সাদ্দাম) ২৩. তুর্কিজাত ২৪. তুর্কিনাজ ২৫. এজাহার (আল আযহার) ২৬. হাজি ২৭. ইসলাম ২৮. এরাফাত (আরাফাত) ২৯. মদিনা।

সিল্ক রোডে পৌষমাস সিল্ক রোডেই সর্বনাশ!

১৪৫৩ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের হাতে বন্ধ হওয়া হাজার বছরের পুরোনো সিল্ক রোড আবার চালু করতে চীনাদের জিনজিয়াং অঞ্চলটির নিরঙ্কুশ ও নিরাপদ অধিকার প্রয়োজন। সিল্ক রোড ছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন বাণিজ্য পথের একটি, যা চীনের "হান" সাম্রাজ্যের সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব- পশ্চিমের সংযোগ স্থাপনকারী সিল্ক রোড চীনের সাথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল সমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

স্থাপনের পাশাপাশি শত শত বছর ধরে এটি সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিল্ক রোড ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাণিজ্য পথ। বর্তমানে পৃথিবীর প্রাচীনতম এই বাণিজ্য পথটি ইউনেস্কো এর "ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট" এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমনকি, চীনা সরকার ঐতিহাসিক এই বাণিজ্য পথটি পুনঃনির্মাণেরও ঘোষণা দিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছে।

সিল্ক রোড কি ও এর নামকরণ

সিল্ক রোড একক কোনো পথ নয় বরং নেটওয়ার্ক। এটি অনেকগুলো স্থলভিত্তিক বাণিজ্য পথের সমষ্টি যা চীন, মধ্য এশিয়া, মধ্য প্রাচ্য, আফ্রিকার কিছু দেশ ও ইউরোপকে যুক্ত করেছে। সিল্ক রোড নামটি এসেছে লাভজনক এশিয়ান 'সিল্ক' থেকেই। ঐ সময়ে সিল্ক ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই সিল্ক রোডের যাত্রা শুরু হয়। বিলাসবহুল ও মূল্যবান এই পণ্যটি ইউরোপীয় ও মধ্য এশিয়ান বণিকদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করতে থাকে এবং তারা স্বর্ণ, আইভরি, পশম, কাঁচের জিনিসপত্র, ঘোড়া ইত্যাদির বিনিময়ে চীন থেকে সিল্ক ক্রয় করে নিয়ে যেত। চীনা সিল্ক বা রেশমকে কেন্দ্র করে জমজমাট হয়ে উঠে আন্তঃদেশীয় বাণিজ্য। ফলে, পণ্য-দ্রব্য আনা-নেয়া ও সহজ ভ্রমণের জন্য প্রয়োজন হয়ে উঠে একটি নিরবিচ্ছিন্ন বাণিজ্য পথের।

এই চাহিদা থেকেই খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় সিল্ক রোডের। ১৪৫৩ সালে বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্য চীনের সাথে বাণিজ্য বয়কটের পূর্ব পর্যন্ত সিল্ক রোড ব্যবহৃত হতো। এরপর চীন এই রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়। সিল্ক বা রেশম বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এই রাস্তা নির্মাণ করা হয় বলে এর নামকরণ করা হয় সিল্ক রোড। সিল্ক রোডকে "সিল্ক রুট" নামেও অভিহিত করা হয়। ১৮৮৭ সালে এই নামকরণ করেন জার্মান ভূতত্ত্ববিধ ফার্ডিন্যান্ড ভন রিথোফেন। সিল্ক রোডের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৌশলতভাবে তৈরি কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র, বাজার, পণ্য কেনা-বেচা, বিতরণ, গুদামজাতকরণ এবং বানিজ্য কাফেলাগুলোর জন্য পানি সরবরাহের উৎস হিসেবে তৈরিকৃত জলের প্রবাহ ইত্যাদি।

সিল্ক রোডের ইতিহাস হান সাম্রাজ্যেরও অনেক আগে শুরু হয়। পারস্যের (বর্তমান ইরান) রয়্যাল রোডই মূলত সিল্ক রোডের প্রধান শিরা। সিল্ক রোড যাত্রা শুরুর ও ৩০০ বছর পূর্বে দ্য রয়্যাল রোড যা ইরান থেকে

শুরু হয়ে তুরস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তার যাত্রা শুরু করে। তৎকালীন পারস্যের শাষণকর্তা দারিয়াস কর্তৃক এই রাস্তাটি নির্মিত হয়। আশেপাশের বিভিন্ন ছোট বাণিজ্য পথগুলোকেও যুক্ত করে, যেমনঃ মেসোপটেমিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং মিশর হয়ে উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদি। পরবর্তীতে মেসেডোনিয়ার রাজা অ্যালেকজান্ডার দ্য গ্রেট রয়াল রোড হয়ে পারস্য পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। এরপর এই রয়্যাল রোডেরই অনেকটা অংশ সিল্ক রোডের অন্তর্ভুক্ত হয়।

২০০০ বছরের পুরনো সিল্ক রোড প্রাথমিকভাবে নিজেদের রাজ্যের ভেতরেই সিল্ক বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হতো। রাজ্যের কেন্দ্রস্থল থেকে রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তীয় অঞ্চলগুলোতে কাফেলারা সিল্ক পৌছে দিত। কিন্তু কাফেলাগুলো প্রায় সময়ই মধ্য এশিয়ার ছোট ছোট আদিবাসী গোষ্ঠীদের আক্রমণের স্বীকার হতো। এই আক্রমণ থেকে কাফেলাগুলোকে রক্ষা করতে ও বাণিজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সম্রাট হান উডি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তার জেনারেল ঝাং কিয়ানকে দূত হিসেবে নিযুক্ত করে। হান সাম্রাজ্যের রাজধানী চেং এন থেকে শুরু করে, বিস্তৃত পশ্চিমাঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি ও রাজনৈতিক অবস্থা সমূহ জানতে ঝাং কিয়ান তার বিশাল বাহিনী নিযুক্ত করে।

কঠোর পরিশ্রম ও সাহসীকতার বদৌলতে তারা এই নতুন অঞ্চল সম্পর্কে জানতে সক্ষম হয়। ধীরে ধীরে তারা পশ্চিমের গুরুত্বপূর্ণ অনেক গুলো ছোট ছোট রাজ্যের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হয়। এই অসাধারণ কূটনীতিবিদ ও আবিস্কারক পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং পরবর্তীতে একইভাবে পশ্চিমা বিশ্বের সাথেও বাণিজ্য প্রসারিত হয়। তখন থেকেই ব্যবসায়ীরা সিল্ক রোডে নিরাপদে ভ্রমণ ও বাণিজ্য পরিচালনা করতে থাকে। চীন থেকে বহির্বিশ্বে মূল্যবান সিল্ক নিয়ে যেতে ব্যবসায়ীরা নতুন এই বাণিজ্য পথ অনুসরণ করতে থাকে।

সিল্ক রোডের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব

চীন, কোরিয়া, জাপান, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, হর্ন অব আফ্রিকা ও ইউরোপে সভ্যতার উন্নয়নে সিল্ক রোড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিল্ক রোডের কল্যাণেই এই সকল সভ্যতাসমূহের মধ্যে সুদূর প্রসারী

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যদিও সিল্ক রোডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পণ্য ছিল এশিয়ান সিল্ক, এই পথে অন্যান্য আরো অনেক কিছু বিনিময় হয় যেমন, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এমনকি প্লেগ এর মতো রোগও এই পথেই ছড়িয়ে পড়ে।

অর্থনৈতিক বাণিজ্যের পাশাপাশি সিল্ক রোডের কল্যাণে শিক্ষা সংস্কৃতির আদান-প্রদানও হয়। সিল্ক রোডের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয়টিই ছিল বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান। শিল্প, সাহিত্য, ভাষা, ধর্ম, দর্শন, স্থাপত্যকলাসহ প্রতিটি সভ্যতার সমস্ত কিছুর বিনিময় হয় সিল্ক রোডের মাধ্যমে। এমনকি ৫৪২ সালে সিল্ক রোড ধরেই ভয়ানক এক প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা পৌঁছে যায় কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত যা বাইজান্টিন সাম্রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনে।

সিল্ক রোড বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ব্যবসায়ীরা তাদের বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সমুদ্র পথ বেছে নেয় যার মাধ্যমে শুরু হয় আবিষ্কারের যুগ। এভাবেই আধুনিক বিশ্বের উন্নয়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে যায় সিল্ক রোড।

একুশ শতকের নতুন সিল্ক রোড

চীন, কাজাখস্থান, মঙ্গোলিয়া ও রাশিয়াকে সংযোগকারী "দ্য ইউরেশিয়ান ল্যান্ড ব্রিজ' নামে পরিচিত রেল রোডকে অনেক সময় "নিউ সিল্ক রোড" নামে অভিহিত করা হয়। এই রেলওয়ে লাইনের সর্বশেষ সংযোগের কাজ শেষ হয় ১৯৯০ সালে চীন ও কাজাখস্থান এর রেলওয়ে সিস্টেমের সাথে আলাতাও পাস সংযোগের মাধ্যমে। ২০০৮ সালে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে কাজাখস্থান এর আলমাতি ও আসতানা পর্যন্ত সংযোগ স্থাপন করে। ২০০৮ এর অক্টোবরে প্রথম ট্রান্স ইউরেশিয়া লজিস্টিক ট্রেন জিয়াংতান থেকে জার্মানির হামবুর্গ পৌছায়। ২০১১ সাল থেকে এই লাইনটি চীন ও জার্মানির পণ্য পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, ফলে কন্টেইনারশিপে যেখানে ৩৬ দিন লাগতো সেখানে রেলপথে মাত্র ১৩ দিনেই পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে, এই সেবার আওতায় প্রথমবারের মতো একটি ট্রেন লন্ডন পৌঁছায়। এছাড়াও এই রেললাইনটি মাদ্রিদ ও মিলানকেও সংযুক্ত করেছে।

এছাড়াও স্থল যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির ফলে মূল সিল্ক রোড আবার আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। চীন ও ইউরোপকে সংযুক্ত করতে

চীন সরকার উচ্চ গতিসম্পন্ন বুলেট ট্রেন লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এই ট্রেন লাইন অনেকাংশে পূর্বের সিল্ক রোডের বাণিজ্যিক সুবিধা অনুসরণ করেই নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চীন থেকে ইউরোপ পর্যন্ত নিউ সিল্ক রোডের একটি পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে। এই উদ্যোগের আওতায় প্রাথমিকভাবে পূর্ববর্তী সিল্ক রোডের সাথে যুক্ত দেশসমূহ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব আফ্রিকাকে সংযুক্ত করা হয়। চীন সরকারের এই উন্নয়ন কৌশল কাঠামো "দ্য সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট অ্যান্ড দ্য টুয়েন্টি-ফার্স্ট সেঞ্চুরি মেরিটাইম সিল্ক রোড" বা "ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড" নামে পরিচিত। এছাড়া এই পরিকল্পনাটি "বেল্ট অ্যান্ড রোড" বা "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" নামেও পরিচিত। চীন সরকার এই পরিকল্পনাকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের হাতছানি হিসেবে উল্লেখ করেন। অপরদিকে, সমালোচকরা একে বিশ্ব বাণিজ্যে চীনকেন্দ্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চীনের একটি পদক্ষেপ বলে ধারণা করেন।

সিল্ক রোড ইকোনোমিক বেল্ট

চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর প্রস্তাবিত সিল্ক রোড ইকোনোমিক বেল্ট এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মাঝে রয়েছে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত মূল সিল্ক রোডের অন্তর্গত দেশসমূহ, পশ্চিম এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপ। এই অঞ্চলসমূহের বাইরে "বেল্ট" বা বলয়ের এর বর্ধিত অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকেও যুক্ত করা হবে। এর মধ্যে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বলয় প্রস্তাবিত হয়েছে। উত্তর বলয় মধ্য এশিয়া থেকে রাশিয়া হয়ে ইউরোপে যাবে। কেন্দ্রীয় বা মধ্য বলয় মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়া হয়ে পারস্য উপসাগর ও ভূ-মধ্য সাগর পর্যন্ত যাবে। অন্যদিকে, দক্ষিণ বলয় চীন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া থেকে পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত যাবে।

সিল্ক রোডের স্থল করিডোরগুলোর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে-

দ্য নিউ ইউরেশিয়ান ল্যান্ড ব্রিজ যা পশ্চিম চীন থেকে কাজাখস্থান হয়ে পশ্চিম রাশিয়ায় প্রবেশ করেছে। এই পথের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে সিল্ক রোড

রেলওয়ে যা চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ থেকে শুরু হয়ে কাজাখস্থান, রাশিয়া, বেলারুশ, পোল্যান্ড ও জার্মানিকে সংযুক্ত করেছে।

- চীন-মঙ্গোলিয়া-রাশিয়া করিডোর যা চীনের উত্তরাংশের সাথে রাশিয়ার পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করবে।
- চীন-মধ্য এশিয়া- পশ্চিম এশিয়া করিডোর যা চীনের পশ্চিমাঞ্চল থেকে তুরস্ক পর্যন্ত যাবে।
- চীন-ইন্দোচীন উপদ্বীপ করিডোর যা চীনের দক্ষিণাংশ হয়ে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত যাবে।
- বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মায়ানমার করিডোর যা চীনের দক্ষিণাংশ হতে মায়ানমার পর্যন্ত রয়েছে এবং এই রুটটিকে "বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ" এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
- চীন-পাকিস্তান করিডোর যা চীন থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত যাবে।

ম্যারিটাইম সিল্ক রোড- এই রোডটিও "বেল্ট অ্যান্ড রোড" পরিকল্পনার অংশ। এই রোডের মাধ্যমে সমুদ্র পথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে, দক্ষিণ চীন সাগর, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে বাণিজ্য পথ হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

স্থলপথ ও জলপথের সাথে সাথে উত্তরমেরু অঞ্চলকে এই ইকোনোমিক বেল্ট এর সাথে যুক্ত করতে শি জিনপিং চীন-রাশিয়া হয়ে একটি বরফেরটোইরি সিল্ক রোডের প্রস্তাবনা পেশ করেন। ২০১৪ সালে চীন সরকার সিল্ক রোড নির্মাণের জন্য তহবিল গঠন করেন এবং ইতিমধ্যে সিল্ক রোডের নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে।

সর্ববৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীনের পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সড়ক পথ সিল্করোডের প্রবেশদ্বার উইঘুরদের জিনজিয়াং। তারওপর জিনজিয়াং এ রয়েছে পুরো দেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের ২৫ ভাগ, কয়লার ৩৮ ভাগ, হাইড্রোকার্বনের ২৫ ভাগ, তেলের ১৫ ভাগ মজুদ। কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটির লোকেরা যদি আবার স্বাধীনতা দাবি করে কমিউনিস্টরা কিভাবে তা সহ্য করে? কিন্তু তাই বলে তো নিজ মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করতে পারে না উইঘুররা! তা কি কেউ পারে? বরং মাতৃভূমির জন্য জীবন দেয়াই তো বীরোচিত কাজ! আর

অর্থনৈতিক গুরুত্ব তো মানুষ, মানবতার জন্যই। মানুষ মেরে, মানবতাকে ভূলুণ্ঠিত করে কোন উন্নয়ন সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়।

২০০৯ সালের দাঙ্গা ও তৎপরবর্তী সহিংসতা

পাঠকদের জন্য বিবিসি বাংলায় এ সংক্রান্ত সংবাদের বিস্তারিত তুলে ধরা হলো। সংবাদটি দাঙ্গার ঠিক পরের দিন ০৬ জুলাই, ২০০৯ প্রকাশিত হয়।

চীনের জিনজিয়াং-এ দাঙ্গায় নিহত ১৪০

চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং (জিনজিয়ান বা জিনজিয়াংও বলা হয়) অঞ্চলে এক দাঙ্গায় অন্তত ১৪০ জন লোক নিহত হয়েছে। চীনে গত ২০ বছরের ইতিহাসে সবচাইতে রক্তাক্ত এই দাঙ্গায় মুসলিমপ্রধান অঞ্চলটিতে আরো প্রায় আটশো লোক আহত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ বলছে। আঞ্চলিক রাজধানী উরামকিতে (উরামকিও বলা হয়) রোববার এই দাঙ্গা শুরু হয়, এবং এ পর্যন্ত কয়েকশ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এই দাঙ্গার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ নির্বাসিত উইঘুরদের এক ষড়যন্ত্রের কথা বলছে, তবে নির্বাসিতরা বলছে জাতিগতভবে হান জনগোষ্ঠীর আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট হতাশা থেকে ওই ঘটনা ঘটেছে। বলা হয়েছে, চীনের দক্ষিণাঞ্চলে গুয়াংদং প্রদেশে গতমাসে উইঘুরদের সাথে হান চীনাদের এক সংঘর্ষের জের ধরে এই সহিংসতা ঘটে।

শিনজিয়াংয়ের ছয়জন ছেলে দু'জন নিরীহ মেয়েকে ধর্ষণ করেছে - এই খবর ছড়িয়ে পড়লে শাওগুয়ান শহরে একটি কারখানায় হানদের সাথে উইঘুরদের মারামারি হয়। এতে দুইজন উইঘুর নিহত হয়। জানা গেছে, উরামকিতে প্রতিবাদকারীরা ঐ ঘটনার তদন্ত দাবী করছিল। তবে জিনজিয়াং সরকার বলছে এই হাঙ্গামার জন্য দায়ী যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাসিত উইঘুর নেতা রাবেয়া কাদরী। তিনি উইঘুরদের সংগঠন, বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেসের প্রধান। চীন দাবী করে বিশ্ব উইঘুর কংগ্রেস একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন।

এবার ২০১৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে আল জাজিরার একটি প্রতিবেদনে নজর দেই। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে

জিনজিয়াং প্রদেশে জাতিগত দাঙ্গা ব্যপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আলজাজিরার সংবাদে নিচের তালিকাটি দেয়া হয়েছিল।

সহিংস ঘটনা	সময় ও স্থান	বর্ণনা/অভিযোগ
শাচি সহিংস হামলা	৩০/১২/২০১৩, কাশগড়	শাচি শহরের সরকারি নিরাপত্তা ব্যুরোতে ৯জন উইঘুর মিলে হামলা করে। সন্দেহভাজন ৮জনকে গুলি করে মারা হয় একজন গ্রেপ্তার হয়।
শুফু সহিংস হামলা	১৫/১২/১৩, কাশগড়	পুলিশের উপর বিস্ফোরক ও ছুরি দিয়ে হামলা করা হয়। দু'জন পুলিশ নিহত হয়। সন্দেহভাজন ১৪জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৮জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বাচু সহিংস হামলা	১৬/১১/১৩, কাশগড়	বিক্ষুব্ধ জনতা একটি পুলিশ স্টেশনে হামলা করে দু'জন পুলিশ নিহত হয়। দু'জন আহত হয়। সন্দেহভাজন ৯জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
তিয়ানম্যান স্কয়ারে গাড়ি হামলা	০২.১০.২০১৩, বেইজিং	তিয়ানম্যান স্কয়ারে একটি গাড়ি মানুসেল ওপর উঠে যায়। পুলিশ জানায়, তারা গাড়িতে ছুরি, রড, আগুন জ্বালানোর গ্যাস আর একটি পতাকা পায় যেখানে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠির স্লোগান লেখা ছিল। তিনজন সন্দেহভাজন ও দু'জন পর্যটক নিহত হয়। ৩৮জন গাড়ি চাপায় আহত হয়।
কাশগড় সহিংস হামলা	২০/০৮/১৩, কাশগড়	পুলিশ ও স্থানীয় উইঘুরদের মেধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। উইঘুরদের বোমা বানাচ্ছিল বলে সন্দেহ করে পুলিশ। এক পুলিশ নিহত ও ২২জন উইঘুর মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৪জন গ্রেপ্তার।
হোতান সহিংস হামলা	২৮/০৬/১৩, হোতান	স্থানীয় জনতা একত্রিত হয়ে সমাবেশ করে। পুলিশ সমাবেশ পণ্ড করে দেয়। এতে কেউ হতাহত হয়নি।

শানশান সহিংস হামলা	২৬/০৬/১৩, তুরপান	একদল মানুষ স্থানীয় একটি পুলিশ স্টেশন ও সরকারি ভবনে হামলা চালায়। দই পুলিশসহ ২৪জন নিহত হয়। ২১ জন আহত হয়। ১১জন সন্দেহভাজনকে গুলি করে হতা করা হয় এবং চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বাচু সহিংস হামলা	২৩/০৪/১৩, কাশগড়	বাড়ি বাড়ি গিয়ে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও ছুরিকাঁচি আছে কিনা এমন পরিদর্শনে যাওয়া সরকারি তিন কর্মকর্তার ওপর হামলা করা হয়। এরকম ১৫ জন স্থানীয় কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয় যাদের মধ্যে দশজন উইঘুর, তিনজন হান এবং দু'জন মোঙ্গল। ৬ সন্দেহভাজনকে গুলি করে হত্যা এবং আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
করলা সহিংস হামলা	০৭/০৩/১৩, বাইংসোলিন	করলা শহরে দুটি সহিংস ঘটনা ঘটে। সকল সন্দেহভাজন উইঘুর। এতে ১০জন আহত ও ৫জন নিহত হয়।
জাতীয় দিবস হামলা	০১/১০/১২, কাশগড়	ইয়েচেং জেলায় এক তরুণ আত্মঘাতী বোমা হামলা করে। এতে ২০জন হতাহত হয়। চীনা কর্তৃপক্ষ ঘটনা নিশ্চিত করেনি।
হোতান বিমান ছিনতাই	২৯/০৬/১২, হোতান	তিয়ানজিয়ান বিমান ৭৫৫৪, হোতান থেকে উরামকিগামী, ৬ উইঘুর কর্তৃক ছিনতাই হয়। যাত্রী ও বিমানক্রুরা সফলভাবে ছিনতাই ঠেকাতে সক্ষম হয়। ৬ সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
ইয়েচেং সহিংস হামলা	২৮/০২/১২, কাশগড়	আবুদুকেরামু মামুতি নামের একজনের নেতৃত্বে আট উইঘুর ছুরি, চাপাতি দিয়ে পথচারীদের ওপর হামলা করে। ১৫ জন নিহত হয়। ৮ সন্দেহভাজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এক পুলিশ নিহত ও চার জন আহত হয়।

পিশান হোস্টেজ সংকট	২৮/১২/১১, হোতান	১৫ উইঘুর দুইজনকে পথ দেখিয়ে নিতে অপহরণ করে। এক পুলিশ নিহত ও একজন আহত হয়। সাত সন্দেহভাজনকে গুলি করে হত্যা, চারজনকে আহত এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
কাশগড় সহিংস হামলা	৩০-৩১/০৭/১১, কাশগড়	দুটি হামলার ঘটনা ঘটে কাশগড়ে। তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি এর দায় স্বীকার করে বলে জানানো হয়। ১২জন নিহত ও ৪০জন আহত হয়।
হোতান সহিংস হামলা	১৮/০৭/১১, হোতান	১৮জন উইঘুর তরুণ একটি পুলিশ স্টেশনে হামলা চালায়, নিরাপত্তারক্ষীর ওপর বোমা হামলা ও ছুরিকাঘাত করে। তারা জিহাদী স্লোগান দিতে দিতে আটজনকে ধরে নিয়ে যায়।
আকসু বোমা হামলা	১৯/০৮/১০, আকসু	এক উইঘুর একটি তিনচাকার গাড়িতে বোমা সেট করে সেটি এক পুলিশ কর্মকর্তা ও ১৫ জন নিরাপত্তারক্ষীর দিকে ছেড়ে দেয়। এত ৭জন নিহত, ১৪জন আহত হয়।
সুই হামলা	১৭/০৮/০৯	তিনজন উইঘুর সুইসিরিঞ্জ দিয়ে উরামকির রাস্তায় লোকজনকে এলোপাতারি আঘাত করতে থাকে। অফিসিয়াল তথ্যমতে প্রায় শতাধিক লোক এতে আহত হয়।
২০০৯ সালের উরামকি দাঙ্গা	১৫/০৭/০৯, উরামকি	বড় রকমের সহিংসতা, ধারাবাহিক এ সহিংসতার মূল লক্ষ্য হান জাতির লোকেরা। ১৯৮জন হান নিহত ও ১৭০০জন আহত।
২০০৮ সালের কাশগড় হামলা	০৪/০৮/০৮, কাশগড়	দু'জন মানুষ একটি ট্রাক চালিয়ে সকালে জগিংরত একদল পুলিশের উপর উঠিয়ে দেয়। গ্রেনেড হামলা ও ছুরি দিয়ে হামলা চালায়। ১৬জন কর্মকর্তা আহত ও ১৬জন নিহত হয়। দু'জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার

		করা হয়।

উপরের তথ্য ছকটি হুবুহু আলজাজিরা থেকে বঙ্গানুবাদ করে দেওয়া। তাই তথ্য ও ভাষাগত দায়ভারও আলজাজিরা কর্তৃপক্ষের। যদিও হামলাগুলো একান্তই তাদের জাতিগত বিষয় কিন্তু চীনা সরকার এগুলোকে উইঘুর মুসলিমদের সাথে জড়িয়ে তাদেরকে নির্যাতন করে যাচ্ছে। আরো একটি স্ববিরোধিতা দেখুন নিচের তালিকায়।

খুনাখুনিতে শীর্ষ ১০টি চীনা প্রদেশ-
হেইলংজিয়াং
জিলিন
গুয়াংডং
লিয়াওনিং
জিনজিয়াং
হেইনান
হেনান
চংকিং
সোয়াংশি
হেবেই

এ তালিকার পাঁচ নম্বরে আছে জিনজিয়াংয়ের নাম অথচ চীনের নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোরতা সবচেয়ে বেশি জিনজিয়াংয়ে। কেন? জিনজিয়াংয়ে মুসলিমরা আছে বলে? কিন্তু আলজাজিরায় প্রকাশিত এ র‍্যাংকিং চীনের সরকারি সূত্র থেকেই নেয়া। এবং এর কোন প্রতিবাদও তারা করেনি। তাহলে আইনশৃংখলাবাহিনীর সর্বোচ্চ নজরদারি, গোয়েন্দাবৃত্তি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুম, হত্যা, কারাকন্দি, নির্যাতন কেন?

আচ্ছা উইঘুরদের মনে এত ক্ষোভ কেন? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। একটু পিছনে ফিরে তাকানো যাক। ১৯৪৯ সালে চীনের গণমুক্তি ফৌজ জিনজিয়াং অধিকার করে। চীনের মতে, তা তৎকালীন শাসক তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রের আহ্বানে শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছিল। কিন্তু অনেকের মতে, ওটা ছিল জোরজবরদস্তি দখল। বিপ্লবোত্তর চীন তার প্রথম পরমাণু পরীক্ষা করে এই জিনজিয়াং প্রদেশেরই লুপ নুর-এ, ১৯৬৪ সালে।

বিপ্লবোত্তর চীন জিনজিয়াং অঞ্চলের শাসনভার উইঘুরদের হাতেই সমর্পণ করার কথা ছিল। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করে চীনা বিপ্লবী কমিউনিস্টরা ক্ষমতা তুলে দেয় জিনজিয়াং প্রোডাকশন এবং কনস্ট্রাকশন কর্পোরেশনের হাতে। এই কর্পোরেশন হলো বিপ্লবপূর্ব চীনা সেনাদের একটি ব্রিগেড, যারা একই সাথে সীমান্ত রক্ষা এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, দুইই করতে পারে। মূলত এটা ছিল পুরনো সেনাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে সমাজের মূল অর্থনৈতিক স্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ। বর্তমানে এই কর্পোরেশন চীনা শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। একই সাথে সে সশস্ত্র রাষ্ট্রীয় বাহিনী, প্রশাসক এবং একটি বড় চীনা কর্পোরেট গোষ্ঠী। এদের এখন দুই প্রধান লক্ষ্য- জিনজিয়াংয়ে বাড়তে থাকা পূর্ব তুর্কিস্তান তথা উইঘুর জাতীয়তাবাদকে আটকানো, হান চীনাদের এনে জিনজিয়াংয়ে বসানো এবং জিনজিয়াং জুড়ে বহুজাতিক ও চীনা কর্পোরেটদের 'উন্নয়ন' নামে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৯৯১ থেকে চীনের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নের নীতিতে এই জিনজিয়াং জুড়ে এখন চলছে তেল এবং গ্যাসের খনি খনন। রাজধানী শহর উরামকি হয়ে উঠেছে পশ্চিম চীনের সবচেয়ে বড়ো শহর। জিনজিয়াংয়ের জাতীয় সম্পদ ২০০৪-এ যা ছিল ২০০৮-এ তা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। উরামকিতেই তৈরি হয়েছে তিনটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল।

আর এসবের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে হান চীনাদের সংখ্যা। কর্পোরেশনের বদান্যতায় হান অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। জিনজিয়াংয়ে তাদের শতাংশ ১৯৪৯-এ ছিল ১০ শতাংশের কম, ২০০০ সালে তা দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। ২০০০ সালের পর থেকে ঘিঞ্জি চীনা শহর থেকে মানুষকে পশ্চিমের উরামকি প্রভৃতি শহরে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়, যা এই অঞ্চলের 'উন্নয়ন'-এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে থাকে। এখন উরামকি শহরে হান চীনারা প্রায় ৮০ শতাংশ। উইঘুর জনসংখ্যা ১৫ শতাংশের মতো। এই ধনী অভিবাসী হান চীনাদের দাপট এবং রাষ্ট্রের ধর্মীয় আচরণের প্রতি বিদ্বেষের কারণে উইঘুর মুসলিমদের আচার, সংস্কৃতি, ভাষা সবই সংকটে। সব মিলিয়ে দীর্ঘদিনের জাতিবিদ্বেষ গত বিশ বছরের কর্পোরেট 'উন্নয়ন'-এর ধাক্কায় এক বিস্ফোরনমুখ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে, যার সামান্য বিস্ফোরণ হলো ২০০৯ সালের ৫ জুলাইয়ের দাঙ্গা।

আলোচনায় তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি

উইঘুরদের নির্যাতন প্রসঙ্গে আলোচনায় তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম।

একনজরে তুর্কিস্তান ইসলমিক পার্টি	
প্রতিষ্ঠা	১৯৮৮
লক্ষ্য	খেলাফতের আদলে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা
আদর্শ	উইঘুর জাতীয়তাবাদ, সুন্নি ইসলাম,
শীর্ষ নেতা	যেয়দিন ইউসুফ. হাসান মাহসুম, আব্দুল হক, আব্দুল শাকুর আল তুর্কিস্তানি, আব্দুল্লাহ মানসুর
প্রধান কার্যালয়	উত্তর ওয়াজিরিস্তান, পাকিস্তান
কার্য সীমানা	চীন (জিনজিয়াং), পাকিস্তান (উত্তর ওয়াজিরিস্তান), আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, সিরিয়া (জিসর আল শুগুর ইদলিব অঞ্চল, লাটাকিয়া অঞ্চল)
সমমনা সংগঠন	আল কায়েদা, হায়াত তাহরির আল শাম (সাবেক আন-নুসরা), ইসলমিক মুভমেন্ট অব উজবেকিস্তান, ইস্ট তুর্কিস্তান এডুকেশন সলিডারিটি এসোসিয়েশন
প্রতিপক্ষ	চীন, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, জর্দান, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কেমেনিস্তান, আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিরিয়ার সরকারি বাহিনী, ফাতিমিয়া গোষ্ঠি, সাইপ্রাস, ইরাকি শিয়া গোষ্ঠি, সিরিয়ার গণতান্ত্রিক দলসমূহ, হিজবুল্লাহ, ইরানি রেভ্যুলুশনারি গার্ড দল
যুদ্ধ-সংঘাত	ব্যারেন শহরে দাঙ্গা, জিনজিয়াং দাঙ্গা, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ

তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি বা টিআইপির আগে নাম ছিল ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলমিক মুভমেন্ট বা ইটিআইএম। দলটি চীনের একটি চরমপন্থি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত। কারণ তারা উইঘুর প্রধান জিনজিয়াংয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ২০০২ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে চীন সংগঠনটিকে ১৯৯৯ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে দুই শতাধিক সন্ত্রাসবাদী ঘটনার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ করে।

২০০১ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলার পর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কিরগিজিস্তান, কাজাখাস্তান, রাশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান সংগঠনটিকে বেআইনি ঘোষণা করে। দলটির সিরিয়া শাখা সিরিয়ায় এখনো যুদ্ধরত রয়েছে। (উইকিপিডিয়া)

ইতিহাস

রাশিয়া বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর প্রধানতম পরাশক্তি ছিল। তখন আমেরিকা অতটা শক্তিশালী হয়নি। চীন তো রাজতান্ত্রিক শাসনের শৃঙ্খল ভাঙার চেষ্টা শুরু করেছে মাত্র। রাশিয়ার জার শাসকরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো। অর্থনীতি, প্রশাসন, স্বশস্ত্রবাহিনী এমনকি ধর্মও। নিয়ন্ত্রণ করলেও ধর্মচর্চাকে তারা নিষেধ করেনি বরং উৎসাহ দিয়েছে। এদিকে ধীরে ধীরে রাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা আন্দোলন শুরু করে। তখন ধার্মিক খ্রিস্টানরা পরে বিপাকে। তারা না পারে জনগণের বিরুদ্ধে যেতে না পারে ধর্মবিদ্বেষী কমিউনিস্টদের পক্ষে যেতে। রাজতান্ত্রিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত কিন্তু ইতিবাচক সমর্থন দেওয়ায় ধর্মগুরুদের একাংশ রাজতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে থাকে। ফলে জনগণ কমিউনিস্টদের ধর্মবিদ্বেষী প্রচারণায় ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তখন অনেক অর্থডক্স খ্রিস্টান ধর্মগুরু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। যারা এভাবে বিভিন্ন দেশে চলে যায় তাদেরকে বলা হয় হোয়াইট ইমিগ্রেস। হোয়াইট ইমিগ্রেসরা চীনের জিনজিয়াংয়ে গিয়ে বেশ পরিচিতি অর্জন করেন। রাশিয়ান সরকার এই হোয়াইট ইমিগ্রেসদের কাজে লাগিয়ে অঞ্চলগুলোতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করত। জিনজিয়াংয়ের মুসলিমদের ওপর রাশান প্রভাব এসময়ে বেশ পাকাপোক্ত ছিল।

চীনের তখন চরম দুরাবস্থা। দেশময় গৃহযুদ্ধ। ১৯১০-১৯২০ সাল এই যুদ্ধের সময়কাল। রাশিয়া এই গৃহযুদ্ধ জিইয়ে রাখতে জিনজিয়াংয়ের ইলি অঞ্চলে পূর্বতুর্কিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে সমর্থন দেয়। কম্যুনিস্টরা চীনে বিপ্লব ঘটায়। এদিকে রাশিয়াও জিনজিয়াংয়ের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে রাশিয়ান পাসপোর্ট বিতরণ করে। তুর্কিস্তান প্রতিষ্ঠাকামীদের যাতে সুবিধা হয়। এরপর কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হলে চীনা সরকার সীমান্ত অঞ্চল ও পুরো জিনজিয়াংয়ে কঠোর হয়। চীন রশিয়াকে সীমান্তে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ করে।

১৯৪০ সালে আব্দুল হামিদ, আব্দুল আজীজ মাখদুম এবং আব্দুল হাকীম মাখদুম তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি প্রতিষ্ঠা করন। ১৯৭৯ সালে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর আব্দুল হাকিম হাসান মাহসুমকে এবং অন্যান্য উইঘুরদেরকে মৌলবাদী ইসলাম পালনের নির্দেশ দেন। ১৯৮৯ সালে জিয়াউদ্দিন ইউসুফ কার্যত পূর্ব তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি গঠন করেন। ১৯৯৭ সালে সংগঠনটিকে নতুনরূপে ঢেলে সাজান হাসান মাহসুম এবং আব্দুল কাদির ইয়াপুকুয়ান।

চীনা সরকার দলটিকে ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলামিক মুভমেন্ট (ETIM), নামে তালিকাভুক্ত করে। দলটি নিজে থেকে এই নাম কখনো ব্যবহার করেনি। ১৯৯৮ সালে মাহসুম দলের হেডকোয়ার্টার কাবুলে তথা তালিবান শাসিত আফগানে গিয়ে আশ্রয় নেন। চীনের দাবি মাহসুম ১৯৯৯ সালে আফগানিস্তানে গিয়ে আল কায়েদা প্রধান ওসামা বিন লাদেন এবং তালেবান প্রধান মোল্লা ওমরের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছেন। যদিও দলটি এ দাবী অস্বীকার করেছে। দলটির অবকাঠামো সংকীর্ণ হয়ে আসে বিশেষ করে ৯/১১ এর ঘটনার পর। আফগানিস্তানে মার্কিন জোটের বিমান হামলার সময় পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায়, ২০০৩ সালে, মাহসুম নিহত হয় বলে দাবী করা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের টেররিজম মনিটর ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইটে ২০১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়।

যাহোক, ETIM বেশকিছু মুজাহিদীন নিয়ে ইরাক যুদ্ধে আবার আত্মপ্রকাশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট দলটিকে কোড সেকশন ১১৮৯ বিধিমতে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। এবং এর সদস্যদের আমেরিকা ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

২০০৬ সালে একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে দলটি। এতে ২০০৮ সালে চীনের বেইজিংএ অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক গেইমসে জঙ্গি হামলা করার আহবান জানানো হয়। বলা হয়ে থাকে যে দলটি পাকিস্তানের তালেবান বা তেহরিকে তালেবান সংগঠনের সাথে জোট গঠন করে। এসময় চীন পাকিস্তানকে দলটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহবান জানায়। নতুন করে সংগঠন শুরু হলে তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি (TIP) নাম ধারণ করে এবং ETIM নামপরিচয় ত্যাগ করে। যদিও চীন দলটিকে ETIM নামেই ডাকে এবং TIP নামে ডাকতে অস্বীকৃতি জানায়। TIP দলটি উজবেকিস্তানের Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) এর অধীনস্ত একটি দল

ছিল। কিন্তু সেখান থেকে বের হয়ে একটি স্বতন্ত্র দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের পত্রিকা 'ইসলামিক তুর্কিস্তান' ম্যাগাজিনে এবং ভয়েস অব ইসলাম মিডিয়ায় আরবি, ইংরেজি, রাশান এবং তুর্কি ভাষায় গ্লোবাল জিহাদী সংগঠন হিসেবে প্রচারণা চালায়। ২০০১ সালের পর উজবেক এবং উইঘুরদের থেকে পাকিস্তানি তালেবানদের হাতে এর নেতৃত্ব চলে আসে। এর মিডিয়া শাখা তাদের পূর্ণ নাম জানিয়ে ভিডিও প্রকাশ করে। তাদের সওতুল ইসলাম বা ভয়েস অব ইসলাম মিডিয়ার বিস্তারিত নাম "Turkistan Islamic Party Voice of Islam Media Center" Uyghur: (تۈركىستانئىسلامپارتىيىسىئىسلامئاۋازىتەشۋىقاتمەركىزى) Türkistan Islam Partiyisi Islam Awazi Teshwiqat Merkizi, Türkistan Islam Partiyisining Islam Awazi Teshwiqat Merkizi. [সূত্র: উইকিপিডিয়া]

আল কায়েদা সংযোগ

আন্তর্জাতিক সংস্থা জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের টেররিজম মনিটর ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইটে ২০১০ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়, '...যদিও টিআইপি বেইজিংএ হামলা ও রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছে তথাপি এ জাতীয় হামলার কোন নজির পাওয়া যায় না।...২০০৯ সালে হাসান মাখদুমের জীবনী নিয়ে প্রচারিত এক ভিডিওতে বলা হয় 'তুর্কিস্তানি ইসলামিক পার্টির নতুন সামরিক নেতা মনোনিত করা হয়েছে ব্রাদার আব্দুল হককে। এর আগে ২০০১ হতে ২০০৩ পর্যন্ত হাসান মাখদুম পার্টির প্রধান ছিলেন। ২০০৯ সালের আগে আব্দুল হককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টর তালিকায় আলকায়েদা, তালেবান বা কোন সংগঠনের সাথে জড়িত বলে খবর পাওয়া যায়নি। তাহলে ২০০১ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি কোথায় ছিলেন? ধারণা করা হয় এসময় তিনি আফগানিস্তানের মুজাহিদ ক্যাম্প আইএমইউ'র প্রশিক্ষণ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। টিআইপির সদস্য আব্দুল হক তুর্কিস্তানি আল কায়েদার নির্বাহী সদস্য পদে ২০০৫ সালে যোগ দেয়। এবং পাকিস্তানের প্রশাসনিক অঞ্চলে টিআইপি সদস্য আব্দুল শাকুর তুর্কিস্তানিকে সামরিক কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আব্দুল হক আলকায়েদার নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তার দায়িত্ব ছিল সামরিক পরিকল্পনা করা এবং তালেবানের বিভিন্ন শাখার সাথে সমন্বয় করা। উইঘুরদের পূর্ব তুর্কিস্তান স্বাধিকার আন্দোলন প্রসঙ্গটি আলকায়েদা প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরির "ইসলামিক স্প্রিং" বা ইসলামী বসন্ত ধারাবাহিক আলোচনার ৯ম পর্বে স্থান পায়। জাওয়াহিরি নিশ্চিত করেন যে ৯/১১ ঘটনার পর আফগানিস্তান যুদ্ধে উইঘুরদের অংশগ্রহণ ছিল। যেমন জারবাকি, বিন লাদেন এবং হাসান মাহসুম সেসময় আফগানের তালিবান শাসিত রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আল কায়েদা সদস্য যেমন আবু ইয়হইয়া আল লিবি এবং মোস্তাফা সেতমেরিয়াম নাসার আফগানিস্তানের অনেক উইঘুরকে মুজাহিদীন ট্রেনিং দেয় বলে ব্যক্তিগতভাবে জানান। আলকায়েদা সংশ্লিষ্ট আল ফাজর মিডিয়া টিআইপি সংক্রান্ত অনেক তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

আফগানিস্তানে কুন্দুজের যুদ্ধে বিদেশি ইসলামি যোদ্ধা যেমন উইঘুর, চেচেন, রোহিঙ্গা, কিরগিজ, তাজিক এবং উজবেক বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তালিবানদের সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়। [সূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

টিআইপি 'তুর্কিস্তান ব্রিগেড' বা তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির সামরিক বাহিনী সিরিয়ায় যুদ্ধ করতে পাঠায়। বিশেষ করে ২০১৫ সালে জিসর আল শুকুর বাহিনীটি ছিল উল্লেখযোগ্য। আল কায়েদা এসব গ্রুপের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং দলগুলোকে চেচেন ককেশাস অঞ্চলভুক্ত দল, উজবেক যোদ্ধাদল এবং তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টিকে একত্রিত করে দেয়।

তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি আরো যেসব হামলায় অংশ নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে-

উত্তরপশ্চিম সিরিয়া আক্রমণ (এপ্রিল-জুন ২০১৫)
আল-ঘাব আক্রমণ (জুলাই-আগস্ট ২০১৫)
আবু আল দুহুর বিমানঘাঁটি আক্রমণ
রাশিয়ান বাহিনী সিরিয়ায় আসার পরের আক্রমণ
উত্তরপশ্চিম সিরিয়া আক্রমণ (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৫)
লাটাকিয়া আক্রমণ (২০১৫-২০১৬)
আলেপ্পো আক্রমণ (অক্টোবর ২০১৫-বর্তমান)
আল ফুয়ান কাফারিয়া অবরোধ (২০১৫)
আলেপ্পো হামলা (এপ্রিল ২০১৬)
আলেপ্পো হামলা (মে ২০১৬)

সিরিয়ার অনেক চার্চ গুঁড়িয়ে দেবার জন্যও টিআইপিকে দায়ী করা হয়। ইদলিব এবং হোমস শহরে ব্যাপক হামলার জন্য উইঘুর যোদ্ধারা পরিচিত। উজবেক ব্রিগেড, জাবহাত আল-নুসরা এবং আইএস (আইএসআইএল) উইঘুর যোদ্ধাদের দলে ভেড়াতে প্রতিযোগিতা করত বলেও খবর রয়েছে। জুসর আল শুগুরে একটি চার্চের ছাদে যুদ্ধশেষে টিআইপির পতাকা উড়াতে দেখা যায়। একটি ভিডিওতে উজবেক ব্রিগেডকে টিআইপির সাথে যৌথভাবে একটি চার্চের চূড়ায় যুদ্ধ শেষে পতাকা উড়াতে দেখা যায়। জাবহাত আল-নুসরার সাথে যৌথভাবে টিআইপিকে একটি সরকার সমর্থিত খ্রিস্টান গ্রামে অভিযান পরিচালনা করতে দেখা যায়। সিরিয়ায় তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টির শিশু যোদ্ধাও রয়েছে। একটি ভিডিওতে দেখা যায় শিশুরা ইসলমি শরিয়াহ রাষ্ট্র চেয়ে স্লোগান দিচ্ছে এবং অস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

তুর্কি সমর্থন

তুর্কি সমর্থন কাজে লাগিয়ে উইঘুররা তুর্কি হয়ে সিরিয়ায় গমন করে। এসময় তুর্কির মানবতাবাদি সংগঠন Uyghur East Turkistan Education and Solidarity Association (ETESA) এর ব্যানারে তারা সিরিয়া যায়। চীনা সমর্থক এক ইমামকে হত্যার ভিডিও তারা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

চীনে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত ইমাম মুস্তফা সিরিয়ায় উইঘুর জিহাদিদের প্রবেশে তুর্কি সুবিধা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করে। তুর্কির এক ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা বেয়াজ মিনারে কিতাপ (সাদা মিনারের বই) তুর্কি ভাষায় একটি বই প্রকাশ করে যেখানে তুর্কিস্তানি মুজাহিদদের প্রশংসা করা হয়েছে। যাতে টিআইপির অনেক যোদ্ধাও রয়েছে। বইটি লিখেছেন আব্দুল্লাহ আল মুহাইসিনি।

তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের কুকেকমিসি, সেফাকয়, জেইতিনবুমু জেলাগুলো উইঘুরদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এখান থেকেই সিরিয়ায় বিভিন্ন মুজাহিদ গ্রুপের সাথে সিরিয়ায় পাড়ি জমায় তারা। তুর্কিভিত্তিক উইঘুর ওয়েবসাইট দো তুর্কিস্তান বুলিটিনে বলা হয় উজবেক ইমাম আব্দুল্লাহ বুখারিকে গুপ্তহত্যার পর বেশকিছু উইঘুরকে জেলে পাঠায় তুরস্ক। ২০১৭ সালের ৩ আগস্ট তুরস্ক অফিসিয়ালি 'ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলমিক মুভমেন্ট'কে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

আজনাদ আল কাওকাজ, জুনদাল আল শাম, কাতিবাত আল তাওহিদ ওয়াল জিহাদ, আহরার আল শাম, তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি, জুনদুল আকসা, জাবহাত আল নুসরা সিরিয়ার ইদলিবকে আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ের মতো অঞ্চলে পরিণত করার পরিকল্পনা করে। টিআইপি যোদ্ধারা লাওস, ফিলিপাইনস এবং থাইল্যান্ড রুট ধরে স্বপরিবারে তুর্কি ও সিরিয়া প্রবেশ করে। [সূত্র: উইকিপিডিয়া]

আদর্শ

আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ বিশ্লেষণ সংস্থা NEFA Foundation ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলমিক মুভমেন্ট নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে। এতে বলা হয় উইঘুর মুসলিমরা পশ্চিম চায়নার অংশ। ইস্ট তুর্কিস্তান ইসলমিক পার্টির প্রধান লক্ষ্য ইস্ট তুর্কিস্তানের স্বাধীনতা।

সন্ত্রাসবাদ অভিজ্ঞ রোহান গুনারাতনে বলেন, ETIM ঘনিষ্ঠভাবে World Uyghur Congress (WUC) এর সাথে জড়িত। ETIM এর অনেক সমর্থক WUCকেও সহযোগিতা করছে। ২০০৯ সালে উরামকিতে হান ও উইঘুরদের মধ্যকার দাঙ্গার পেছনে উস্কানিদাতা হিসেবে চীন WUC কে দায়ী করেছে। [সূত্র: উইকিপিডিয়া]

গুম করা হচ্ছে উইঘুর শিশুদের

"চীনে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে উইঘুর শিশুরা" শিরোনামে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, "চীনের পশ্চিমাঞ্চলের জিনজিয়াং প্রদেশের ১০ লাখ বয়স্ক উইঘুর মুসলিমকে বন্দী শিবিরে আটক রাখার পর চীনা কর্তৃপক্ষ উইঘুর শিশুদের ধরে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত অসংখ্য এতিমখানায় পাঠাচ্ছে। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিশুরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। মুসলিম শিশুদের তাদের পরিবার, ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে দূরে রাখার চীনের সুপরিকল্পিত অপতৎপরতার সর্বশেষ প্রমাণ হিসেবে এসব এতিমখানার কথা প্রকাশ পেলো। উইঘুর মুসলমানেরা আশঙ্কা করছেন, তাদের জাতিগত পরিচিতিকে মুছে ফেলার গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই এক সন্তান গ্রহণ নীতি কার্যকর করতে কমিউনিস্ট চীন সরকার এসব অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

কোরবানির ঈদের সময় (২০১৮) এপির প্রতিনিধি তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বহু উইঘুর পরিবারের সাথে কথা বলেন। এ দিন বড় পরিবারগুলোর পুনর্মিলনী ঘটে। প্রতিটি বাড়ির খাবার টেবিলগুলো জিনজিয়াংয়ের ঐতিহ্যবাহী নানা খাবারে পরিপূর্ণ থাকে। এর মধ্যে থাকে বাড়িতে তৈরি নুডুলস, সদ্য জবাই করা ভেড়ার গোশতের তরকারি এবং নানরুটি। সরকারের বন্দিত্ব এড়াতে যেসব উইঘুর ইস্তাম্বুলে পালিয়ে আসেন তারা যেসব সন্তানকে দেশে রেখে এসেছিলেন সরকার তাদের ধরে নিয়ে গেছে। এভাবে সরকার পরিবারগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

যাদের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাদের অনেকে তাদের পূর্ণ নাম জানাতে রাজি হননি, কারণ এতে জিনজিয়াংয়ের দক্ষিণাঞ্চলের হোতান শহরে এখনো অবস্থান করছেন তাদের এমন স্বজনেরা সরকারে রোষানলে পড়তে ও প্রতিহিংসার শিকার হতে পারেন। ডাক্তার আজিজ এই শহরে নিজস্ব মেডিক্যাল ক্লিনিক পরিচালনা করতেন। ৩৭ বছর বয়স্ক এই সার্জন বলেন, তিনি একটি নতুন কার কিনতে যাচ্ছিলেন এমন সময় স্থানীয় থানা থেকে একটি ফোন আসে। তাতে তাকে অবিলম্বে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে আজিজের প্রতিবেশীদের অর্ধেককেই নয়াদীক্ষা কেন্দ্র বা বন্দী শিবিরে নিয়ে আটক করা হয়েছে। তিনি তাদের মতো বন্দী শিবিরে ধুঁকে ধুঁকে মরার পরিণতি ভোগ করতে চাইলেন না।

ফোনটি বন্ধ করে তিনি সরাসরি বিমানবন্দরে চলে যান। তিনি এ কথা কাউকে, এমনকি তার স্ত্রীকেও জানাননি। কারণ তার সাথে যারাই যোগাযোগ করেছে বলে জানতে পারবে কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকেই আটক করবে। অনেক উইঘুরের মতো সম্প্রতি বছরগুলোতে তিনি চীন থেকে পালিয়ে আসেন। আজিজ ভেবেছিলেন কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এক বছর পার হওয়ার পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, এখনো তিনি অপেক্ষার পথ চেয়ে রয়েছেন। আজিজ বলেন, তার স্ত্রী ও চার শিশু সন্তানের কোনো খোঁজ এখনো পাননি। তার সন্তানদের মধ্যে চার বছরের একটি ছেলে রয়েছে, যার নাম ইব্রাহীম।

হোতানের একজন তরুণ নার্সিং শিক্ষার্থী হিসেবে মেরিপেত ভালো ফল করেন এবং সহজে লাইসেন্স লাভ করেন। বিয়ের আগ পর্যন্ত তিনি একটি বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি করতেন এবং এরপর সন্তানদের মানুষ করার জন্য তার সবকিছু বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। মেরিপেতের লক্ষ্য ছিল তার সন্তানদের 'মানুষের মতো মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলবেন। তিনি যখন তার ছেলেকে নিয়ে স্কুলে যেতেন তখন সেই ফাঁকে তাকে কিভাবে সৎ কাজ করতে ও সৎ জীবনযাপন করতে হবে, কিভাবে পরিবারের ভালো করা যাবে, ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। মেরিপেতের বয়স এখন ২৯ বছর। তিনি বলেন, বাড়িতে তারা সফল মুসলিমদের জীবনী ও তাদের লেখা বইপত্র পড়তেন। মেরিপেত আরো বলেন, 'তাদের সাথে কাটানো আমার প্রতিটি মুহূর্তের কথা স্পষ্ট স্মরণে রয়েছে।'

এবারের কোরবানির ঈদে মেরিপেত তার ছোট ছেলের জন্য একটি ডেনিম জিন্স ডোরা কাটা একটি ভেস্ট এবং সবুজ ও রৌপ্য রঙয়ের একটি বোটাই কেনেন। ঈদ উৎসবকে সামনে রেখেই এ কেনাকাটা করেন তিনি। কিন্তু বড় কষ্টের মধ্যে সান্ত্বনা হলো, মেরিপেতের ছোট ছেলে এক বছর বয়েসী আব্দু ওয়ালিই কেবল তুরস্কে তার কাছে রয়েছে। বড় অন্য চার সন্তানকে তিনি আর কখনো দেখতে পারেননি। তার বিশ্বাস, চীনের রাষ্ট্র পরিচালিত এতিমখানাগুলোতেই তারা আছে। মেরিপেত বলেন, 'আল্লাহ যদি আমাকে একটি বার তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেন, তাহলে তাদের সাথে আমার অনেক কথা বলার আছে। তবে ওদের সাথে আমার সবচেয়ে বড় কথা হবে, 'আমি দুঃখিত'।'

জিনজিয়াংয়ের উত্তরাঞ্চলের কারামে শহরে রেস্তোরাঁর মালিক কুরবানজান নুর মোহাম্মাদ ও গুলজান মাহমুদ। তাদের বড় ছেলের খবর জানার অর্থ হচ্ছে প্রতারণার কাছে নতিস্বীকার করা। কারবানজান ও মাহমুদের পুরো পরিবার তাদের পাঁচ সন্তানসহ ২০১৫ সালে ইস্তাম্বুলে চলে আসেন। কিন্তু ২০১৬ সালের প্রথম দিকে অসুস্থ দাদাকে দেখতে তার বড় ছেলে ১৬ বছর বয়েসী পাকজাত কুরবান জিনজিয়াংগামী একটি ফ্লাইটে ওঠে। পাকজাত পরিবারের জন্য গর্ব ছিল। সে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর ও একজন এথলেট ছিল। সে ক্যালিয়োগ্রাফি ও মুষ্টিযুদ্ধে বেশ পারদর্শী ছিল। নিজ শহরে এই দু'টি বিষয়েই প্রতিযোগিতায় সে সেরা হয়েছিল।

তার বাবা-মা জানান, উরামকি বিমানবন্দরে পৌঁছার পরই পাকজাতকে গ্রেপ্তার করে কর্তৃপক্ষ। ছেলেটি নিখোঁজ হওয়ার দুই মাস পরে এক ব্যক্তি নিজেকে কারামে'র পুলিশ কর্মকর্তা বলে দাবি করে চীনা ম্যাসেজিং অ্যাপে নুর মোহাম্মাদের সাথে যোগাযোগ করেন। গত তিন বছর ধরে তিনি তার ছেলের ছবি ও বর্তমান অবস্থার খবর দিচ্ছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি তুরস্কে অবস্থিত উইঘুরদের ওপর গোয়েন্দাগিরিতে সহযোগিতা করে তাহলে তিনি তাদের ছেলে সম্পর্কে তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখবেন। নুর মোহাম্মাদ বলেন, এই সূত্র এবারের কোরবানি ঈদের আগে একটি ভুতুড়ে বার্তা পাঠায়, 'আমি আপনার ছেলের সাথে সম্প্রতি কথা বলেছি। সে প্রায়ই আমার সাথে সাক্ষাৎ করে তার সুখ-দুঃখের কথা আমাকে জানায়। এখন আমিই একমাত্র যাকে আপনার ছেলে বিশ্বাস করে ও ভালোবাসে। তাই আপনারা আমার সাথে সহযোগিতা করুন।'

আদিল বলেন, তার ছেলে এখন কাশগড়ের একজন ব্যবসায়ী হওয়া সত্ত্বেও সে এখন তার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। ২০১৪ সালে তার ৯ বছরের ছেলেকে আবাসিক স্কুলের তালিকাভুক্ত করা হয়। সে কেবল সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসতে পারত। উইঘুর জেলার শিশুদের জন্য একমাত্র বিকল্প ছিল নতুন নির্মিত সরকারি আবাসিক স্কুল। কোনো বাবা-মা সন্তানকে ওই স্কুলে পাঠাতে না চাইলে আইন ভঙ্গ করার জন্য দায়ী হতেন এবং তা ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

এরপর আদিল ও তার স্ত্রীকে বন্দী শিবিরে পাঠানো হয়। ক্লাস বিরতির সময় একবার মাত্র তাদের ছেলেকে দেখার সুযোগ দেয়া হয়। সে সময় তাকে বেশ নার্ভাস দেখায়। স্কুলের লোহার দণ্ডগুলো চিড়িয়াখানার

কথা মনে করিয়ে দেয়। আদিল ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার স্কুল কেমন চলছে? পরে দারোয়ানের অনুমতি নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। আমি জানতে চাই, 'তুমি কি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করতে পার?' এ সময় ছেলেকে বেশ ভীত ও মন মরা দেখায়। আদিল জানতে চান, তিনি কি তার ছেলের শ্রেণিকক্ষে যেতে পারেন? তার ছেলে তাকে বলে, না তুমি যেও না। বাবা-মা'কে ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয় না।

হাল মুরাত ইদ্রিস ও তার স্ত্রী শেষরাত একত্রে কাটান। তার স্ত্রী গুলজার সেলি ও কোলের শিশুটি নিয়ে ইস্তাম্বুল থেকে সেলির মরণাপন্ন মাকে দেখতে জিনজিয়াং যান। ইদ্রিস তাকে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন কারণ তিনি শুনেছিলেন, বিদেশে যেসব উইঘুর রয়েছে তাদের সেখানে পেলেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু সেলি তার মাকে দেখতে সেখানে যেতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কারণ এরই মধ্যে তার বাবাকে হারিয়েছেন। অসুস্থ মার জন্য সেলি প্রায়ই কান্নাকাটি করতেন। এ ছাড়া তিনি যে গ্রেপ্তারির শিকার হবেন তা ভাবেননি।

সেলি ইদ্রিসকে বলেছেন, আমরা শিশুদের পালন করছি এবং একত্রে কাজ করছি। আমরা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে পারি না।' উরামকি বিমানবন্দর থেকে সেলিকে গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকদিন পর তাকে ছেড়ে দেয়া হলেও পুলিশ সব সময় সব জায়গায় তাকে ফলো করত। সেলি ইদ্রিসকে বলেছিলেন, তিনি ইস্তাম্বুল ফিরে যাচ্ছেন না, কারণ সেখানে যাওয়ার মতো কোনো সময় তার হাতে নেই।

সেলি চীনে ফেরার এক মাস পরে নিখোঁজ হন। পরে ইদ্রিস জানতে পারেন, তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। তার ছেলেকেও তার সাথে জেলে রাখা হয়েছে। ইদ্রিস বলেন, এই নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করলেই আমি অস্থির হয়ে পড়ি। এই পৃথিবীতে ওরা এসব কি করছে? [সূত্রঃ এপি ও ডেইলি স্টার, লেবানন]

উইঘুরদের স্কুলে মাতৃভাষা শিখতে বাধা

কাশগড়ের শুফু শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিংডে। স্কুলে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী উইঘুর হলেও তাদের পড়ানো হয় চীনা ভাষা মান্দারিনে। মান্দারিনের সঙ্গে উইঘুরের নিজস্ব ভাষা তারকিকের ফারাক বিস্তর। কিন্তু

'মাতৃভাষা নয় মান্দারিন প্রয়োজন'- এ বিশ্বাসে বেড়ে উঠছে এখানকার শিশুরা। এ ভাষায় শিক্ষা তাদের আগামীতে কাজের সুযোগ প্রসারিত করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বেইজিং সরকার জিনজিয়াংকে বশে আনার চেষ্টা করছে। তা এড়িয়ে যাচ্ছে অনেকেই। অন্যদিকে মান্দারিন শিক্ষা জিনজিয়াংয়ে স্থিতিশীলতা আনতেও ব্যর্থ।

এ জাতির সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চেতনা মুসলিম ধর্মকে অবলম্বন করে। কাশগড়ের অবস্থান চীনের বেইজিংয়ের চেয়ে কাবুল ও ইসলামাবাদের বেশি কাছে। উইঘুরদের মন তাই চীনের বিপরীতে। এখানের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে নগদ অর্থ ঢালতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না চীন। তবে এতে হানরা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু বড় বিনিয়োগ বিচ্ছিন্নতা ও অসমতা কমাতে কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। অন্যদিকে চীনের অর্থনীতির ক্রমাগত উন্নতির কোনো প্রভাব জিনজিয়াংয়ে নেই। এক কোটি উইঘুর এর বাইরেই থেকে যাচ্ছে। চীন যতই বলুক সাংস্কৃতিক বিরোধ কাটিয়ে অভিন্ন সত্তা স্থাপনই বেইজিংয়ের লক্ষ্য কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে চীন শুধু অর্থনৈতিক হিসেব কষে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে চাইছে।

উইঘুরদের মান্দারিন ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা এরই একটি অংশ। ২০১১ সাল থেকে কর্মকর্তারা এ অঞ্চলে 'দ্বিভাষিক শিক্ষানীতি' হিসেবে এর প্রবর্তন করেছেন। এটি দ্বিভাষিক শিক্ষানীতি হলেও মান্দারিনকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। বেশির ভাগ স্কুলেই শিশুদের চীনা ভাষায় পড়ানো হয়। তবে প্রতি সপ্তাহে উইঘুর ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি আদর্শ তথা কমিউনিস্ট সাহিত্যের ওপর ঘণ্টাকয়েক ক্লাস নিয়ে থাকেন শিক্ষকরা। এ নীতিকে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সন্ত্রাসবাদ দমনের অস্ত্র হিসেবে দেখছেন। কোনো অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা অপরিহার্য বলে গেল সপ্তাহে জানিয়েছেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। শিশুরা লাল টাই বেঁধে মিংডের মতো স্কুলগুলোয় পড়তে আসে। এ যেন কমিউনিস্ট পার্টির একটি তরুণ শাখা!

সরকারের মান্দারিন বলার ক্ষমতা বাড়ানোর কর্মসূচীর ফলে অনেকেই মান্দারিন শিখছেন। উইঘুর জাতির অনেকেই এখন চীনা ভাষা বলতে পারেন অনর্গল, আবার কেউ চলনসই। ফলাফলও আসতে শুরু করেছে। ২০১০ সালে মোট উইঘুরের ৮৩ শতাংশ ছিল কৃষক। এখন এ হার কমতির দিকে। আবার হানস ও উইঘুর শিশুরা একই শ্রেণিকক্ষে বসে

পড়াশুনা করে। এটি সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে ভূমিকা রাখতে পারে বলে চীনাদের বিশ্বাস। কিন্তু তারপরও উইঘুর মুসলিমদের সাংস্কৃতিক গভীরতা চীনা কর্তৃপক্ষকে এখনো ভাবায়।

এ প্রদেশের জন্য নির্মিত পাঠ্যসূচি চীনা ভাষাকে কেন্দ্র করে। চীনের অন্য স্কুলের চেয়ে এখানেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে শিশুদের হাতে তুলে দেয়া হয় 'দেশপ্রেমিক শিক্ষা' নামের পুরস্কার। মিংডে স্কুলের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে নেতা মাও জেডং (মাও সেতুং) ও ডেং সিয়াওপিংয়ের ছবির মাঝে রয়েছে চীনের পতাকা। কাশগড়ের কিন্ডারগার্টেনগুলোর দেয়ালও পরিপূর্ণ বিভিন্ন উক্তি দিয়ে। 'আমি চীনা। আমার দেশের রাজধানী বেইজিং। আমি চীনকে খুব ভালোবাসি। ভালোবাসি মাতৃভূমি, মহাপ্রাচীর। মা, বাবা, শিক্ষক, সহপাঠী সবাইকে ভীষণ ভালোবাসি, তবে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমার মাতৃভূমিকে।' এ উদ্ধৃতিই বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেনের দেয়ালে লেখা।

সংখ্যালঘুদের প্রায় দু-তৃতীয়াংশ শিশু এখন মান্দারিন ভাষায় শিক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু শিক্ষার মান খুব দুর্বল। উইঘুর জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগেরই মান্দারিন শেখানোর মতো পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। আর যারা ভালো পারেন, তারা শিক্ষাদানের পেশায় আগ্রহী হন না। তাদের অনুসন্ধানে থাকে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করা সম্ভব এমন কাজ। দরিদ্র, অস্থিতিশীল অঞ্চলে হানস শিক্ষকদের আকর্ষণ ধরে রাখাও বেশ কঠিন। পরিস্থিতি পরিবর্তনে চীন সরকার অর্থ বিনিয়োগ করেই চলেছে। কিন্তু এখনো জিনজিয়াংয়ে মান্দারিন ও স্থানীয় ভাষায় পারদর্শিতা রয়েছে এমন ৩০ হাজার শিক্ষক প্রয়োজন। উইঘুরভাষী গুটিকয়েক মা-বাবাই তাদের সন্তানদের পড়াশুনায় সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া স্কুলে মান্দারিনে শিক্ষাদান হলেও বাইরে শিশুদের এ ভাষা ব্যবহারের সুযোগ কম। এমনকি মিংডের মতো স্কুলের কর্মীরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিশুদের সঙ্গে স্থানীয় ভাষায়ই কথা বলেন। ফলে ছয় বছর বয়সী উইঘুর শিশুর জন্য চীনা ভাষায় লেখা মৌলিক প্রশ্ন বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্য দক্ষতায়ও এর প্রভাব দেখা যায়। শিশুরা মান্দারিনের মাধ্যমেই ইংরেজি শেখে। তাই আন্তর্জাতিক ভাষাটাও ভালো করে রপ্ত করা হয়ে ওঠে না তাদের।

এ অবস্থায় কিছু প্রাপ্তবয়স্ক উইঘুর নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজা হাসমাত বিষয়টিকে নৃগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য ভালো নয় বলে জানান। জিনজিয়াংয়ের অনেক উইঘুরই মান্দারিন মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

হংকং এর মতো চীনের অন্য অংশে মান্দারিনকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেয়া হয়নি। কিন্তু এসব অঞ্চলে জাতীয় ভাষাটি শেখা হয় মূলত কর্মসংস্থানের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু জিনজিয়াংয়ের অবস্থা খুবই সঙিন। অনেক উইঘুর স্বচ্ছন্দে মান্দারিন বলতে সক্ষম হলেও সামনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। এটি খানিকটা জাতিগত কুসংস্কারের জন্যই বলা যায়। হাসমাত বলেন, অনেক উচ্চশিক্ষিত উইঘুর একই মানের শিক্ষিত হানের তুলনায় কম উপার্জন করেন। তবে বেইজিং সরকার মান্দারিন ভাষা ও চীনা সংস্কৃতিকে জিনজিয়াংয়ে ছড়িয়ে দেয়ার আরো পদক্ষেপ নিলে পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে। এতে সমাধান হবে অনেক সমস্যার। [সূত্রঃ বণিকবার্তা, জুলাই ০৩, ২০১৫]

কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণে বাধ্য করা হয়!

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের দেশটির কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করা হচ্ছে। আর এটি করতে তাদের ওপর নানা রকমের নির্যাতন চালানো হচ্ছে। জিনজিয়াং ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাওয়া মুলমানদের সঙ্গে কথা বলে এমন তথ্য পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ।

সংস্থাটির তথ্যমতে, বেশির ভাগ জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর মুসলমানরা নির্বিচার আটক, প্রতিদিনকার ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে নিষেধাজ্ঞা, 'জোরপূর্বক রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষাদান' এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের শিকার হচ্ছেন। এর আগে আগস্ট মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্যানেল চীন দূরবর্তী পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশে ১০ লাখের বেশি জাতিগত উইঘুরকে গোপনে 'বন্দি শিবিরে' আটকে রেখেছে বলে জানায়। যেখানে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা (আল্লাহর আনুগত্য বাদ দিয়ে চীনা প্রেসিডেন্ট বা দেশটির নেতৃত্বের আনুগত্য গ্রহণে বাধ্যকরণ) দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বেইজিং এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে বলছে, ওই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে তার অংশ হিসেবে কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে আগ্রহী সরকার।

চীনের আরো অভিযোগ, জিনজিয়াং 'ইসলামপন্থী মিলিট্যান্ট' (উইঘুর মুসলিম) ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (স্বাধীনতাকামী) ব্যাপক হুমকি মুখে রয়েছে। তারা সেখানে হামলা ও উত্তেজনা বাড়ানোর ষড়যন্ত্র করছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, উইঘুর ও অন্যান্য মুসলমানদের ক্যাম্পে বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ইসলামিক রীতি-নীতি-সম্ভাষন পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। চীনা মান্দারিন ভাষা শেখা এবং তাদের প্রচার গান (চীনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রচার) গাওয়া বাধ্যমূলক করা হয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনটি বলছে, জিনজিয়াংয়ে বসবাসরতদের মধ্যে যাদের আত্মীয়-স্বজন কাজাখাস্তান, তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়াসহ ২৬টি 'স্পর্শকাতর দেশে' থাকে তাদের নিয়মিত টার্গেট করছে কর্তৃপক্ষ। মাঝে মধ্যেই কোনো বিচার ছাড়াই তাদের মাসের পর মাস আটক রাখা হচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্যাম্প তথা বন্দি শিবিরের কড়া নিয়ম-কানুন যারা মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের খাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমনকি ২৪ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে অথবা নির্জন কক্ষে বন্দি করে রাখা হয়।

এক সময় জিনজিয়াংয়ের বাসিন্দা ছিলেন কিন্তু এখন বিদেশে অবস্থান করছেন এমন ৫৮জনের সঙ্গে কথা বলে ওই প্রতিবেদন তৈরি করেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের গবেষক মায়া ওয়াং। তিনি বলছেন, ক্যাম্পের (বন্দি শিবির) বাইরেও নিরাপত্তা এতটাই জোরদার করা হয়েছে যে, এখন ভেতর ও বাহিরের অবস্থা প্রায় একই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যারা এখন জিনজিয়াংয়ে ঢুকতে পারছেন না এবং তারা ঢুকলে যারা বর্তমানে যারা আছেন তাদের সমস্যা হবে ভেবে ঢুকছেন না- এমন লোকদের সঙ্গে কথা বলেছেন ওয়াং ও তার টিম। নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা বলেছেন, ব্যাপকহারে চেকপয়েন্ট বাড়ানো হয়েছে, আর এসব চেকপয়েন্টে মুখ দেখে চেনার প্রযুক্তি বসানো হয়েছে। এ ছাড়া অত্যাধুনিক পুলিশ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে- যার অংশ হিসেবে প্রত্যেক বাড়িতে রয়েছে কিউআর কোড। যার স্ক্যানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারে- ওই বাড়িতে কারা অবস্থান করছে। ওয়াং বলছেন, ইসলাম ধর্মের রীতি-নীতি পর্যবেক্ষণ, মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া এবং জিনজিয়াংয়ের পশ্চিমাংশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়মিত দলীয় নেতা তথা সরকারি কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের অর্থ দাঁড়ায়, 'ইসলাম মানা কার্যত নিষিদ্ধ'।

শুধু ইসলামি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকলেই হবে না বরং কমিউনিস্ট আদর্শও গ্রহণ করতে হবে। শূকরের মাংস খাওয়া, বাড়িতে বারে গিয়ে মদ পান করা, বাসায় কমিউনিস্ট নেতাদের দাওয়াত করা, কমিউনস্ট দলের সঙ্গীত, স্লোগান মুখস্থ রাখা, কমিউনিস্ট আদর্শের বইপত্র, নেতাদের ছবি

বাড়িতে রাখা, প্রতিবেশিদের সাথে হাসিমুখে আড্ডা দেওয়া, ছেলেদের দাড়ি না রাখা, মেয়েদের সংক্ষিপ্ত পোশাক পড়া ইত্যাদি কাজগুলো করে যেতে হবে। কমপক্ষে তিন মাস এই কাজগুলো করে গেলে ধরে নেওয়া হয় যে সে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করেছে।

ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে শত শত মসজিদ!

দুই কোটির মতো মুসলিম বাস করে চীনে। বিভিন্ন প্রদেশে তাদের জন্য রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার মসজিদ। কিন্তু শত শত বছরের ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলো কি আর আগের মতো আছে বা সর্বশেষ পরিস্থিতি কী? এ প্রশ্নের উত্তর জানা বেশ কঠিন। কারণ চীনের কঠোর মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ নীতি। তবে স্যাটেলাইটের যুগে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা আসলেই কঠিন চীনের একরোখা প্রশাসকরা ভুলে গেছে সম্ভবত। সম্প্রতি (এপ্রিল, ২০১৯) এই স্যাটেলাইট দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে সত্যিই চীনারা মুসলমানদের মসজিদ ভাঙছে। সোয়াস ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের রিডার র‍্যাচেল হ্যারিস দ্য গার্ডিয়ানের সম্পাদকীয়তে জানান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে শন ঝ্যাং নামে একজন সাংবাদিক স্যাটেলাইটের তোলা দু'টি ছবি প্রকাশ করেছে।

ছবিতে দেখা যায়, দক্ষিণের হোতান অঞ্চলের কেরিয়া মসজিদটি যেখানে ছিল, ওই জায়গা এখন একদম ফাঁকা। প্রায় ৮০০ বছর আগে ১২৩৭ সালে অসাধারণ এই স্থাপত্য নিদর্শনটি তৈরি হয়েছিল। ১৯৮০ ও ১৯৯০'র দশকে এটির ব্যাপক সংস্কার করা হয়।

২০১৬ সালে তোলা একটি ছবিতে দেখা যায় এক উৎসবের দিন মসজিদটির সামনের রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ সমবেত হয়েছে। আর ২০১৮ সালে দেখা মসজিদটি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে শুধুই সমান জমি।

র‍্যাচেল আরো বলেন, ২০১৭ সালে কুমুল এলাকায় গিয়ে একজন প্রতিবেদক স্থানীয় কর্মকর্তার কাছে জানতে পারেন, ওই অঞ্চলের ৮০০টি মসজিদের মধ্যে ২০০টি ইতিমধ্যেই ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল এবং ২০১৮ সালের মধ্যে আরও ৫০০ মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল।

আবার গত বছর (আগস্ট, ২০১৮) পশ্চিমাঞ্চলীয় নিংজিয়ায় একটি মসজিদ ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা প্রকাশ করে দেশটির কমিউনিস্ট সরকার।

এরপর বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সেখানকার মুসলিমরা। তারা জানায়, ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করতে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। চীনা সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী দাবি করলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতা বৃদ্ধির অজুহাত দিয়ে মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন করে আসছে। সেইসঙ্গে তাদের ধর্মীয় অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। গত শুক্রবার সরকারি এক নোটিশে জানানো হয়, মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্য অনুকরণে বড় বড় একাধিক মিনার ও গম্বুজ সম্বলিত ওয়েইজ গ্র্যান্ড মসজিদ নির্মাণের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নেয়া হয়নি। এজন্য মসজিদটি উচ্ছেদ করা হবে।

এমন সরকারি নির্দেশনায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশটির মুসলিমরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। সেইসঙ্গে স্থানীয় মুসলিমরাও এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। একটি সূত্রের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানায়, মধ্যপ্রাচ্যের স্থাপত্য অনুকরণে করা গম্বুজ ও মিনার ভেঙে চীনা রীতিতে পুনঃস্থাপন করলেই তবে মসজিদটি রক্ষা পাবে এমন শর্তেও রাজি হয়নি মুসলিমরা।

এঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শহরের মেয়র কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কয়েক হাজার মুসলিম। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, বিক্ষোভ দমন করতে সেখানে আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরাও উপস্থিত ছিল।

মসজিদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন বাধ্যতামূলক!

চীনের সব মসজিদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 'দেশাত্মবোধ জাগাতে' রমজান মাস চলাকালে দেশটির শীর্ষ ইসলামী সংগঠন 'চায়না ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন' এমন নির্দেশনা জারি করেছে বলে বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত সংগঠন 'চায়না ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন' তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক চিঠিতে জানিয়েছে, মসজিদের এমন জায়গায় পতাকা উত্তোলন করতে হবে, যা বহুদূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। সংগঠনটির চিঠিতে বলা হয়েছে, মসজিদের মতো ধর্মীয় স্থানে পতাকা উত্তোলন করা হলে তাতে জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ আরও জোরালোভাবে প্রকাশ পাবে। এতে প্রচার ও প্রসার হবে জাতীয়তাবোধেরও। চিঠিতে

আরও বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টির যে মূল সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সে বিষয়েও মানুষকে বোঝাবে মসজিদগুলো। ইসলামী ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী অনুসারীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করবে, যাতে তা 'মানুষের মনে গেঁথে যায়'।

ফেব্রুয়ারি থেকে চীনে ধর্মীয় আচার বিষয়ক সংশোধিত নির্দেশিকা জারি হয়েছে। এরপরই চায়না ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন তাদের ওয়েবসাইটে এই চিঠি প্রকাশ করলো। চীনে প্রায় দশটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত দুই কোটি মুসলমান রয়েছে। সমালোচকেরা বলছেন, চীনের শাসক দল এভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চাইছে। দেশটির সংবিধান ও আইন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ক্লাস নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মসজিদগুলোকে। এরইমধ্যে এই নির্দেশ মানতে শুরু করেছে দেশটির বেশ কিছু প্রদেশ। শুধু মসজিদ নয়, অনেক স্থানে গির্জা ও বৌদ্ধ মন্দিরেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। [সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ মে ২০১৮]

রোজা রাখতে বাধা দিচ্ছে চীন সরকার!

চীনের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ করেছে সে দেশের কমিউনিস্ট সরকার। শুধু তা-ই নয়, রমজানে হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখা যাবে না বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মী ও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।

বিগত কয়েক বছর ধরেই পার্টিটি সরকারি সকল কর্মকর্তা এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। মূলত উইঘুর মুসলিম অধ্যুষিত চীনের ঝিনজিয়াং প্রদেশে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। দশ মিলিয়ন মুসলিমের এই প্রদেশে সরকারি নির্দেশে সকল রেস্টুরেন্ট এবং হোটেলকে খোলা রাখতেও বলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। ধর্মীয় ইস্যুতে ইতোমধ্যে কয়েক দফায় উইঘুর মুসলিমদের সঙ্গে চীনা রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সংঘাত হয়েছে। যদিও এই সংঘাতের জন্য চীনা সরকার উইঘুর সম্প্রদায়কেই দোষী সাব্যস্ত করে তারা চীনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের চর্চা করছে বলেও জানায়।

উরামাকি শহরের উইঘুর মুখপাত্র আহমদজান তোঠি জানান, গত সোমবার কিছু সরকারি লোকজন ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে এখানে

এসেছিল। তারা এই এক মাসে সকল স্কুলের শিক্ষকদের মসজিদে না যাবার জন্য কড়াকড়ি নির্দেশ দিয়ে গিয়েছে।' রমজানের সময় যাতে শিক্ষার্থীরা স্কুলে যায় সেজন্য উত্তরাঞ্চলীয় শহর আটিলার প্রশাসন স্থানীয় শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছেন। স্থানীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ধর্মীয় ওয়েবসাইট থেকে এই তথ্য জানা যায়।

উল্লেখ্য, চীনের মুসলিম অধ্যুষিত সিনচিয়াং প্রদেশে অনেক বছর থেকে রোযা ও নামাজ নিষিদ্ধ। ওই প্রদেশে প্রায় ১ কোটি মুসলমানের বাস। এবারও সিনচিয়াং প্রাদেশিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের ওয়েবসাইটে নোটিশ দিয়েছে যে, রমজান মাসে রোযা রাখা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ (নামাজ) চলবে না। খাদ্য ও পানীয় পণ্যের দোকানপাট অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। সিনচিয়াংয়ের আলতাই শহরের কর্মকর্তারা বলেছেন, কেউ রোযা রাখছে কিনা তা দেখতে তারা ঘরে ঘরে যোগাযোগ বাড়াবেন। [সূত্রঃ কালের কণ্ঠ অনলাইন, ৭ জুন, ২০১৬]

জিনজিয়াংয়ে হালাল পণ্য বিরোধী অভিযান

মুসলিম অধ্যুষিত জিনজিয়াং প্রদেশে হালাল খাদ্য ও পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান শুরু করেছে চীন। তবে দেশটির দাবি, তাদের এই অভিযান ধর্মীয় উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে। গত সোমবার প্রদেশটির রাজধানী উরামকিতে এ অভিযান শুরু করেছে চীন। ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা হালালপন্থী প্রবণতা নিঃশেষ করার শপথ নিয়েছেন। এর আগেও সেখানে বসবাসকারী মুসলিমদের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে কমিউনিস্ট সরকার। [সূত্রঃ এএফপি]

খবরে বলা হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জিনজিয়াংয়ে দফায় দফায় অভিযান চালিয়েছে বেইজিং। কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে এসব অভিযান চালিয়েছে। রিএডুকেশন ক্যাম্পে ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে আটক রাখার খবরে জাতিসংঘের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কিছুদিন হলো। এবার জিনজিয়াংয়ে নজিরবিহীনভাবে হালাল বিরোধী অভিযান শুরু করলো কমিউনিস্ট সরকার। ইসলাম ধর্মের রীতি অনুসারে যেসব পণ্য, খাদ্য বা পানীয় ব্যবহার বা ভক্ষণ বৈধ সেগুলোই হালাল বলে পরিচিত। এটা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু গত সোমবার উরামকির কমিউনিস্ট নেতারা তাদের অনুসারীদের হালাল বিরোধী যুদ্ধে নামার শপথ পড়িয়েছেন। উরামকির দাপ্তরিক 'উইচ্যাট' অ্যাকাউন্টে এ সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে ধর্ম বর্জনের ডাক দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের হালাল বিরোধী যুদ্ধে শামিল হওয়ার শপথ নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া, হোটেলে হালাল খাদ্যের বিশেষ ব্যবস্থা রাখার প্রবণতা বাদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে সমর্থন দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গ্লোবাল টাইমস ট্যাবলয়েডের খবরে বলা হয়েছে, হালালপন্থী প্রবণতার কারণে ধর্মীয় উগ্রপন্থার উদ্ভব ঘটছে।

দাড়ি ও বোরকার ওপর বিধিনিষেধ

চীনের মুসলমান অধ্যুষিত জিনজিয়াং এলাকার কারামা শহরে ইসলামী পোশাক ও দাড়ি রাখার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া (২০১৪) এ তথ্য জানিয়েছে।

পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং প্রদেশে পুরুষদের 'অস্বাভাবিক' লম্বা দাড়ি রাখা ও নারীদের বোরকা পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে চীন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে ইসলামি চরমপন্থা ঠেকাতে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে দেশটির সরকারের দাবি। প্রদেশের আইনপ্রণেতারা নতুন এ নিষেধাজ্ঞায় সম্মতি দিয়েছেন এবং তা প্রদেশটির সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। চীনের প্রত্যন্ত এ প্রদেশে সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিমদের বাস। এ সম্প্রদায়ের অন্তত ১ কোটি মানুষ আছে এখানে। তারা দীর্ঘদিন থেকে চীনা সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ করে আসছে। তাই নতুন করে এ নিষেধাজ্ঞা জারির সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। তাদের মতে, এ নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় মুসলিমদের ওপর বৈষম্যের মাত্রা বাড়াবে।

উপরোক্ত দু'টি বিষয় ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি বিষয় যুক্ত রয়েছে নিষেধাজ্ঞার তালিকায়। বলা হয়েছে, স্থানীয়রা রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল দেখতে অস্বীকৃতি জানাতে পারবেন না। নিষেধাজ্ঞা অনুযায়ী, স্থানীয় উইঘুর সম্প্রদায়ের শিশুরা সরকারি স্কুলে পড়তে পারবে না। এমনকি স্থানীয়দের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সরকারি নীতি মেনে চলতে হবে। বিয়ের ক্ষেত্রে আইনি নিবন্ধন বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হবে। শুধু ধর্মীয় রীতি মেনে করলে, তা বৈধ হবে না। মুখমণ্ডল পুরোটা ঢেকে বোরকা কিংবা নেকাব পরিধান করা যাবে না।

সরকারি এসব নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে চীন উইঘুর সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈষম্য করছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তবে বেইজিং এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এর আগেও প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় একই রকমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। তবে পুরো প্রদেশজুড়ে এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘটনা এবারই প্রথম। [সূত্রঃ বিবিসি ও আল জাজিরা]

দাড়ি বড় রাখায় ৬ বছরের জেল

২০১৫ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে এ খবরটি মিডিয়ায় আসে। খবরে বলা হয় উইঘুর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখায় চীনের একটি আদালত তাকে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই ব্যক্তির স্ত্রীকেও দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্য।

চীনে দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই জেল-জরিমানা। দেশটির প্রশাসনের বক্তব্য- ওই ব্যক্তির লম্বা দাড়ি অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে তাই এই শাস্তি বিধান।

২০১০ সাল থেকেই মূলত ওই উইঘুর ব্যক্তি দাড়ি রেখে আসছেন। এবং তার স্ত্রী বোরকা পরিধান করে আসছে। চায়না ইয়ুথ ডেইলি সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই ওই ব্যক্তি লুকিয়ে দাড়ি লম্বা করেছিল এবং তার স্ত্রী বিষয়টি জানার পরেও কর্তৃপক্ষকে জানায়নি এবং উল্টো নিজে বোরকা পরিধান করেছে, তাই আদালত তাদের এই শাস্তি বিধান দেয়।

গত বেশ কয়েক বছর ধরে জিনজিয়াংয়ের কর্তৃপক্ষ দাড়ি লম্বা না করার জন্য প্রচারণা চালিয়ে আসছিল। দাড়ি বড় রাখাকে চরমপন্থা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে জিনজিয়াংয়ে। শুধু তাই নয় 'প্রজেক্ট বিউটি' শিরোনামে একটি প্রকল্পও চালানো হচ্ছে দাড়ির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানোর জন্য এবং বোরকা নারীদের সৌন্দর্য ঢেকে রাখে সেদিকেও প্রচারণা চালানো হয়।

গণপরিবহণে ইসলামি পোশাক নিষিদ্ধ

পোশাক কি কোনো অপরাধ করতে পারে? পোশাকের সাথেও কি কোনো শত্রুতা থাকতে পারে? বিবেকবান মানুষ মাত্রই বলবে- না, পোশাক কোন অপরাধ করতে পারে না বরং পোশাক পড়া মানুষটিই অপরাধ করে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবার মুসলমানদের পোশাক নিয়েও আপত্তি তোলে চীন। মুসলিমপ্রধান জিনজিয়াং শহরে মুসলিম নারীদের বোরকা, হিজাব ও ঢোলা জামা পড়া নিষিদ্ধ করে তারা। মুসলমানদের সাথে যুগযুগান্তের শত্রুতা যেন তাদের। শত্রুকে বাগে পেয়ে উশুল তোলছে। অথচ খোদ চীনা মিডিয়ার বক্তব্য হলো জিনয়িানে উইঘুর মুসলিমরা শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছে এবং উইঘুররা উগ্রপন্থি নয় বরং পৃথিবীর অন্যতম শান্তশিষ্ট, ভদ্র জাতি।

আসলে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চীনারা মুসলিম জাতি ও তাদের বিপ্লবী আদর্শ ইসলামকে প্রতিদ্বন্দী ভাবতে শুরু করে। মুসলিমদের আজ যত করুণ দশাই হোক ইসলাম যে একটি অবিসংবাদিত, অপারেজয় আদর্শ, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা তা আমরা মুসলমানরা না বুঝলেও আমাদের বিপরীত আদর্শের লোকেরা ঠিকই বুঝে। তারা ঠিকই জানে আজকের মুসলিমরা আহত কিংবা ঘুমন্ত বাঘ যাদের সংজ্ঞা ফিরলে

হিসেব পাল্টে যাবে। রামরাজত্ব, মগের মুল্লুক, পাওয়ার পলিটিক্স, ডিভাইড এন্ড রুলের পাশা খেলা আর চলবে না। কারণ ইতোপূর্বে তারা প্রায় ৮০০ বছর বিশ্বকে শাসন করে গেছে। সুতরাং আহত বাঘকে নিঃশেষ করে দেওয়ার এখনই সময়। এই ভেবেই সম্ভবত দুনিয়ার তাবৎ ইসলামের বিপরীত আদর্শবাহীরা ইসলাম ও মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালের আগস্টে গণপরিবহনে ইসলামী পোশাক পড়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে স্থানীয় প্রশাসন।

হিজাব, নেকাব, বোরকা অথবা চাঁদ-তারা খচিত ইসলাম ধর্মের প্রতীক সম্বলিত পোশাক পরে গণপরিবহনে যাতায়াতে কারামা শহর কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ২০ আগস্ট থেকে এ আদেশ কার্যকর হয়। যারা এটি মানবে না তাদের আইনের আওতায় আনা হবে। এদিকে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এ কারণে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করায় উত্তেজনা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন।

কারামা শহর কর্তৃপক্ষের আরোপ করা এই নিষেধাজ্ঞা বৈষম্যমূলক ও মুসলমান উইঘুর সম্প্রদায় ও চীন সরকারের মধ্যে বিরোধ বাড়াবে বলে মন্তব্য করেছেন ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের (ডব্লিউইউসি) মুখপাত্র দিলসাত রসিদ। এর আগে গত মাসে রমজান মাস উপলক্ষে মুসলমান শিক্ষার্থী ও সরকারি কর্মকর্তাদের রোজা রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল চীন। [সূত্রঃ এএফপি]

উইঘুরদের বিয়ে সমস্যা

জিনজিয়াং প্রদেশে সরকারের তথাকথিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর চাকরি প্রত্যাশী তরুণ-তরুণীদের অনেকটাই বাধ্যতামূলকভাবে উপকূলীয় প্রদেশগুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে। রাজধানী উরামকিসহ প্রদেশের অনেক এলাকার উইঘুরদের অভিযোগ সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবিবাহিত উইঘুর মেয়েদের নাম তালিকাভুক্ত করে তাদের দূরবর্তী প্রদেশের কারখানায় পাঠাতে অনেক সময় বাধ্য করে থাকে। কোনো অভিভাবক এতে রাজি না হলে তাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়। এ ধরনের জরিমানার পরিমাণ হয়ে থাকে ওই

পরিবারের প্রায় ছয় মাসের আয়ের সমান। ফলে জরিমানা দেয়ার ভয়ে উইঘুর অভিভাবকরা তাদের অবিবাহিত মেয়েদের চাকরির জন্য শত শত মাইল দূরের কারখানায় পাঠাতে বাধ্য হন। পরে এসব মেয়েকে কেউ বিয়ে করতে চায় না।

তাহির নামে ২৫ বছরের এক উইঘুর যুবক বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজছে। কিন্তু হান জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দূরবর্তী কোনো প্রদেশে চাকরি করে আসা কোনো উইঘুর মেয়েকে বিয়ে করতে তাহির রাজি নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে এ ধরনের কোনো মেয়েকে আমি কখনোই বিয়ে করব না। কারণ তাদের কুমারিত্ব বা সতীত্ব নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। ওই সব কারখানার হান কর্মচারী ও কর্মকর্তারা উইঘুর মেয়েদের সবসময়ই অশ্লীল কথাবার্তা বলে এবং গালিগালাজ করে থাকে। এ ছাড়া শ্লীলতাহানির ভয় তো আছেই। এসব দূরে গিয়ে চাকরি করে আসা উইঘুর মেয়েদের বিয়ে নিয়ে একটি সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করছে চীন সরকার। অনেক উইঘুর বিশ্লেষক ও গবেষকের মতে, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবেই উইঘুর সমাজে এরকম একটি সমস্যা তৈরি করছে।

জোর করে চীনাদের সাথে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে উইঘুর নারীদের

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ হতে ধারণকৃত একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে, যার ক্যাপশনে চীনা পুরুষের সাথে জোর করে মুসলিম উইঘুর নারীকে চীনা কর্তৃপক্ষের বিবাহ প্রদানের কথা বলা হয়। ফেসবুক ভিত্তিক উইঘুর স্বার্থসংশ্লিষ্ট গ্রুপ "টক টু ইস্ট তুর্কিস্তান"-এ সেই বিয়ের ভিডিওচিত্রটি প্রচারিত হয়। গ্রুপটির মতে, জিনজিয়াংয়ে উইঘুরদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র ধ্বংস এবং উইঘুর জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার অংশ হিসেবেই চীনা কর্তৃপক্ষ এ ধরণের কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানের একজন আয়োজক চীনা পাত্রকে জিজ্ঞেস করছেন কতদিন যাবৎ তিনি পাত্রীকে চেনেন, তখন তিনি জবাব দেন তিনি মাত্র দুই মাস যাবৎ পাত্রীর সাথে পরিচিত।

অন্যদিকে উইঘুর পাত্রীকে দেখা যায়, বিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে তিনি যেন বিষণ্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত। তার বিবাহ অনুষ্ঠানে তাকে যেন কেউ অপমান করেছে। ভিডিওটি সম্পর্কে এর আপলোডকারী

জানান, চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর বিরোধী বিভিন্ন চীনা অপতৎপরতার অংশ হিসেবে উইঘুর নারীদের জোর করে চীনা পুরুষের সাথে বিবাহ করানোর এটি একটি উদাহরণ মাত্র।

ভিডিওটির ক্যাপশনে বলা হয়, "উইঘুর পুরুষদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটকে রেখে চীন উইঘুর নারীদের বাধ্য করছে চীনা পুরুষদের বিবাহ করতে। এত প্রকাশ্যে একটি গণহত্যা সংগঠিত হচ্ছে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এমনকি অন্যান্য তুর্কি ও মুসলিম দেশগুলো তাদের উইঘুর ভাইবোনদের কান্নাকে অব্যাহতভাবে উপেক্ষা করে যাচ্ছে।"

ফেসবুক, টুইটারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বিভিন্ন প্লাটফর্মে এই ভিডিওটি ভাইরাল হয়ে পড়েছে এবং ভিডিওটির দর্শকরা এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এর পূর্বে অপর একটি পোস্টে ১৯৪৯ সালে চীনা বিপ্লবের পর থেকে জিনজিয়াংয়ে উইঘুরদের দমনের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়াসমূহের থেকে আটটি কর্মসূচী তুলে ধরা হয়। [সূত্রঃ পরিবর্তন ডট কম, জুলাই ২৩, ২০১৮]

'রিএডুকেশন সেন্টার' বন্দিশালার নতুন নাম

'রিএডুকেশন' মানে পুনরায় শিক্ষা। কিন্তু চীনের এই 'রিএডুকেশন সেন্টার' মানে উইঘুর মুসলিমদের জন্য নির্মিত শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষাকেন্দ্র নাম হলেও সেগুলো আসলে কারাগার। সেসব কারাগারে প্রায় ১০-৩০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে আটকে রাখা হয়েছে শিক্ষা দেবার নাম করে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, এএফপি, আলজাজিরা, বিবিসি, রয়টার্সসহ আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় রিএডুকেশন সেন্টারগুলোর যে চিত্র দেখা যায় তাতে এটা স্পষ্ট যে সেগুলো কারাগার ছাড়া আর কিছুই নয়। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী আর দেয়ালঘেরা সীমানার মধ্যে বিশাল বিশাল দালান। সেখানে বিভিন্ন স্তর বিন্যাস করে রাখা হয়েছে উইঘুরদের। অনুগতদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থাপনা। পরিবার নিয়ে থাকার সুবিধা। আর বিপরীতদের জন্য নির্যাতন, শাস্তি।

২০১৪ সালে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল জিনজিয়াং বা শিনচিয়ানে এসব সেন্টার চালু হয়। অত্যন্ত কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেন্টারগুলো। কোনো আইনি বা বিচারিক প্রক্রিয়া ছাড়াই প্রায় ১০ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিমকে এখানে আটক করে রাখা হয়েছে। প্র্যাক্টিসিং মুসলিম, বিদেশে সন্তান পড়াশুনা বা যাতায়াত-যোগাযোগ রয়েছে এমন পরিবারগুলোকেই

টার্গেট করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার সন্দেহ থেকে তাদের আটক করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী চেন কোয়াংগুই এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন ২০১৬ সালে। শুধু উইঘুর নয় কাজাখ, কিরগিজ, হুই এবং অন্যান্য নৃগোষ্ঠী, তুর্কি মুসলিম এবং খ্রিস্টানদেরকেও সেখানে আটক করে রাখা হয়। কিছু বিদেশিদেরও সেখানে বন্দি করা হয়েছে যেমন কাজাখস্তানের নাগরিক।

তাদের খাওয়া, পড়া, ঘুম সবকিছু নিয়ন্ত্রিত। প্রতিদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতোই ক্লাস হয়। বিভিন্ন বিষয়ে। তবে মান্দারিন ভাষা শিক্ষা এবং দেশপ্রেম ও জাতীয়াতাবাদের নামে ইসলামি আদর্শ ছেড়ে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। কোন ধর্মীয় বইপুস্তক সঙ্গে রাখাও নিষেধ। তাদের কথামতো কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় বিভিন্নক্ষেত্রে। আর তাদের কথার বিপরীত বা ইসলাম ত্যাগ করে কমিউনিস্ট আদর্শ গ্রহণে অনিচ্ছুকদের জন্য পদে পদে লাঞ্ছনা, শাস্তি রয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক মুসলিম পরিবারই তাদের কম্যুনিস্ট আদর্শ গ্রহণ করে ফেলেছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের উইঘুররা।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন জার্নালে এই রিএডুকেশন ক্যাম্পগুলোকে 'সাংস্কৃতিক গণহত্যা' কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই ২য় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের সাথেই এর তুলনা চলে।

চেন কোয়াংগু এর আগে

২০০৯ সালের উরামকি দাঙ্গার সময় জিনজিয়াংয়ে পার্টি সেক্রেটারি ছিলেন ওয়াং লেকুয়ান। ওয়াং জিনজিয়াংকে আধুনিকায়নের বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নেং। শিল্পায়ন, বাণিজ্য উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্শ্ববর্তী দেশ কাজখাস্তানের সাথে পূর্ব জিনজিয়াংয়ের খনিজ পদার্থের পাইপলাইন নির্মাণ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে ওয়াং স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধর্মকে দমন করতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উইঘুর ভাষার বদলে মান্দারিন ভাষা প্রচলনের কর্মসূচীও হাতে নেয়। সরকারি চাকরিতে স্থানীয়দের নিয়োগ বন্ধকরণ, পুরুষদের দাড়ি আর নারীদের স্কার্ফ নিষিদ্ধকরণ, কর্মরত অবস্থায় রোজা রাখা নিষিদ্ধকরণ এসব সিদ্ধান্তও তার নেয়া।

২০১০ সালের এপ্রিলে উরামকি দাঙ্গার পর কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান হিসেবে ওয়াং লিকুয়ানের স্থানে আসেন ঝ্যাং চুনঝিয়ান। ঝ্যাং ক্ষমতায়

এসে ওয়াংএর দমননীতি অব্যাহত রাখেন। ২০১১ সালে ঝ্যাং "জিনজিয়াংয়ের উন্নয়নে আধুনিক সংস্কৃতি (উইঘুরদের সংস্কৃতি বাদ দিয়ে) নীতি" প্রস্তাব করে। ২০১২ সালে তার সেই কথিত আধুনিক সংস্কৃতি নীতি বাস্তবায়ন শুরু হয়। প্রথমেই সে যে শব্দ উচ্চারণ করে তা হলো '(ধর্ম পালনে) উগ্রতারোধকরণ' এবং ২০১৪ সালে এসে ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয়। তার ভাষায় 'বন্য ইমামদের' এবং চরমপন্থিদের। এসময় 'সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জনগণের যুদ্ধ' ঘোষণা দেয় এবং স্থানীয় সরকার নতুন করে আরো বিধিনিষেধ আরোপ করে। অস্বাভাবিক বড় দাড়ি, প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নারীদের নেকাব, হিজাব পড়া, মুহাম্মাদ বা ফাতিমা শব্দে মুসলিম নাম রাখাকেও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার অংশে পরিণত করে। ঝ্যাং এর সময়কালে কমিউনিস্ট পার্টি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রচারণা শুরু করে। অসংখ্য লোককে গ্রেপ্তার, রিমান্ড, আটক, জিজ্ঞাসাবাদ এবং নির্যাতন করা হয়।

২০১৬ সালে তিব্বতের কুখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা চেন কুয়াংগু জিনজিয়াংয়ের প্রধান হয়ে আসে। এই চেন তিব্বতের সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের কারণে নির্বাসিত তিব্বত সরকার কর্তৃক সাংস্কৃতিক গণহত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত। বিশাল সংখ্যক হানদের নিয়ে তিব্বতে সেটেল করে তিব্বতের জীবনধারা বদলে দেওয়া হয়। যাকে বলা হয় সিনিসাইজেশন। এই সিনিসাইজেশন পদ্ধতি পরবর্তীতে জিনজিয়াংয়েও কার্যকর করা হয়।

চেন কোয়াংগু ও জিনজিয়াং পুলিশি রাষ্ট্র

চেনের আগমনের পর পর জিনজিয়াংয়ে ৯০ হাজার পুলিশ নিয়োগ দেয়া হয় ২০১৬-১৭ সালে। এই দুই বছরে যা নিয়োগ দেয়া হয় তা গত সাত বছরের যোগফলেরও বেশি। এছাড়া সাত হাজার তিনশতটি ভারী চেক পয়েন্ট স্থাপন করে। প্রদেশটি ইতোমধ্যে বিশ্বের অন্যতম পুলিশি রাষ্ট্রের তকমা পেয়েছে। স্থানীয় গণমাধ্যমে এসব ক্যাম্পগুলোকে "সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" এবং "শিক্ষা ও রূপান্তর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে তুলে ধরা হয়। এ ক্যাম্পগুলোর কিছু আগেকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই স্থাপন করা হয়েছে। আবার নতুন অনেক ভবনও রিএডুকেশন ক্যাম্পের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭ সালে জিনজিয়াংয়ে গ্রেপ্তার সংখ্যা সমগ্র চীনের ২১% যেখানে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১.৫%। আর গ্রেপ্তার হওয়া সংখ্যা গতবছরের তুলনায় সাতগুণ।

ক্যাম্পগুলোর বৈশিষ্ট্য

কনসেন্ট্রশন ক্যাম্পগুলো পরিচালিত হয় গোপনে। শহর এলাকার ক্যাম্পগুলোকে ভোকেশনাল স্কুল, কমিউনিস্ট পার্টি স্কুল, অর্ডিনারি স্কুল অথবা অন্য কোন সরকারি অফিসের নামে নামকরণ করা হয়েছে। উপশহর বা গ্রাম এলাকার ক্যাম্পগুলো রিএডুকেশন ক্যাম্প নামেই অধিকাংশ। ক্যাম্পগুলো স্বশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পাহারা দেওয়া হয়। জেলখানার গেইটের মতো ছোট গেইট দিয়ে লোকজন যাতায়াত করে। চারপাশ দেয়াল ঘেরা। ক্যাম্পগুলোতে নিরাপত্তা বেষ্টনী, ওয়াচ টাওয়ার, সার্ভেলান্স সিস্টেম, পাহারাদার কক্ষ, স্বশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিশেষ কক্ষ ইত্যাদি রয়েছে। স্যাটেলাইট থেকে এসব ক্যাম্পের অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়। এর মতে ২০১৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ইতালী থেকে প্রকাশিত চীনের মানবাধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন Bitter Winter এর তিন পর্বের ভিডিও সিরিজে ওয়েইনিং বা ঘুলজা এলাকায় দুটি ক্যাম্প দেখা যায়। ক্যাম্পগুলো জেলখানার মতো, স্কুলের মতো নয়। আমেরিকার অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা Business Insider এর মতে সিরিজের ২য় ভিডিওটিতে ভবনের যে নকশা ও ভেতরকার অবস্থান দেখা যাচ্ছিল তা এর আগে সেখানে আটক থাকা একজন বন্দির বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়।

ক্যাম্পগুলোর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কঠিন। ২০১৭ সালের ১৫ মে জেমসটাউন ফাউন্ডেশনের এক গবেষণায় বলা হয়েছে ক্যাম্প সংখ্যা ৭৩টি। ২০১৮ সালের ১৪ মে এশিয়ার দেশগুলোর মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা গণমাধ্যম Radio Free Asia (RFA) রিপোর্ট করে কাশগড় শহরেই অন্তত ৮টি ক্যাম্প রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ান স্ট্রাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউটস এর শাখা International Cyber Policy Centre (ICPC) ২৮টি ক্যাম্প চিহ্নিত করতে পেরেছে। তাদের গুগল এক্সেল ডাটাবেসে গিয়ে দেখা যায় ২৮টি ক্যাম্পে প্রায় ১৯৭টি ভবন রয়েছে। ভবনগুলোর গড় আয়তন আট হাজার স্কয়ার ফিট। ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের তথ্য ঘেঁটে দেখা যায় এসব ভবনের সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। এবং অনেক ভবন এখনো নির্মানাধীন রয়েছে (২০১৯, এপ্রিল)।

বন্দিদের অবস্থা

প্রায় প্রতিটি উইঘুর পরিবারের কমপক্ষে একজন করে রিএডুকেশন ক্যাম্পে আটক রয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারীতে বেশকিছু মিডিয়া রিপোর্ট করে

ঐতিহাসিক কাশগড় শহরের ক্যাম্পগুলোতেই প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার উইঘুর মুসলিম আটক রয়েছে। আবার কোন কোন মিডিয়ার তথ্যমতে অন্তত ১০ ভাগ উইঘুর এসব ক্যাম্পে আটক রয়েছে। মোট উইঘুর জনসংখ্যা ৯০ লাখ-১ কোটি বিশ লাখ।

বিশিষ্ট উইঘুর রাজনীতিবিদ রাবেয়া কাদিরের অন্তত ত্রিশজন আত্মীয় সেসব ক্যাম্পে আটক রয়েছে। তার ভাইবোন, সন্তান-সন্তুতি, নাতি-নাতনি এবং তাদের আত্মীয়। আর এটাও অনিশ্চিত কখন তাদের ছাড়া হবে। রেডিও ফ্রি এশিয়ার ৬ সাংবাদিকের পুরো পরিবারকে গ্রেপ্তার করে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসব সাংবাদিক বছরের পর বছর ধরে দেশের বাইরে নির্বাসিত জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মুক্তির ব্যাপারটি পুরোপুরি ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ সেখানে মুক্তির আইনি কোনো প্রক্রিয়া নেই।

২০১৮ সালের ১৩ জুলাই তারিখে সেরগুল সেয়াতবে নামের কজন কাজাখ জাতিগোষ্ঠীর লোক চীনের সরকারি কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। তো তাকে গ্রেফতার করে সেদিন আদালতে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি বিনা অনুমতিতে চীনা-কাজখস্তান বর্ডার পার হয়েছেন। তিনি মূলত রিএডুকেশন ক্যাম্পে থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরে তাকে কাজাখস্তানের আদালতে হাজির করা হলে তিনি বলেন তাকে যেন চীনে ফিরিয়ে দেয়া না হয়, হলে তিনি মৃত্যুর আশংকা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কাজাখাস্তানের আদালত তার আবেদন নামঞ্জুর করে চীনে ফেরত যেতে বলেন। তিনি রিএডুকেশন ক্যাম্পে তিনি প্রায় আড়াই হাজার কাজাখস্তান নাগরিক দেখে এসেছেন। কিন্তু কাজাখস্তানের আদালত তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা দেয়নি।

Radio Free Asia এর বন্দি তথ্য

রেডিও ফ্রি এশিয়া বিভিন্ন সময়ে জিনজিয়াংয়ের স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কথা বলে বন্দিদের ব্যাপারে নিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ করে। তাদের সে তথ্যের কিছু অংশ..

২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বুলাকশু শহরের এক কর্মকর্তাকে ফোন দিয়ে জানা যায় সেখানে ২৫১৪জন বন্দি ছিল তন্মধ্যে ৮০৬জনকে ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে।

২১ জুন ২০১৮ তারিখে তুয়েত শহরের কারাকাউক্স কাউন্টিতে এক কর্মকর্তাকে ফোন দিয়ে জানা যায় সেখানে ১৭৩১জন বন্দি ছিল তন্মধ্যে ১৭২১জনকে রিএডুকেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে।

২ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে হানকিতাম শহরের কুগা কাউন্টিতে প্রশাসনিক অফিসে ফোন দিলে সেখানকার পুলিশ বলে, "আমরা প্রায় ৫ হাজার লোককে রিএডুকেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছি এদের একজনকেও ছাড়া হয়নি।'

১৭ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে তকশু কাউন্টিতে প্রশাসনিক অফিসে ফোন দিলে সেখানকার পুলিশ বলে, "আমরা প্রায় ২২ হাজার লোককে রিএডুকেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছি।'

২১ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে অনশু কাউন্টিতে প্রশাসনিক অফিসে ফোন দিলে সেখানকার পুলিশ বলে, "আমাদের এখানে ৪টি রিএডুকেশন ক্যাম্প রয়েছে এবং সেগুলোতে প্রায় ৩০ হাজার লোক আটক আছে।'

২১ আগষ্ট ২০১৮ তারিখে কেরিয়া কাউন্টিতে প্রশাসনিক অফিসে ফোন দিলে সেখানকার একাধিক পুলিশ জানায়, "আমাদের এখানে ৪টি রিএডুকেশন ক্যাম্প রয়েছে। ১মটি হলো আসল কারাগার। ২য়টি নবনির্মিত ভবন। এবং তয় ও ৪র্থ ক্যাম্পগুলো মূলত শিল্পকারখানার ভবন। বর্তমানে এখানে প্রায় ৩০ হাজার লোক রয়েছে। পরদিন আবার ফোন দেয়া হলে তারা জানায় তাদের সেখানকার রিএডুকেশন ক্যাম্পে মাত্র ২৪২ জন বন্দি আছে। যাদের অধিকাংশেরই ব্যাংক লোন রয়েছে। সাত জন মারা গেছে, যাদের বয়স ছিল ৩১-৪২ বছর। তিনজনের ব্যাংক লোন মওকুফ করা হয়েছে। বাকি চারজনের ব্যাংক লোন মওকুফের প্রক্রিয়া চলছে।

১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জিনজিয়াংয়ের একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তাকে আটক করা হয়। তার নাম গালিব কুরবান। পরে তিনি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তার স্বজাতি উইঘুর মুসলিমদের ব্যাপক হারে গ্রেপ্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যাহোক তার গ্রেপ্তারের এক মাস পর তার পরিবারকে তার ব্যাপারে জানানো হয়।

বন্দিদের সাথে আচরণ

বন্দিদের সাথে কেমন আচরণ করা হয় এ নিয়ে প্রায় সব আন্তর্জাতিক মিডিয়ারই এক বা একাধিক রিপোর্ট রয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে বিবিসি ওয়ার্ল্ডে আব্দুল রহমান হাসান নামের এক উইঘর ব্যবসায়ীর

সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। ব্যবসায়ী সাক্ষাৎকারটি দেয় তুর্কিতে। তিনি চায়নিজ সরকারকে অনুরোধ করেন তার ৬৮ বছর বয়স্ক মা ও ২২ বছরের স্ত্রীকে তারা যেন গুলি করে মেরে ফেলে। কারণ রিএডুকেশন ক্যাম্পের শাস্তি তারা সহ্য করতে পারবে না। তিনি আরো বলেন, তাকে সীমাহীন মগজধোলাই কর্মসূচীর মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাকে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার মুখস্থ করতে দিত। প্রতিদিন সকালে কয়েক ঘন্টা ধরে তা মুখস্থ করতে হত। কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল শি জিনপিংএর দীর্ঘ জীবন কামনা করে স্তুতি পাঠ করতে হত।

মিহিরগুল তুরসুন নামের আরেক নারী রিএডুকেশন ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন। মিশরে পড়াশুনা শেষ করে ২০১৫ সালে তিনি পরিবারের সাথে সময় কাটাতে দেশে ফিরেন। তখনই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার শিশু বাচ্চাগুলোকে তার থেকে আলাদা করে ফেলা হয়। মুক্তি পাওয়ার পর তিনি দেখেন তার তিন শিশু বাচ্চার একজন মৃত্যুবরণ করেছে আর বাকি দুজনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। দুই বছর পর তাকে আবারো গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তি পাওয়ার কয়েক মাস পরই তিনি তৃতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার হন। তাকে ছোট কক্ষে ৬০জন বন্দির সাথে থাকতে হয়। পালা করে ঘুমাতে হয়। টয়লেট সারতে হয় সিসি ক্যামেরার সামনেই। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসা করে গানও গাইতে হয়।

তুরসুন বলেন, তিনি এবং তার সহবন্দিদের অজ্ঞাত ওষুধ নিতে বাধ্য করা হয়। ওষুধের মধ্যে রয়েছে পিল, সাদা তরল ওষুধ। সেই পিল খেলে আমরা দুর্বল হয়ে যেতাম আর তরল ওষুধ নেয়ার ফলে কারো কারো রক্তক্ষরণ হতো কারো মাসিক বন্ধ হয়ে যেত। তুরসুন আরো জানান তার তিন মাস কারাবরণকালে ৯ জন নারী মৃত্যুবরণ করেন। একদিন তুরসুনকে একটি কক্ষে একটি উচু চেয়ারের ওপর বসানো হয়। "আমার হাত বা বাধা। মাথায় হেলমেটের মতো একটা কিছু। প্রতিবার যখন বিদ্যুতের শক দেয়া হচ্ছিল আমার পুরো শরীর প্রচণ্ড কেঁপে উঠতো। আমার হাড়গোর ব্যাথা হয়ে যেত।" আরেক সাক্ষাৎকারে তুরসুন বলেন, আমার মুখের সামনে সাদা এক টুকরো ফোম ধরা হতো এরপর আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতাম। এরপর আমার আর কিছুই মনে থাকতো না। তাদের সর্বশেষ এতটুকু বলতে শুনতাম, "তোরা উইঘুর, উইঘুর হওয়াই অপরাধ"।

সন্তানদের যাতে মিশরে নিয়ে আসতে পারেন এজন্য তিনি মুক্তি পান। তবে তাকে শর্ত দেওয়া হয় আবার চীনে ফিরতে হবে। মিশরে এসে তিনি

যুক্তরাষ্ট্রে যোগযোগ করেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা পেয়ে ভার্জিনিয়াতে বসবাস শুরু করেন।

মুসলিম বন্দিদেরকে জোর করে এলকোহল পানীয় বা মদ-বিয়ার পান করতে এবং শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হত। যেগুলো পান ও ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ। তাদের সেই অজ্ঞাত ওষুধ খেয়ে যন্ত্রণায় অনেকে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে চাইত। কারণ তাদের সে ওষুধের প্রভাব ছিল মারাত্মক। সে ওষুধে বেশ কয়েকজন মুসলিম স্কলারের মৃত্যু হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ সালিহ হাজি, দলকুন ইসার মা আয়হান মেমিত এবং নাম না জানা আরো অনেকে।

৫ লাখ মুখ স্ক্যান করেছে চীন, সহযোগি আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক টাইমস ১৪ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করে। নিউজটির শিরোনাম ছিল, "একমাস, ৫ লাখ মুখ স্ক্যান: যেভাবে চীন একটি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রোফাইল তৈরিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করছে"। বলা হয় এটা একটি বিশাল নৈতিকতার ব্যাপার কিন্তু সে নৈতিকতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে একটি ক্ষুদ্র মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের অবস্থান নির্ণয় করতে চীনা সরকার একটি নিজস্ব প্রযুক্তিগত ভাষা উদ্ভাবন করেছে।

গত দুই বছরে চীন উইঘুরপ্রধান এলাকাগুলোতে ১৭ হাজার সিসি ক্যামেরা স্থাপন করে। আর এখন দেখা যাচ্ছে সেসব ক্যামেরার মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ উইঘুর মুসলিমের মুখমগুলের ছবি স্ক্যান করে সংরক্ষণ করা হয়েচে। বিশাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে যাতে উইঘুরদের গতিবিধি পর্যক্ষেণ করা যায়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৃথিবীতে এটাই সরকারিভাবে আর্টিফিসিয়াল ইন্টলিজেন্স ব্যাবহার করে তথ্য সংগ্রহের প্রথম নজির।

সার্ভেলান্স ক্যামেরা দিয়ে মুখাকৃতি নির্ণয়ের এই প্রযুক্তি প্রযুক্তিতে শীর্ষ দেশ চীনে দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে উইঘুরদের এলাকায় তাদের যাওয়া এবং আসার তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে। চীন এভাবে প্রযুক্তিগত জাতীয়তাবাদ বা জাতি বৈষম্যের যুগে প্রবেশের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে বলেও মন্তব্য করে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা।

এই প্রযুক্তির মূল টার্গেট ১১ মিলিয়ন উইঘুর। এই প্রযুক্তির প্রয়োগের সাথে জড়িত এমন পাঁচজন ব্যক্তি নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিককে জানিয়েছেন। যারা নাম প্রকাশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস স্থানীয় পুলিশ, বেসরকারি ডাটাবেজ কোম্পনি এবং সরকারের ব্যবহৃত সেসব ডাটাবেজ পর্যালোচনা করেছে। চাইনিজ কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে স্বায়ত্বশাসিত জিনজিয়াংয়ের নাগরিকদের ডিএনএ নির্ণয়সহ যাবতীয় তথ্যের এক বিশাল সার্ভেলান্স নেট তৈরি করেছে। কিন্তু বলা হচ্ছে বিশাল তথ্যের এই নেটওয়ার্ক অন্যান্য অঞ্চলেও বিস্তৃত করা হবে। পুলিশ পূর্বাঞ্চলীয় শহর হাংঝু এবং ওয়েনঝু, এছাড়া ফুজিয়ানের সমুদ্রোপকূলীয় শহরগুলোতেও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ইয়োলো নদীর পাশে সেন্ট্রাল চায়না শহর সানমেনসিয়াতে একটি প্রযুক্তি চালু করে যেখানে দেখা যায় তাতে ৫ লাখ উইঘুর নাগরিকের যাবতীয় তথ্য রয়েছে।

পুলিশ বলছে, ২০১৮ সালেই প্রায় ১৬টি প্রদেশ এই প্রযুক্তি ব্যবহারের আবেদন করেছে। কেন্দ্রীয় প্রদেশ শাংহাই এমন প্রযুক্তির সিসি ক্যামেরা চেয়েছে যাতে মুখ দেখে তথ্য নির্ণয় সুবিধা রয়েছে। এবং যাতে উইঘুর নন উইঘুর নির্ণয় করা যায়। পুলিশ কর্মকর্তা বলেন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের নির্ণয় মূল লক্ষ্য। বিশেষ করে উইঘুররা; কারণ তারা মূল হান জনগোষ্ঠীর থেকে আলাদা। আর এ সফটওয়্যার খুব সহজে তাদের শনাক্ত করে ফেলতে পারে।

জর্জটাউনের এক আইনজ্ঞ বলেন, প্রযুক্তি হিসেবে এটি খুবই উন্নত এবং উত্তম কিন্তু যদি আপনি এটা জাতিগত বৈষম্য করতে কাজে লাগান তবে খুবই খারাপ। কিন্তু চীন এটাকে জাতিগত বৈষম্য করতেই আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ব্যবহার করছে। যদি কোন উইঘুর পার্শ্ববর্তী কোন প্রদেশে যায় কিংবা ৬জন উইঘুর একসাথে হয় তবে সাথে সাথে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার কাছে মেসেজ দিবে এই আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি। তথ্যের সত্যতা নির্ভর করবে ক্যামেরা পজিশন, আলো ব্যবস্থাপনার ওপর। মুখাকৃতি, চামড়া নির্ণয় শেষে ছবি বা ভিডিওতে একজন মানব কণ্ঠে জাতি পরিচয়টি বলতে হবে। চায়না পুলিশ এই মানব কণ্ঠের কাজটি প্রাইভেট সফটওয়্যার কোম্পানি দিয়ে করিয়ে থাকে।

চাইনিজ আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সগুলো হলো Yitu, Megvii, SenseTime, and CloudWalk, যাদের এক একটি কোম্পানির মূলধন হলো এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আরেকটি কোম্পানি আছে Hikvision নামের যারা শুধু ক্যামেরা সাপ্লাই দিয়েছিল। চায়না সরকার এসব কোম্পনীর মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে শুধু ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর তথ্য কম্পিউটারাইজড করতে। পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করতে SKznet, Sharp Eyes নামের দুটি প্রজেক্ট চালু হাতে নিয়েছিল চীন।

এতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হবার কোন আশংকা আছে কিনা জানতে চেয়ে এই সাংবাদিকের করা ইমেইলের কোন জবাব দেয়নি CloudWalk, Yitu নামের দুই সফটওয়্যার কোম্পানি। এমনকি চীনা জননিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে মন্তব্য চেয়ে ফ্যাক্স করেও কোন জবাব পাননি সাংবাদিক।

জাতীয় ডাটাবেজে ৩ লাখ অপরাধীর তথ্য যুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেছে চীনা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা। আর ওয়েনঝু শহরে প্রায় ৮ হাজার মাদক কারবারির মুখাকৃতি সংগ্রহ করা হয়েছে বলেও দাবী করা হয়।

মুসলিম শনাক্তকরণ মোবাইল অ্যাপ চালু!

ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল শাস্তির মুখে পড়েছে চীনের মুসলমানেরা। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কারাগারে তারা একের পর এক অভিনব, নিষ্ঠুর শাস্তির মুখোমুখি হচ্ছেন। তাতে সর্বশেষ যোগ হয়েছে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে তাদের সামাজিক জীবনকে কঠোর নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসা। পুরো শহরের অলিতে গলিতে হাজার হাজার সিসি ক্যামেরা লাগিয়েও যেন তারা সন্তুষ্ট নয়। যেভাবে তারা নিজ ধর্ম পালন থেকে বিরত রেখেও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাদের ধর্ম পালনে বাধ্য করছে মদ, শূকর খেতে বাধ্য করছে।

মোবাইল অ্যাপ চালুর খবরটি হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বরাতে রেডিও ফ্রি এশিয়া গত মে মাসে প্রকাশ করে (২.৫.২০১৯)। এতে ওই মোবাইল এপর দুটি পেজের ছবিও দেয়া হয়। ছবিতে দেখা যায় মোবাইল এপের প্রধান ৫টি মেনু আর তার সাথে রয়েছে অনেকগুলো সাবমেনু। হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের এই অ্যাপের প্রধান ৪টি মেনু হলো- Basic Information, Biodata , Religious and Political Status, Activities Abroad, Authorities are paying Special Attention to 36th Person Type.

অ্যাপের প্রতিটি মেনুর রয়েছে আবার অনেকগুলো সাব মেনু। এসব সাব মেনুতে ব্যক্তিগত, সামজিক, ধর্মীয়, জাতিগত, পেশাগত তথ্য, বৈদেশিক আত্মীয়স্বজন, ন্যাশনাল আইডি নম্বর, মোবাইল নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর ইত্যাদি তথ্য রয়েছে। ধর্মীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে আবার দুটি অপশন রয়েছে। ১. (ধর্ম পালন) মোটামুটি ২. (ধর্ম পালন) কট্টর।

Integrated Joint Operations Platform (IJOP), নামের অ্যাপটি পুলিশ বা স্থানীয় সরকারি এজেন্টরা ব্যবহার করে। এতে ৩৬টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির মধ্যে যত বেশি থাকবে তত তার গ্রেপ্তার হবার আশংকা থাকবে। মোবাইল অ্যাপটি প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশনা দিবে কাকে গ্রেপ্তার করা এখনই প্রয়োজন, কাকে গ্রেপ্তার করা উচিৎ, কারা সন্দেহভাজন ইত্যাদি।

৩৬টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- কারো স্মার্টফোন বন্ধ রয়েছে কিনা, কেউ অত্যাধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে কিনা, কারা বাড়ির সামনের দরজা ব্যবহার করছে না, কারা প্রতিবেশির সাথে মেলামেশা করছে না, কারা মসজিদ বা মাদরাসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে ইত্যাদি।

কান্নার সময়ও ঠিক করে দেয় ওরা!

নিউজটা দেখে থমকে যাই। এও কি সম্ভব! একজন মানুষ কখন হাসবে কখন কাঁদবে তার কি কোন রুটিন করা যায়? পৃথিবীতে এমন কোনো কারাগার ছিল বলে জানা নাই যেখানে হাসি কান্নার ওপরও নিয়ন্ত্রণ আছে। তাও দৈনিক নয়, সপ্তাহে নয়, পুরো দুই সপ্তাহ পর একবার। এক/দুই ঘন্টার জন্য। আর ইতিহাসের নির্মমতম এই আচরণ করা হচ্ছে উইঘুর মুসলিমদের সাথে। চীনের জিংজিয়াংয়ে।

ওদের ভাষায় যেসব উইঘুর মুসলিম 'কট্টর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি' লালন করে কিম্বা 'রাজনৈতিকভাবে ভুল' মানসিকতাসম্পন্ন তাদেরকে 'পুনঃশিক্ষা ক্যাম্পে' ধরে এনে সুশিক্ষিত করতেই এই পদক্ষেপ। রেডিও ফ্রি এশিয়া ২০-০৫-২০১৯ তারিখে খবরটি প্রকাশ করে।

গুলজার আবুলকানকিজি নামের একজন কাজাখ নারী এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি জুলাই ২০১৭ হতে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ওই 'পুনঃশিক্ষা ক্যাম্পে' বন্দি ছিলেন। মুক্তি পেয়ে তিনি এখন কাজাখিস্তানে রয়েছেন। তিনি জানান, তাদের প্রায় দৈনিক ১৪ ঘন্টা রাজনৈতিক দীক্ষা ক্লাস করতে হতো আর তাদের কষ্টের কথা বিবেচনা করে প্রতি দুই সপ্তাহে একবার কান্নার সময় দেওয়া হত।

কান্নার সময় দিয়ে তারা বলত, "এখন তোমরা কাঁদতে পার।" কিন্তু আমরা যদি অন্য সময় কাঁদতাম আমাদের তিরস্কার করা হত, হুমকি দেওয়া হত। বলত, "যদি এভাবে কাঁদতে থাক তবে অন্য ক্যাম্পে বদলি করে দেব।" যদি আমরা আর সহ্য করতে না পেরে কান্না করে দিতাম তখন তারা ধমক দিয়ে বলত, এখন কাঁদতে পারবে না। তোমরা তখনই কাঁদবে যখন কান্নার জন্য রুটিনমাফিক সময় আসবে। আর কান্নার রুটিনমাফিক সময় আসলে তারা আমাদের ধমক দিয়ে বলতে থাকত, "এখন তোরা কান্না কর!"

গুলজার বলেন, কর্তৃপক্ষ আমাদের কান্নার সময় দিয়েছিল কারণ তারা জানত আমাদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু আমাদের বন্দিদের যখন কান্নার সময় দিত তখন আর আমাদের কান্না আসত না। কিন্তু আমাদের কাঁদতে হতো কারণ কর্মকর্তারা আমাদের পর্যবেক্ষণ করতো। প্রতি ক্লাসে পাঁচজন শিক্ষক এবং দুইজন পুলিশ আমাদের পর্যবেক্ষণ করত।

নির্ধারিত সময়ের বাইরে কান্নাকাটি করলে ক্লাস পর্যবেক্ষকরা আমাদের বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার হুমকি দিত। আর মৌখিক অশ্রাব্য গালিগালাজ তো আছেই। গুলজার বলেন, আমি অনবরত কান্না করতাম। আমি কোনভাবেই সেখানে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। কিন্তু অফিসারদের ধরাবাধা সময়ে কখনো কান্না আসত না বরং নিজেকে অপমানিত বোধ করতাম।

তারা দৈনিক ১৪ ঘন্টা ক্লাস করাতো আর এর মাঝে মাত্র দুই মিনিটের জন্য দুইবার টয়লেটে যেতে দিত। মাঝেমাঝে দুএকবার বিরতি হতো কিছু সময়ের জন্য। আর তিনবেলা খাবারও ওখানে খেতে হতো অল্প সময়ের মধ্যে। ডরমিটরিতে ফিরে আসার পর ঘুমের অনুমতি দেবার আগ পর্যন্ত মান্দারিন ভাষা শিখতে হত।

ক্লাসে একে অপরের সাথে কথা বলতে দেয়া হতো না। এমনকি ক্লাসের বিষয়ে সামান্য কিছু নিয়েও না। সিসি ক্যামেরায় বাইরে থেকে আরেকজন মনিটর করতো। সারা রাত আমাদের মনিটর করা হতো।

শূকর না খেলে শাস্তি!

ইসলাম পালনের মধ্যে যেমন সর্বোচ্চ শান্তি পাওয়া যায় তেমনি ইসলাম পালনে বাধাও একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্টের। বিশ্বের দিকে দিকে আজ মুসলিমরা নির্যাতিত। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরাক, আফগানিস্তান, মিয়ানমারের মতো চীনের জিনজিয়াংয়েও ইতিহাসের এক জঘন্য পরিস্থিতি যাচ্ছে মুসলমানদের।

জিনজিয়াংয়ে ২০ লাখেরও বেশি মুসলিমকে নির্যাতনের খবর আমরা জানলেও নির্যাতনের ধরণগুলো ছিল অজানা। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে চীনা কমিউনিস্টরা সেসব বন্দিখানাগুলো পরিচালনা করে আসলেও আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কিছু শিথিলতা দিতে বাধ্য হচ্ছে সাংবাদিকদের। আর এতেই বের হয়ে আসছে ভয়ংকর সব তথ্য। তেমনি একটি খবর হলো সেখানে মুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। রেডিও ফ্রি এশিয়ার ওয়েবসাইটে এ আতঙ্কজনক খবরটি প্রকাশিত হয়। (মে, ২০১৯)

ওমরবেক ইলি নামের একজন কাজাখ মুসলিমকে ২০১৭ সালে চীনের তুরফান অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করে চীনা পুলিশ। তিনি তার বাবা মাকে দেখতে এসেছিলেন আর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে তিনি নাকি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন। কাজাখ সরকারের সহযোগিতায় কারাগার থেকে মুক্তির আগে সাত মাসেরও বেশি কারাভোগ করতে হয় তাকে। এরপর এক মাসের রিএডুকেশন ক্যাম্পের কারাদণ্ড। এই পুনঃশিক্ষা ক্যাম্পে থাকাকালে তাকে শূকরের মাংস খেতে বাধ্য করা হয়।

ওমরবেক জানান, সেখানে মুসলিমদেরকে প্রতি শুক্রবার শূকরের মাংস খেতে দেওয়া হয়। পোলাউয়ের মতো রাইসের সাথে শূকরের মাংস মিশিয়ে রান্না করা এক প্রকার খাবার তারা আমাদের খেতে দিত। রাইসের উপরেই থাকতো বড় মাংসের টুকরো। প্রহরীরা আমাদেরকে বিদ্রূপ করে বলত, "আমাদের দেওয়া শূকরটি খুব সুস্বাদু না?" এমনকি তারা আমাদের হুমকি দিত, "যদি শূকর না খাস তো তোদের শাস্তি পেতে হবে।"

গুলবাহার জেলিলোভা নামের আরেক নারী জানান, তাদেরকে নিয়মিত সপ্তাহে এক দুই বার শুকর খেতে দিত। খাবারের ছোট ছোট মাংসের টুকরা থাকতো। আমরা যদি খাবার সময় মাংসের টুকরোগুলা আলাদা করে রাখতাম তখন প্রহরীরা তা দেখে ফেলতো। তারা সিসি ক্যামেরা দিয়ে দেখে আমাদের কক্ষে দৌড়ে আসতো। বলতো, তোমরা CCP [Chinese Communist Party] এর দেয়া খাবারগুলো অপচয় করছ কেন?

জেলিলোভা আরো জানান, একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল যিনি শুধু বনরুটি আর পানি খেতে চাইতেন। কোন শুকরের মাংস দিয়ে রান্না করা খাবার খেতেন না। এজন্য তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পর্যন্ত তাকে খাবার দেয়া হয়নি। এভাবে আরো কয়েকজনকে যারা শুকরে মাংস খেত না তাদেরকে একক প্রকোষ্ঠে নিয়ে গিয়ে শাস্তি দেওয়া হত।

"আমরা কি খাচ্ছি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করার অধিকারও আমাদের ছিল না। বলা যেত না আমরা এটা খাব না।"

জেলিলোভা একজন নারী ব্যবসায়ী। যিনি এখন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বসবাস করছেন। মে ২০১৭ থেকে আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত তার বন্দিদশায় তিনি এ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

আরেকটি খবরে দেখা যায় চন্দ্রবর্ষ উপলক্ষে ইলি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে মুসলমানদের মাঝে শূকরের মাংস বিলি করছে কর্তৃপক্ষ। আবার কোথাও কোথাও ধরে নিয়ে শূকরের মাংস ও মদ খেতে বাধ্য করা হয়েছে।

যারা শূকর খেতে অনীহা প্রকাশ করেছে তাদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে।

ক্যাম্প ফেরতরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ছেন

"সবকিছু খুইয়ে ছাড়া পাচ্ছেন উইঘুর নারীরা" শিরোনামে ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে দৈনিক যুগান্তর একটি খবর প্রকাশ করে।

...বছর তিনেক আগে হঠাৎ করে উধাও হয়ে যান এক উইঘুর নারী। পরে জানা গেছে, ইসলামী উগ্রপন্থার মোকাবেলায় চীনা ধরপাকড় অভিযানে তাকে আটক করা হয়েছে। অনেক ধকল ও খেসারতের পর এবার তিনি ছাড়া পেয়েছেন। তার পাকিস্তানী স্বামী বলেন, সে মুক্তি পেয়েছে, তবে অনেক খেসারত দিতে হয়েছে আমাদের।

পশ্চিমাঞ্চলীয় চীনা প্রদেশ জিনজিয়াংয়ের ৪০ উইঘুর নারী, যারা প্রতিবেশী পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের বিয়ে করেছেন, দেশটিতে অন্তরীণ ক্যাম্পে তাদেরও আটক করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী সময় ছাড়া পেয়েছেন। খবর এএফপির।

যদিও এই অন্তরীণ ক্যাম্পকে চীন সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে। ইসলামে নিষিদ্ধ এমন কার্যক্রম করতে ক্যাম্পের ভেতর তাদের বাধ্য করা হয়েছে বলে খবরে জানা গেছে।

সম্প্রতি জিনজিয়াংয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাকিস্তানি ব্যবসায়ী বলেন, ক্যাম্পে তাদের শূকরের মাংস ও অ্যালকোহল খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। কাজেই তার স্ত্রী এখন সেই নিষিদ্ধ বস্তু খাচ্ছেন।

তিনি বলেন, তার স্ত্রী তাকে জানিয়েছেন- সে যদি কর্তৃপক্ষকে খুশি করতে পারে যে তার ভেতরে কোনো উগ্রপন্থী চেতনা নেই, তবে তিনি বাড়িতে ফিরে আসার সুযোগ পাবেন।

'ক্যাম্পে তাকে কোরআন ও নামাজ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে; তার বদলে ঘরে বিভিন্ন চীনা বই রাখতে হচ্ছে,' বললেন এই পাকিস্তানি ব্যবসায়ী।

কিছু কিছু ব্যবসায়ী কয়েক সপ্তাহ কিংবা মাস তাদের স্ত্রীকে জিনজিয়াংয়ে রেখে নিজ দেশে ব্যবসায়িক কাজে যান। কেবল ইসলামিক প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায়ও তাদের আটক করে ক্যাম্পে

নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর আগে আটক হওয়া কয়েকজন বলেন, বোরকাপরা ও দাড়ি রাখার মতো ইসলামী ঐতিহ্য মেনে চলার কারণে তাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু নৃতাত্ত্বিক উইঘুরসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক নিরাপত্তা ধরপাকড়ে তাদের আটক করা হলেও আন্তর্জাতিক নিন্দা ও পাকিস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার স্বার্থে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়েছে। গত দুই মাস ধরে ধীরগতিতে তারা একে একে ছাড়া পাচ্ছেন।

জিনজিয়াং সীমান্তের পাকিস্তানি ভূখণ্ড গিলজিত-বালতিস্তান সরকারের মুখপাত্র ফাইজ উল্লাহ ফারাক বলেন, আটক পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের উইঘুর স্ত্রীদের অনেকেই ছাড়া পেয়েছেন। তবে কয়েক নারীর স্বামী অভিযোগ করেছেন, তাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও তিন মাসের জন্য জিনজিয়াং থেকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। এ সময় তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে।

এক রত্নপাথর ব্যবসায়ী বলেন, চীনা সমাজের সঙ্গে তারা কতটা খাপ খেতে পেরেছেন, তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। যদি কর্তৃপক্ষের মনে হয়, সমাজের সঙ্গে তারা এখনও মিলে যেতে পারেননি, তবে ফের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। এই শর্তেই তারা ছাড়া পেয়েছেন বলে তিনি জানান। কিন্তু মুক্তি পাওয়ার প্রাথমিক আনন্দ খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তিনি বলেন, ক্যাম্প থেকে ফিরে আসার পর তাদের প্রাণপ্রিয় স্ত্রী ও মায়েদের দেখতে একেবারে অদ্ভুত লাগছে।

তিনি বলেন, আমার স্ত্রী জানিয়েছেন- ক্যাম্পের ভেতর খোলামেলা পোশাক পরে তাকে নাচতে বাধ্য করা হয়েছে। শূকরের মাংস ও মদ খাওয়ানো হয়েছে। এর পর তার হাতে একটি নির্দেশনাপত্র ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। ছবি আকারে ছাপানো ওই নির্দেশনাপত্রে মসজিদে লাল ক্রসচিহ্ন দিয়ে চীনা পতাকায় সবুজ চিহ্ন দেয়া হয়েছে।

'সে একসময় নিয়মিত নামাজ পড়ত, কিন্তু এখন সেই অভ্যাস নেই। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় গিয়ে সে মদ খাচ্ছে।' তিনি বলেন, চীনা কর্তৃপক্ষ নারীদের কাছ থেকে এমন আচরণই প্রত্যাশা করছে।

অস্ট্রেলিয়ার লা ট্রোব বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা নিরাপত্তাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ জেইমস লেইবোল্ড বলেন, জিনজিয়াংয়ে চীনা সরকার নজরদারি জোরদার করেছে। নিজেদের সক্ষমতায় তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

ক্যাম্প থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কোনো নারী মানসিক বৈকল্যে ভুগছেন। কেউ তাদের আচরণ নিয়ে সরকারকে রিপোর্ট করতে পারে আশঙ্কায় ভুগছেন তারা। ওই ব্যবসায়ী বলেন, সবচেয়ে খারাপ দিকটি হচ্ছে, তার নীরবতা। সে সবাইকে সন্দেহ করছে। তারা বাবা-মা, পরিবার এবং আমাকেও।

একজন মিহিরগুলের গল্প

"ওরা আমার দুধের শিশুকে মেরে ফেলেছে!"

তুরসুন মিহিরগুল। বয়স ২৯। বার বছর বয়সে চীনারা ধরে নিয়ে যায়। তাদের স্কুলে পড়তে বাধ্য করে। মাধ্যমিক শেষ করে মিশরে চলে যান উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনার জন্য। সেখানে বিয়ে করেন। ফুটফুটে দু'টি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তানের জননী হন তুরসুন। এরপর চীনে চলে আসেন পরিবারের কাছে। জিনজিয়াংয়ের আসার কয়েকদিনের মাথায় তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। বুকের দুধ পান করা সন্তানসহ তিন সন্তানকেও আটক করা হয়। আলাদা করে রাখা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে তার আবেগঘন বর্ণনায় সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বমিডিয়ায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পরে তার বয়ানের ভিডিও।

"ক্যাম্পের ভিতর তারা আমাকে উলঙ্গ করে ফেলতো। দিনের পর দিন ঘুমাতে দিত না। জিজ্ঞাসাবাদ করত। মিশরে আমি কি করেছি বারবার জিজ্ঞেস করতো। আমার মাথার চুল সব চেছে দেয়।"

তুরসুন বলেন, "কয়েক মাস পর তারা আমাকে মুক্তি দেয়। আমি দেখি আমার তিন সন্তানের একজন নেই! দুধের শিশুটিকে তারা মেরে ফেলেছে।"

আবার কয়েক মাসের মধ্যেই আমাকে গ্রেপ্তার করে। সেবার তাদের নির্যাতনে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। হাসপাতালের নিয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ায় তারা আমাকে মুক্তি দেয়।

তৃতীয়বার যখন আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় তখনকার শাস্তির মাত্রা ছিল ভয়াবহ। আরো নিষ্ঠুর, আরো বর্বর। ওরা আমার মাথায় একটি হেলমেট পড়িয়ে দিত। বিদ্যুতের শক দিত সেটা দিয়ে। যখন শক দিত পুরো শরীর প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেত। সারা শরীরের শিরা উপশিরাগুলো ব্যাথায় শেষ হয়ে যেত। তাদের হাতে পায়ে ধরে বলেছি 'আমাকে মেরে ফেলুন তবু এই শাস্তি দিবেন না।'

তুরসুন আরো বলেন, তিনি এমন এক কয়েদিকে দেখেছেন যারা প্রচণ্ডরকম অসুস্থ ছিল কিন্তু তারপরও তাদের চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হতো না। বন্দিদেরকে জোর করে কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান, আদর্শ মুখস্থ করানো হতো। যদি তারা ঠিকঠাক মতো বলতে না পারতো শাস্তি দেওয়া হতো।

কুরআন নিষিদ্ধের প্রতিবাদ করল ফুটবলার

পৃথিবীতে যে কয়টি জাতি কিংবা সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার তাদের মধ্যে অন্যতম চীনের উইঘুর মুসলিমরা।

উইঘুর মুসলিমদের কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। মুসলিম পোশাক প্রকাশ্যে পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহু আগে জারি করা হয়েছে। নারীদের হিজাব পরা তো দূরের কথা, শর্টড্রেসের বাইরে একটু বড় জামাও তারা পড়তে পারে না। দাড়ি-টুপি এক কথায় নিষিদ্ধ। ২০০৫ সাল থেকে জিনজিয়াংয়ে কুরআন ছাপানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হানরা প্রায়ই হামলে পড়ে উইঘুর মুসলিমদের ওপর। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং রাখাইনরা অত্যাচার নির্যাতন করার পর রোহিঙ্গারা পালিয়ে এসেছে বাংলাদেশে; কিন্তু উইঘুর মুসলিমদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সর্বশেষ জিনজিয়াং প্রদেশের প্রশাসন উইঘুর মুসলিমদের নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন তাদের কাছে থাকা পবিত্র কোরআন শরীফের সব কপি, জায়নামাজ, তসবিহসহ- ইসলামিক সব উপাদান পুলিশের কাছে জমা দেয়। অন্যথায় কঠোর শাস্তি পেতে হবে উইঘুর মুসলিমদেরকে। শুধু আদেশ জারি করাই নয়, জিনজিয়াং প্রদেশের পুলিশ ও কর্মকর্তারা গ্রামে-গঞ্জ এবং শহরে- সব জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে। পুরো সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পবিত্র কোরআন শরীফ ও জায়নামাজ বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে বলে বিভিন্ন খবরে জানা যাচ্ছে।

চীনা কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশনার প্রত্যুত্তরে চেলসির সাবেক এবং সেনেগালের জাতীয় দলের তারকা ফুটবলার ডেম্বাবা টুইটারে দারুণ এক জবাব দিয়েছেন। যে জবাব রিটুইট হয়েছে প্রায় ৩৭ হাজার। লাইক করেছেন ৩০ হাজারের বেশি। অধিকাংশই সাহসী মন্তব্যের জন্য ডেম্বাবাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেনেগালের এই ফুটবলার এখন আবার খেলছেন- চীনের ফুটবল লিগের ক্লাব সাংহাই সেনহুয়ায়। যদিও এখন লোনে খেলছেন তুর্কি ক্লাব বেসিকতাসে।

কী জবাব দিয়েছেন ডেম্বাবা? টুইটারেই তিনি লিখেছেন, 'যদি তারা জানত যে, মুসলিমরা মেঝেতেই নামায পড়তে পারে এবং মিলিয়ন মুসলিম কুরআন না খুলেই মুখস্ত পড়তে পারে; তখন সম্ভবত তারা (চাইনিজরা) তাদেরকে (মুসলিম) হৃৎপিন্ড খুলে তাদের কাছে হস্তান্তর করার আদেশ দিতো।'

রোহিঙ্গা মুসলিমদের সহায়তায় মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অ্যাকশন নেয়ারও আহ্বান জানিয়েছিলেন সেনেগালিজ এই ফুটবলার। পবিত্র হজ্জ পালন শেষে আনাদোলু নিউজ এজেন্সির সঙ্গে কথার বলার সময় ডেম্বাবা বলেন, শুধু মুসলমানই নয়, সারা বিশ্বেরই এখন দায়িত্ব মিয়ানমারের বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাওয়ার। কারণ, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করে যাচ্ছে। (বিডিপ্রতিদিন, ২ অক্টোবর, ২০১৭)

প্রথম কুরআন অনুবাদককে মেরেই ফেললো ওরা!

মুসলিমদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আলকোরআন অনুবাদক মুসলিম স্কলারকে শহিদ করে ফেলেছে চীন। উইঘুর মুসলিম স্কলার মুহাম্মদ সালিহ হাজিম দেশটির কুখ্যাত নিপীড়ন ক্যাম্পে আটক অবস্থায় নিহত হয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে উইঘুর মুসলিমদের সংগঠন ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস (ডব্লিউইউসি)। সালিহ হাজিম পবিত্র কোরআন শরীফ আরবি থেকে উইঘুর ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। আর তিনিই প্রথম উইঘুর ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন।

সম্প্রতি (১০ জুন, ২০১৮) এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানায় ডব্লিউইউসি। এতে বলা হয়, গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে সালিহ হাজিমকে (৮২) আটক করা হয় এবং কুখ্যাত 'রি-এডুকেশন' ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। নির্যাতনেই তার মৃত্যু হয়েছে। খবর আনাদোলু এজেন্সির।

বিবৃতিতে বলা হয়, উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীন কর্তৃপক্ষের ব্যাপক নিপীড়ন, বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণে চলমান দমন-পীড়নের মধ্যেই সালিহ হাজিমকে আটক করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলন ত্যাগ করতে হাজার হাজার উইঘুর মুসলিমকে কুখ্যাত 'রি-এডুকেশন ক্যাম্পে' আটকে রাখা হয়। এতে আরও বলা হয়, নিপীড়ন ক্যাম্পে সালিহ হাজিমের নিহতের বিষয়টি চীন কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

২০১৭ সালের বসন্তকাল থেকে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের কর্তৃপক্ষ হাজার হাজার মুসলিমকে এই 'রি-এডুকেশন ক্যাম্পে' আটক রেখেছে। এই 'রি-এডুকেশন' ক্যাম্প কর্মসূচি চালুর উদ্দেশ্য হলো- বন্দিদের মাঝে নতুন রাজনৈতিক চিন্তা চাপিয়ে দেয়া, তাদের ইসলামিক মূল্যবোধ মুছে ফেলা এবং তাদের জাতিগত নতুন পরিচয় দেয়া। বছর বছর এ ধরনের ক্যাম্পের

সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এখনকার মুসলিম তরুণ-আলেমরাই বিশেষ করে এই 'রি-এডুকেশন ক্যাম্পের' নিপীড়নের শিকার।

পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালানো হয় উইঘুর অঞ্চলে

উইঘুরপ্রধান লুপ নূর এলাকায় চীন তার অধিকাংশ পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়ে থাকে। প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালানো হয় ১৯৬৪ সালে। বোমাটির নাম ছিল ৫৯৬। বোমাটির তেজস্ক্রিয়তা এতই বেশি ছিল এখনো এই বোমা বিস্ফোরণের দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিবছর সেমিনার আয়োজন করে উইঘুরদের বিভিন্ন সংগঠন। ২০১৪ সালে এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করে ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস। চীন বিষয়টি সম্পূর্ণ ধামাচাপা দিয়ে যায়। বোমা পরীক্ষা না চালানোর জন্য উইঘুররা ব্যাপক পুলিশি বাধার মুখেও প্রতিবাদ সমাবেশ করে যায়। কিন্তু তাদের সেসব প্রতিবাদ-সমাবেশগুলোর দিকে কর্ণপাত করে না চীন সরকার। এমনকি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে স্বাস্থ্যক্ষতির পরিমাণ নিয়ে কোনো জরিপ পরিচালনা করতেও চীনা কমিউনিস্ট সরকার অনীহা প্রকাশ করে।

এরকম একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় বিখ্যাত 'সাইন্টিফিক আমেরিকা' জার্নালে। জার্নালে ব্রিটেনের সাংবাদিক জিয়া মেরালি একজন উইঘুর মুসলিমের বক্তব্য প্রকাশ করেন যিনি ছোটবেলায় নিজ চোখে দেখেছেন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরের প্রতিক্রিয়া। পরবর্তীতে তিনি জাপানে ডাক্তারি পড়তে চলে যান। তার নাম এনভার তোহতি। সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালের ১ জুলাই। যার শিরোনাম ছিল "চীনের পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে কি হাজার হাজার লোক মারা পড়েছে আর ভবিষৎ প্রজন্ম কি ধ্বংসের মুখে?" পাঠকদের জন্য সাক্ষাৎকার প্রতিবেদনটির চুম্বকাংশ তুলে ধরা হলো।

এনভার তোহতি পুরো সপ্তাহজুড়ে আকাশে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলির কথা স্মরণ করেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, ১৯৭৩। সবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি। থাকেন চীনের সর্বপশ্চিমাঞ্চল জিনজিয়াং প্রদেশে। যেখানে প্রায় সবাই উইঘুর। তিন দিন শুধু আকাশ হতে ধূলিবালি পড়েছে। অথচ কোন বৃষ্টি নেই, ঝড় নেই। আকাশ নিঝুম। কোন সূর্য নেই, চন্দ্রও নেই। ছাত্ররা শিক্ষককে জিজ্ঞেস করতো, 'কী হয়েছে স্যার?' শিক্ষক বলতেন, 'অন্য গ্রহে

ঝড় হয়েছে। তার ধূলিবালি আমাদের উপর পড়ছে।' তোহতি তার কথা বিশ্বাস করতেন। কয়েক বছর পরই তিনি বুঝতে পারেন সেটা আসলে রেডিওঅ্যাকটিভ ধূলি। যা তাদের এলাকায় পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার ফলে ঘটেছে।

তিন দশক পর তোহতি এখন মেডিকেল পাশ করা ডাক্তার। একটি তদন্ত সংস্থা গঠন করেছেন। চীন সরকার এখনো তার সংস্থার স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। জিনজিয়াংয়ের লুপ নূরে ১৯৬৪ সাল হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪০টি পারমাণবিক বোমা পরীক্ষায় অন্তত কয়েক হাজার লোক নিহত হয়েছে। প্রায় দুই কোটি জনবসতির এই অঞ্চলে পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার ফলে দীর্ঘমেয়াদি নানা অসুখবিসুখ দেখা দিয়েছে। বংশ পরম্পরায় এসব রোগ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি জাপানের সাপারো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেন। তার সাথে যোগ দেন চিকিৎসবিদ জুন তাকাদা। "এটি একটি বেদনাহত সুযোগ; কিন্তু নতুন কিছু শেখার এবং অন্যদেশে যে ভাল কাজ দেখি তার প্রয়োগ ঘটানোর ভাল একটি সুযোগ।"

তাকাদা হিসেব করে দেখেছেন, জিনজিয়াংয়ের বোমার উচ্চতা রাশিয়ার চেরনোবিল পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। চেরনোবিলের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৬ সালে। জিনজিয়াংয়ে বোমা বিস্ফোরণের পরিমাণ ছিল প্রায় তিন মেগা টন। যা হিরোশিমার বোমার চেয়েও প্রায় দুইশগুণ বড়। তাগাদা তার একটি বইয়ে এসব তথ্য সন্নিবেশিত করেন। বইটির নাম *Chinese Nuclear Tests* (Iryoka-gakusha, 2009).

৯০'র দশকে তাকাদা তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেছেন আমেরিকায়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং ফ্রান্সে। তাকে জিনজিয়াংয়ের পাশ্ববর্তী কাজাখস্তানের বিজ্ঞানীরাও চীনা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল পরীক্ষা করতে সেদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বিস্ফোরণের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা করতে তিনি একটি কম্পিউটার মডেলও দাঁড় করান। ১৯৯৫-২০০২ সাল পর্যন্ত কাজাখস্তানে রাশিয়া ও চীনের পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণগুলোর তেজস্ক্রিয়তা নির্ণয় করে দেন। তাকাদাকে চীনে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি। তাই তিনি তার মডেল আরো উন্নত করেন এবং জিনজিয়াংয়ের জনসংখ্যা ঘনত্ব পরিমাপ নিয়ে ধারণা দেন যে "আনুমানিক ১ লাখ ৯৪ হাজার লোক পারমাণবিক বোমার

প্রচন্ড তেজস্ক্রিয়তায় মারা যায়। প্রায় ১২ লাখ লোক ক্যানসারের জীবানুতে আক্রান্ত হয়।" তাকাদা সর্বশেষ বলেন, "আমার এ হিসাব সবচেয়ে কম করে ধরা হিসাব।"

স্কুল লাইফে তোহতি মনেমনে বেশ খুশিই হতেন এই ভেবে যে তার এলাকায় সেনাবাহিনী ও বিজ্ঞানীরা বিশেষ প্রজেক্ট পরিচালনা করছে। কিন্তু বড় হয়ে ডাক্তার হলে দেখেন তার লোকেরা মারাত্মক চর্মসার, ফুসফুস ক্যান্সার, রক্তস্বল্পতা, খর্বকায় সমস্যা এবং ত্রুটিযুক্ত শিশু জন্ম ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তোহতি স্বাস্থ্য ঝুঁকিটা সরাসরি বুঝতে পারেন ১৯৯৮ সালে। যখন তিনি তুরস্কে তার একটি মেডিকেল প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে ব্রিটিশদের একটি গবেষণা দলের সাথে কাজ করেন। তিনি সে গবেষণা দলকে জিনজিয়াংয়ে নিয়ে আসেন এবং পরীক্ষা করে দেখেন যে চীনের অন্য প্রদেশগুলোর তুলনায় জিনজিয়াংয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত হবার হার ৩০-৩৫ গুণ বেশি।

আরেকটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চীন প্রতি ২৮৪ দিনে একটি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা চালিয়ে থাকে। আর লুপ নূরে বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে চীন গণমাধ্যমকে জানায়। তবে চীন অফিসিয়ালি স্বীকার করেছে যে পারমানবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে গিয়ে ১৯৬৪ সাল হতে এ পর্যন্ত ২২১টি দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ২০জনের মৃত্যু ও ১২০০জন আহত হয়েছে।

উইঘুর মুসলিমরা জিনজিয়াংয়ে এসব পারমাণবিক বোমা পরীক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করে আসছে। কিন্তু চীন সরকার তাদেরকে 'বর্বর, উন্নয়নবিরোধী' আখ্যা দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করে আসছে। উইঘুররা এসবের সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ সমাবেশটি করে ১৯৯২ সালের ৮ মে। যেদিন কাশগড়ে প্রায় ১০ হাজার লোক সমাবেশ করে। ১৯৯৩ সালে এক হাজার লোক মিলে আরেকটি সমাবেশ করতে গেলে স্থানীয় পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য সেসময়কার প্রতিবাদ সমাবেশগুলো আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। উইঘুর বক্তাদের মতে তাদের প্রায় ২ লাখ লোক এই পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতায় মারা গেছে। আর রক্তস্বল্পতার হার অন্য প্রদেশগুলোর তুলনায় প্রায় ৭-৮ ভাগ বেশি।

সাংবাদিকদের যেভাবে ধোঁকা দেয় চীন প্রশাসন

চীনা প্রশাসন মুসলিমদের নির্যাতন করেই ক্ষান্ত হতো না এই নির্যাতনের খবর যাতে বিশ্ব মিডিয়ায় না আসতে পারে সেজন্য সংবাদ সংগ্রহ করতে আসা বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মীদের নানাভাবে ধোঁকা দিত। তাদের ধোঁকা, প্রতারণা, জোচ্চরি আর পেশি শক্তির ব্যবহার দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের ভিডিও নিউজগুলো দেখলে এর সত্যতা বুঝবে যে কেউ। সেসব ভিডিওগুলোতে দেখা যায় একটু ভিডিও করা শুরু করলেই প্রশাসনের লোকেরা এসে ক্যামেরা বন্ধ করতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন প্রশাসনের নিষেধ আছে। বন্ধ না করলে জোর করে বন্ধ করে দেন। ক্যামেরা ছিনিয়ে নেন। এমনকি সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের বহু অভিযোগও রয়েছে।

ফ্রান্সের জনপ্রিয় গণমাধ্যম এএফপি গত ২৭ জুন ২০১৯ তারিখে এরকম একটি খবর প্রচারিত হয় যার শিরোনাম ছিল "পর্যটকদের গাড়ি বিধ্বংসের গুজবঃ যেভাবে জিনজিয়াংয়ে সাংবাদিকদের বাধা দেয় চীন"। প্রতিবেদনে বলা হয় সংশ্লিস্ট সংবাদকর্মীরা উইঘুরপ্রধান এবং মুসলিম ঐতিহ্যবাহী কাশগড় অঞ্চলে সংবাদ সংগ্রহে যায়। সেখানে তাদের মুসলিম বন্দিখানাগুলোর কাছাকাছি যেতেই তাদের গাড়ি থামিয়ে দেয় স্থানীয় পুলিশ। বিদেশি সাংবাদিক পরিচয় জানার পর তাদেরকে সামনে এগোতে নিষেধ করে এবং ফিরে যেতে বলে। কেন ফিরে যাবে এমন প্রশ্নের জবাবে তাদেরকে জানানো হয় সামনে একটি পর্যটকভর্তি গাড়ি এক্সিডেন্ট করেছে তাই রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

তারা ছয় দিনের সফরে তিনটি ক্যাম্প ঘুরে দেখতে সমর্থ হন এ সময় স্থানীয়দেরকে তাদের সাথে কথা বলতে বারণ করা হয়। ক্যাম্পগুলোর ভিডিও করতে নিষেধ করা হয়। তারা যখন হোতান অঞ্চলের ক্যাম্পগুলো পরিদর্শনে যায় তখন তাদের পিছন পিছন একটি গাড়ি তাদের ফলো করে। যেইনা তারা ক্যাম্পের কাছাকছি যায় অমনি তাদের পিছনের গাড়িটি সামনে চলে এসে তাদের পথ রোধ করে। সাংবাদিক পরিচয় দেখে দূর থেকে শুধু ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়। এএফপি সাংবাদিকদের এসময় স্থানীয়দের সাথে কথা বলার জন্য স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের

সাহায্য নিতে বলা হয়। একের পর এক চেক পয়েন্টে তাদের আটকে দেয়া হয় এবং কোন কোন শহরে ঢুকতেই দেয়া হয়নি।

আরতাক্স শহরের একটি মসজিদ পরিদর্শনে যেতে চাইলে পুলিশ তাদের জোর করে গাড়ি ঘুরিয়ে দেয়। বলা হয় ড্রাইভিং টেস্টের জন্য আগামী পাঁচ দিন এই সড়ক বন্ধ থাকবে। পরে জানা যায় ঐ মসজিদটি ইতোমধ্যে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

গত ঈদুল ফিতরের সময় কাশগড়ের ঐতিহাসিক ঈদগাহ ময়দানে মুসুল্লিরা নামাজে আসার পথ সংকীর্ণ করা হয়। ময়দান সীমিত করে দেয়া হয় যা ইতিপূর্বে কখনো ঘটেনি। এর আগে দেখা গেছে ঈদের মুসুল্লিরা ঈদাগাহ পেরিয়ে রাস্তায়ও নামাজ আদায় করছেন। কিছু এবছর ময়দান সংকীর্ণ করা হয় এমনকি সাংবাদিকদের ছবি ও সংবাদ সংগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাদের জন্য নির্দিষ্ট তথ্যকেন্দ্র হতে পূর্বলিখিত প্রেসরিলিজ ধরিয়ে দেয়া হয়। নামাজ শেষে সেখানে সরকারি ইমাম সাহেব সাংবাদিকদের বলেন, "আপনারা দেখে নিন এখানে লাখ লাখ উইঘুর সুখে শান্তিতে বসবাস করছে।"

কানাডার পত্রিকা গ্লোব এন্ড মেইলের এক সাংবাদিক জানান, সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে তাকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়া হয়। স্বশস্ত্র পুলিশ তার গাড়ি উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়। এবং তার অনুমতি না নিয়েই ক্যামেরা থেকে সমস্ত ছবি মুছে দেয়।

টেলিগ্রাফ প্রতিবেদক সোফিয়া ইয়ান বলেন, তার টীম প্রায় ৫০ মাইল সফর করে। এ সময় অদৃশ্য কণ্ঠে তাদের বারবার গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যেতে বলা হয়। টেক্সিতে বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে সে কণ্ঠ ভেসে আসছিল।

অন্য দেশে পালিয়েও মুক্তি নেই উইঘুরদের!

উমর খান। একজন স্কুল শিক্ষক। বংশধারায় উইঘুর। থাকেন পাকিস্তানে। তার বাবা দাদারা ১৯৪৮ সালে চীন থেকে এসে পাকিস্তানে বসত গাড়ে। মুসলিম হওয়ায় স্থানীয় পাকিস্তানিরা স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে আপন করে নেয়। শান্তিতেই তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল। তবে তাদের আত্মীয় স্বজন এখনো অনেকে চীনের জিনজিয়াংয়ে বসবাস করছে। ২০০৯ সালের পর সেখানে সরকারি নজরদারি জোরদার হয়। ২০১৭ সালের পর থেকে

কমিউনিস্ট সরকার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে। ইতিহাসের বর্বরতম নির্যাতন শুরু করে উইঘুরদের ওপর। তখন থেকেই দুশ্চিন্তার কালো রেখা তাদের কপালে ভাঁজ হয়ে নামে।

২০১৫ সালে তার মা মারা যাওয়ার পর তার চাচা-চাচি, চাচাতো ভাইবোনেরা জিনজিয়াং হতে আফগানিস্তান হয়ে তাদের দেখতে এসেছিল। কিন্তু ফিরে যাবার পর তাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ রক্ষা করা যায়নি। ফোন, মোবাইল, ইমেইল কোন মাধ্যমেই তাদের আর পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝতে আর বাকি নেই তাদের পরিণতি কী হয়েছে। দুয়েক জন যারা পালিয়ে এসেছে তারা জানিয়েছে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সবাইকে। চীনারা সেসব উইঘরকেই বেশি টার্গেট করে যাদের আত্মীয় স্বজন বিদেশ রয়েছে এবং সেখানে তাদের যোগাযোগ-যাতায়াত আছে।

এদিকে পালিয়ে আসা উইঘুরদেরও মুক্তি নেই। পাকিস্তানে চীনা এম্বেসী কর্তৃক পরিচালিত একটি বেসরকারি এনজিও জিনজিয়াং হতে পালিয়ে আসা উইঘুরদের খুঁজে বের করতে নেমে পড়েছে। 'দি এক্স চায়না এসাসিয়েশন' নামের ঐ সংগঠন তারা উইঘুরদের এলাকায় গিয়ে ঘরে ঘরে একটি ফরম দিয়ে আসছে। ফরম ফিলআপ করে দ্রুত জমা দিতে বলা হয়েছে। ফরমে পরিবারের সকল সদস্যর তথ্য, পাকিস্তান এবং চীনে বসবাসকারী আত্মীয় স্বজনদের নাম ও ঠিকানা দিতে বলা হয়েছে। যারা এই ফরম ফিলাম করে দিবে তাদের জন্য রয়েছে চীনা সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে ফ্রি পড়াশোনা, মাসিক বৃত্তি ও চাকরির সুযোগের লোভনীয় অফার। উমর মনে করেন, এই অফর নিখাদ ফাঁদ ছাড়া কিছুই না। এই ফাঁদে সবাই পা দেবে না। এই সমস্ত তথ্য চীনে পাঠানো হবে এবং চীন সরকার এই তথ্য নিয়ে জিনজিয়াংয়ে বসবাসকারী আত্মীয়দের ওপর নির্যাতন যেমন করবে তেমনি পাকিস্তান সরকারের কাছেও সন্ত্রাসী তালিকা হিসেবে দিয়ে দিতে পারে। দুই হাজার পরিবারের মধ্যে মাত্র চারশত পরিবার এই ফরম পূরণ করে জমা দিয়েছে বলে তিনি জানান।

এনজিও পরিচালক আজিম খানও একজন উইঘুর এবং চীনা সরকারের সাথে এনজিওর আর্থিক লেনদেনের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু পরে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চীফ লিজিয়াও ঝাও ঐ সংগঠনের সাথে চীনা সরকারের কোন সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেন এবং কোন রকম আর্থিক লেনদেনকেও অস্বীকার করেন। আজিম খান জিনজিয়াংয়ে কোন উইঘুরকে নির্যাতন করা হচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন।

উমর খানের একটি স্কুল ছিল। স্কুলে উইঘুর ভাষা, সংস্কৃতি শিক্ষা দিতেন তিনি। স্কুলের নাম ছিল 'উমর উইঘুর ভাষা স্কুল'। মার্চ ২০০৯ তারিখে তিনি এ স্কুল কার্যক্রম শুরু করেন পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে তাদের উইঘুর পাড়ায়। এর কয়েক মাস পরই জিনজিয়াংয়ে উইঘুর হান দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গার পর তার স্কুলে চীনা ও পাকিস্তানী গোয়েন্দা, পুলিশের যাতায়াত বেড়ে যায়। তারা এসে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত এ স্কুলের মালিক কে? স্কুলের কারিকুলাম কী? সেসময় তার স্কুলের অফিস সহকারী কামরুদ্দিন আবদুর রহমানকে চীন পাকিস্তান সীমান্তে আটক করে। আব্দুর রহমান তার আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে ফিরে আসার পথে ইমিগ্রেশন তার কাগজপত্র আটকে দেয়। সন্দেহের বসে তাকে আটক করে সম্পূর্ণ নগ্ন করে তল্লাশি করে। এরপর তাকে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার শর্তে মুক্তি দেয়া হয়।

কিন্তু কামরুদ্দিন রাওয়ালপিন্ডিতে এসে সংবাদ সম্মেলন করে সবকিছু ফাঁস করে দিলে পাকিস্তান ও চীনা কর্তৃপক্ষ তাকে একের পর এক হুমকি দিতে থাকে। হুমকির মুখে কামরুদ্দিন আফগানিস্তানে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এবং এখন সেখানেই তিনি গত আট বছর ধরে নির্বাসনে রয়েছেন। উমর বলেন, কামরুদ্দিন নিজের দেশে থাকতে পারল না। এলো একটি মুসলিম দেশে, সেখানেও নিরাপত্তা পেল না।

২০১০ সালে চীনা কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান প্রশাসনের সহায়তায় উমর খানের স্কুলটি বন্ধ করে দেয়। তার বিরুদ্ধে চীন ঘোষিত উগ্রবাদী সংগঠন 'ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের" সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়। রাবেয়া কাদের নামক একজন মানবাধিকার কর্মীর প্রতিষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস' বিশ্বব্যাপী একটি শান্তিপূর্ণ সংগঠন বলে পরিচিত হলেও চীন সরকার একে উগ্রবাদী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করে। উমর খানের পাকিস্তানি ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হয়। চীনে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

উমর খানের সে স্কুলের জায়গায় চীনের অর্থায়নে জাঁকজমকপূর্ণ একটি স্কুল করে 'এক্স চায়নীজ এসোসিয়েশন'। বিশাল স্কুল ভবন, সমৃদ্ধ সাইন্স ল্যাব, কম্পিউটার ল্যাব সাথে মান্দারিন ভাষা কোর্স। সে স্কুলে চীনা দূতাবাসের কর্মকর্তারা নিয়মিত সফর করেন। উমর বলেন, পাকিস্তান এখন চীনা স্বর্গভূমি। এখানে চায়নারা যা ইচ্ছা করতে পারে। যখন যাকে ইচ্ছা

ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে। তিক্ত হলেও সত্য আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এখন ধ্বংস হবার পথে। চায়নিজরা তাদের মিশনে সফল হচ্ছে।

পাকিস্তানের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের কাছে চিঠি লিখে উইঘুরদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন উমর। এমনকি পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট বরাবরও চিঠি লিখেছেন তিনি।

চীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার কারণে উমরকে অনেক ভোগতে হয়েছে পাকিস্তানে। রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ২০১১ হতে ২০১৪ সাল পযন্ত চার বছর তাকে বিদেশ গমন নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পাঞ্জাবের প্রধান প্রশাসক দীর্ঘদিন পর্যন্ত উপস্থাপন করতে পারেনি। ২০১৭ সালে রাওয়াল পিণ্ডির অফিস থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। নয় দিন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ সময় তার অফিসও পুলিশ ঘেরাও করে রাখে। উমর বলেন, আজো আমি প্রতিবেশীদের সামনে মুখ দেখাতে পারি না। সবাই মনে করে আমি অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত।

পাকিস্তানের উইঘুররা দেশটির নাগরিকত্ব চেয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করলে তাদেরকে নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করা হয় এবং চীনা দূতাবাসে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়। উমর বলেন, কয়েক দশক ধরে এখানে বসবাস করছি। অথচ এখনো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে আশংকায় আছি। তাদের কোনো নাগরিক স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে না। সসম্মানে বেঁচে থাকার অধিকার দেয়া হচ্ছে না। চীনা সরকার যেভাবে হস্তক্ষেপ করছে না জানি কবে আমাদের রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে জেলে ভরে দেয়।

বন্দিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি করছে চীন!

চীন সরকার তাদের বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বলে বিভিন্ন মিডিয়ায় উঠে এসছে। ২২ জুন ২০১৯ তারিখে আমেরিকার লস এঞ্জেলস থেকে প্রকাশিত ব্রিটবার্ট নামক পত্রিকায় বিশিষ্ট গবেষক, অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ইথান গাটম্যানের একটি গবেষণাপত্রে এ বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে চীনা বৌদ্ধ ধর্মের শান্তির বাণীর প্রতি চীনাদের ভক্তিকে "ধর্মীয় ভণ্ডামি" বলে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় যে কিভাবে

তারা অন্য ধর্মের লোকদের কারাগারে ভরে রাখে এবং সেসব বন্দিদের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করে দেয়।

গাটম্যানের প্রতিবেদনে বলা হয় চীনা কর্তৃপক্ষ তাদের ক্যাম্পগুলোতে খ্রিস্টান, মুসলিম এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠির লোকদের শত্রু জ্ঞান করে এবং বন্দি করে রাখে। এবং তাদের লিভার, কিডনি, হৃৎপিণ্ড এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে একটি মিলিয়ন ডলার শিল্প প্রতিষ্ঠিত করেছে।

গাটম্যান এবং দুই সহযোগী ডেভিড কিলগোর এবং ডেভিড ম্যাটাস তাদের গবেষণায় বলেন, ২০১৬ সালে চীন ৫০-৯০ হাজার এরকম ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী করেছে। যাতে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয়। আর এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে চীনা কারাগার গুলোতে বন্দি রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় কারণে আটক কয়েদিদের থেকে। আর এর সাথে জড়িত রয়েছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষ নেতারা। ২০১৭ সালের প্রথম ৯ মাসে প্রায় সকল উইঘুর নারী পুরুষ শিশুদের রক্ত গ্রুপ সংগ্রহ করা হয় এবং ডিএনএ সংগ্রহ করাকে বিস্ময়কর বলে মন্তব্য করা হয়।

সেখানে আরো বলা হয়, জিনজিয়াংয়ের অর্ধেক জনগোষ্ঠি প্রায় হান চায়নিজ কিন্তু শুধু উইঘুরদেরই ডিএনএ সংগ্রহ করা হয়। আর এ সংগ্রহের উদ্দেশ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংগ্রহের আধার তৈরি করা ছাড়া আর কিছুই না। তাছাড়া চীনা কারাগার বা ক্যাম্পগুলোতে মাঝেমাঝেই বন্দিদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরীক্ষা নিরীক্ষার লক্ষ্য যে গ্রহকের চাহিদামাফিক অঙ্গ খুঁজে বলে করা তা অনেকটাই নিশ্চিত।

গাটম্যান বলেন, এসব তথ্য পাওয়ার পর মনে হচ্ছে আমরা এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে আছি। বৈজ্ঞানিক কল্পজগতে আমরা বুঝি বাস করছি। অবাস্তব ব্যাপার সব বাস্তবে ঘটে চলেছে। আমাদের অনুভূতি শুধু, আল্লাহ.. এসব কিভাবে ঘটে চলেছে.. তাও আমাদের চোখের সামনে। বিশ্ব সম্প্রদায় চীনের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা না নিয়ে চীনকে এ অমানবিক কাজের সুযোগ করে দিয়েছে। উইঘুরবাসীর ওপর তাদের অন্যায় অবিচারকে দীর্ঘায়িত হতে দিচ্ছে।

গুম হওয়া বিশিষ্টজনদের তালিকা

গুমের কোন নির্দিষ্ট হিসাব কারো কাছে নেই। থাকারও কথা না। কারণ একটি রাষ্ট্র যখন সকল ধরনের ক্ষমতা ব্যবহার করে কোন ভুখণ্ডের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠিকে নিঃশেষ করে দেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। তখন পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে মোকাবেলা করার সাধ্য রাখে না। তার ওপর দেশটি যদি হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জনশক্তি ও অর্থনৈতিক পরাশক্তির দেশ তাহলে তো কথাই বাড়ানো বোকামি।

বিভিন্ন বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থার তথ্যমতে প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, আলেম, সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণিপেশার মানুষের তালিকা নিম্নরূপ।

	নাম	পেশা-পদবী
০১	খালমুরাত গফুর	সাবেক রেক্টর, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ওভারসাইট ব্যুরো প্রধান, ফিজিশিয়ান, পিএইচডি
০২	আব্বাস এসেত	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ফিজিশিয়ান, পিএইচডি
০৩	নূর মেমেত	উইঘুর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন বিভাগের প্রধান, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়,
০৪	এনওয়ার তোখতি	ইন্সট্রাক্টর, উইঘুর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন বিভাগ, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়,
০৫	আলিম পেত্তার	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ফিজিশিয়ান, পিএইচডি
০৬	পারহাত বেখতি	ভাইস রেক্টর, জিনজিয়াং মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হাসপাতাল
০৭	এরকিন আবদুরেহম	প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
০৮	মেতরেহম হাজি	প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
০৯	এনওয়ার ইসমাইল	এসোসিয়েট প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
১০	এনওয়ার কাদির	এসোসিয়েট প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
১১	গুলনাজ ওবুল	প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
১২	এরকিন ওমর	প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল প্রিন্সিপাল
১৩	মুখতার আবদুগফুর	ইন্সট্রাক্টর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়

১৪	কুরবান ওসমান	ইন্সট্রাক্টর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
১৫	আবলাজান আবদুওয়াকি	প্রফেসর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়; চেয়ারম্যান, গণিত বিভাগ
১৬	রাহিল দাউত	প্রফেসর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়; পিএউচডি
১৭	আরসালান আব্দুল্লাহ	সাবেক ডীন, ফিলোলজি ইনস্টিটিউট, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান XUAR People's Government Cultural Advisors' Office
১৮	আবদুকেরিম রহমান	প্রফেসর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
১৯	ঘেইরাতজান ওসমান	প্রফেসর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২০	তাশপোলাত তাইপ	প্রফেসর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল প্রিন্সিপাল
২১	আলিম এলহেত	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়; ডেভেলপার উইঘুরসফট সফটওয়্যার স্যুট
২২	দিলমারিত তুরসুন	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৩	বাতুর এয়শা	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৪	রেহিম রেমাতুল্লাহ	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৫	এরকিন ইমিরবাকি	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৬	নূরবিয়ে জাদিকর	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৭	নবীজান হেবিবুল্লাহ	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
২৮	এসিয়ে মোহাম্মাদ সালিহ	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়;
২৯	আবদুসালাম আবলিমিত	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়;
৩০	আবদুবেশির শুকরি	প্রফেসর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়; ডীন, ফিলোলজি ইনস্টিটিউট,
৩১	আবদুকাদির জালালিদিন	প্রফেসর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়; কবি, জেমিলে সাকির স্বামী
৩২	জেমিলে সাকি	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং এডুকেশন ইনস্টিটিউট, পিএইচডি
৩৩	ইউনুস এবেইদুল্লাহ	প্রফেসর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪	আবাবাকরি আবদুরেহিশত	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়; পিএইচডি

৩৫	নূরএলি শাহায়াকুপ	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়; পিএইচডি
৩৬	নূর মোম্মাত ওমার	ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়; পিএইচডি
৩৭	আবদুরাজাক সাইম	সহকারি প্রধান, জিনজিয়াং সোশাল সাইন্স একাডেমি, সিনিয়র রিসার্চার
৩৮	কুরেশ তাহির	রিসার্চার, জিনজিয়াং সোশাল সাইন্স একাডেমি,
৩৯	আবলিকিম হেসান	উইঘুর বিভাগ প্রধান ও সিনিয়র এডিটর, জিনজিয়াং ইয়ুথ প্রেস; কবি
৪০	শিমেঙ্গুল আয়ুত	সিনিয়র এডিটর, কাশগড় উইঘুর পাবলিশার্স; কবি
৪১	আবদুকাইয়িম তাওয়াক্কুল	চিকিৎসক, কাশগড় প্রাদেশিক হাসপাতাল
৪২	এনওয়ার আবদুকেরিম	চিকিৎসক, কাশগড় প্রাদেশিক হাসপাতাল
৪৩	মেমেতআলি আবদুরেহিম	সাবেক প্রধান, প্রাদেশিক ভাষা কমিটি
৪৪	তাহির হিমিত	গবেষক, প্রাদেশিক ভাষা কমিটি
৪৫	আলিমজান	গবেষক, প্রাদেশিক ভাষা কমিটি
৪৬	নাজিলজান তুরঘান	গবেষক, প্রাদেশিক ভাষা কমিটি
৪৭	আব্বাস মোনায়েজ	পেশাদার লেখক, প্রাদেশিক লেখক সংঘ
৪৮	পেরহাত তুরসান	গবেষক, প্রাদেশিক আর্টস সেন্টার; পিএইচডি, লেখক; কবি
৪৯	তাহির তালিপ	সিনিয়র এডিটর, কাশগড় ডেইলি, কবি
৫০	ইলহাম তাহির	শিক্ষক, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত মিডল স্কুল
৫১	নিয়াজ আমিন	সাবেক শিক্ষক, কুচা কাউন্টি, মিডল স্কুল
৫২	একরেম ইসলাম	ভাইস প্রিন্সিপাল, সানজি সিটি মিডল স্কুল
৫৩	নিজাত সুপি	প্রফেসর, ইলি টিচারস কলেজ, পিএইচডি, চেয়ার; সাহিত্য বিভাগ
৫৪	বারাত	সাবেক রেক্টর, হোতান টিচারস কলেজ
৫৫	আবদুরাখমান এবি	সাবেক চিফ, সিনিয়র সম্পাদক, জিনজিয়াং পিপলস প্রেস
৫৬	এখমেতজান মমিন	সিনিয়র সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;

৫৭	ইয়ালকুন রোজি	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস; বয়সের কারণে অবসরপ্রাপ্ত, সোশাল ক্রিটিক
৫৮	কাদির আরসালান	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;
৫৯	মেহিবেদের মেখমুত	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;
৬০	আয়শেম পেইজুল্লাহ	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;
৬১	তাহির নাসির	সাবেক প্রধান, সাবেক সহকারী প্রধান সম্পাদক সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস; প্রাদেশিক সরকারি শিক্ষা পরিদর্শক
৬২	ওয়াহিতজান ওসমান	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস; কবি
৬৩	এরকিন মোহাম্মাত	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;
৬৪	একবার সিরাজিদিন	সম্পাদক, জিনজিয়াং এডুকেশন প্রেস;
৬৫	ইয়াসিন জিলাল	প্রধান সম্পাদক, তারিম জার্নাল, কবি
৬৬	মেখমুতজান সিদিক	ডিরেক্টর, জিনজিয়াং টেলিভিশন স্টেশন
৬৭	এখমেতজান মেতরোজি	টেকনিশিয়ান, জিনজিয়াং টেলিভিশন স্টেশন
৬৮	কুরবান মামুত	সাবেক প্রধান সম্পাদক, সাবেক সিনিয়র সম্পাদক জিনজিয়াং কালচার জার্নাল
৬৯	কাইয়িম মুহামেত	এসোসিয়েট প্রফেসর, জিনজিয়াং আর্ট ইনস্টিটিউট; অভিনেতা, আয়োজক
৭০	আইনুর তাশ	প্রতিবেদক, উরুমকি পিপলস রেডিও স্টেশন, বয়সের কারণে অবসরপ্রাপ্ত
৭১	আবলিমিত	ইন্ডেপেনডেন্ট রিসার্চার, উইঘুর ক্ল্যাসিকাল লিটারেচার; পিএউচডি
৭২	আবলেত আবদুরিশিত	এসোসিয়েট প্রফেসর, জিনজিয়াং এডুকেশন ইনস্টিটিউট; পিএউচডি; কবি
৭৩	সাজিদে তুরসুন	পোস্টডক্টরাল রিসার্চার; ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর দ্যা স্টাডি অভ রিলিজিয়াস ডাইভারসিটি ইন গটিংজেন, জার্মানি
৭৪	কামিল মেতরেডহম	চেয়ারম্যান, পেডাগজিকাল ইনস্টিটিউট, উরুমচি ভোকেশনাল বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর
৭৫	দিলরাবা কামিল	ইন্সট্রাক্টর, উরুমকি মিডল স্কুল

৭৬	আরজুগুল তাশপোলাত	লেকচারার, জিনজিয়াং ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট
৭৭	তুরসুনজান হেজিম	ইন্সট্রাক্টর, আকশু মিডল স্কুল
৭৮	আব্বাস বোরহান	রিসার্চার প্রাদেশিক এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট, ভাইস প্রিন্সিপাল, উরুমকি সিটি এলিমেন্টারি স্কুল
৭৯	আবলিমিত আবলিকিম	এমএ স্টুডেন্ট, শাংহাই আর্টস ইনস্টিটিউট
৮০	আবলেত শেমসি	ইন্সট্রাক্টর, কোচ কাউন্টি ইশখালা ভিলেজ মিডল স্কুল
৮১	আদিল তুরসুন	ভাইস প্রিন্সিপাল, সিনিয়র টিচার, কাশগড় ওল্ড সিটি কাউন্টি, মিডল স্কুল, ন্যাশনাল লেভেল এক্সপার্ট
৮২	আরজুগুল আবদুরেহিম	জাপান থেকে এমএ পাশ
৮৩	জুলফিকার বারাত	সাবেক ইন্সট্রাক্টর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি
৮৪	আজাত সুলতান	চেয়ারম্যান, প্রাদেশিক শিল্প ও সাহিত্য পরিষদ; চেয়ারম্যান, জিনজিয়াং লেখক সংঘ, প্রফেসর, সাহিত্য বিশারদ
৮৫	ইদ্রিস নুরুল্লাহ	মুক্ত অনুবাদক, কবি
৮৬	শাহিপ আবদুসালাম	ইন্সট্রাক্টর, কেলপিন কাউন্টি মিডল স্কুল
৮৭	কাসিমজান ওসমান	সিভিল সার্ভেন্ট, পেয়জাবাত কাউন্টি পার্টি কমিটি
৮৮	জহরি নেয়াজ	ইন্সট্রাক্টর, বে কাউন্টিসায়রাম ভিলেজ মিডল স্কুল
৮৯	মোহাম্মাদ সালিহ হাজিম	গবেষক, ন্যাশনালিটিজ রিসার্চ ইনসিটিউট, জিনজিয়াং সোশাল সাইন্স একাডেমি(অবঃ); উইঘুর ভাষায় প্রথম কুরআন অনুবাদ; ধর্মীয় পণ্ডিত অনুবাদক; ৮৪ বছর বয়সে ক্যাম্পে মারা যান; নেজিরে মোহাম্মেদ সালিহের বাবা
৯০	আদিলজান তুনিয়াজ	সাবেক রিপোর্টার, জিনজিয়াং পিপলস রেডিও স্টেশন, কবি, নেজিরে মোহাম্মাদ সালিহের স্বামী
৯১	নেজিরে মোহাম্মাদ	মুক্ত লেখক, মোহাম্মাদ সালিহ হাজিমের কন্যা,

	সালিহ	আদিলজান তুনিয়াজের স্ত্রী
৯২	ইলহাম ওয়েলি	চেয়ারম্যান, সিনিয়র এডিটর 'জিনজিয়াং গেজেট', উইঘুর ইডিটরিয়াল ডিপার্টমেন্ট
৯৩	মিরাকামিল আবলিমিত	ভাইস চেয়ার, সিনিয়র এডিটর 'জিনজিয়াং গেজেট', উইঘুর ইডিটরিয়াল ডিপার্টমেন্ট
৯৪	মেমতিমিম ওবুল	এডিটর 'জিনজিয়াং গেজেট', উইঘুর ইডিটরিয়াল ডিপার্টমেন্ট
৯৫	জুরেত হাজি	এডিটর, 'জিনজিয়াং গেজেট', উইঘুর ইডিটরিয়াল ডিপার্টমেন্ট
৯৬	এরকিন তুরসুন	এডিটর, ডিরেক্টর, ইলি টেলিভিশন স্টেশন
৯৭	আবদুরেহিম আবদুল্লা	সিনিয়র এডিটর, জিনজিয়াং অডিওভিজ্যুয়াল প্রেস; কবি
৯৮	ইসেদ এজিজ	প্রধান, উরুমকি পিপলস রেডিও স্টেশন
৯৯	আলিম ইয়াবা	সাবেক ইন্সট্রাক্টর, পেয়জাওয়াত কাউন্টি গুলুক ভিলেজ মিডল স্কুল; কবি
১০০	এনওয়ার কুতলুক	এডিটর, জিনজিয়াং টেলিভিশন স্টেশন; কবি
১০১	খালমুরাত এইসাজান	ইন্সট্রাক্টর, ইলি পেডাগজিকাল ইনস্টিটিউট
১০২	জুলফিকার কোরেশ	এডিটর, জিনজিয়াং টেলিভিশন স্টেশন; গায়ক
১০৩	তুরদি তুনিয়াজ	সাবেক প্রিন্সিপাল, উরুমকি সিটি এক্সপেরিমেন্টাল মিডল স্কুল
১০৪	ওমেরজান নূরি	ইন্সট্রাক্টর, হোতান টিচার্স কলেজ
১০৫	কায়সার কায়উম	প্রধান সম্পাদক, 'লিটারেডর ট্রান্সলেশনস' জার্নাল; আত্মহত্যা করেন; ক্যাম্পে ধরে নিতে পুলিশ তার অফিসে হানা দিলে তিনি ৮ম তলা থেকে লাফিয়ে পড়েন
১০৬	আবদুকাদির জুমি	মুক্ত অনুবাদক, কবি
১০৭	মিরজাহিত কারিমি	সাবেক সম্পাদক (অবঃ), কাশগড় উইঘুর প্রেস
১০৮	নিজাদ মেমতিমিন	কর্মচারী, কাশগড় প্রাদেশিক সরকারি তথ্য কর্মকর্তা; ফটোগ্রাফার
১০৯	মুতাল্লিপজান মেমতিমিন	মালিক, কাশগড় হোয়াইট স্টিড ফটো স্টুডিও,
১১০	মুখতার রোজি	কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, প্রোগ্রামার
১১১	মেহমুতজান খোজা	সম্পাদক জিনজিয়াং ইয়ুথ জার্নাল, কবি

১১২	নিজাত আবলিমিত	ইন্সট্রাক্টর, কাশগড় বিশ্ববিদ্যালয়
১১৩	মেহেরগুল তাহির	ইন্সট্রাক্টর, কাশগড় প্রিস্কুল টিচার্স ট্রেইনিং স্কুল
১১৪	দিলশাত পারহাত	প্রতিষ্ঠাতা, দিয়ারিম ওয়েবসাইট
১১৫	খালিদে ইসরাইল	সম্পাদক জিনজিয়াং গেজেট, লেখক
১১৬	আবলাজান সিয়িত	সহকারি প্রধান সম্পাদক, সিনিয়র এডিটর, কাশগড় উইঘুর প্রেস
১১৭	ওসমান জুনুন	সাবেক প্রধান সম্পাদক কাশগড় উইঘুর প্রেস
১১৮	আবলিজ ওমার	সাবেক প্রধান সম্পাদক কাশগড় উইঘুর প্রেস
১১৯	দিলমুরাত গফুর	ভাইস রেক্টর জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়
১২০	সেয়রাত আব্দুর রাহমান	গবেষক, জিনজিয়াং সোশাল সাইন্স একাডেমি, সহকারি প্রধান ভাষা ইনস্টিটিউট,
১২১	আবদুকাইয়িম মিজিত	গবেষক, জাতীয় সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র; জিনজিয়াং সোশাল সাইন্স একাডেমি,
১২৩	আবদুরেহিম রাহমান	এসোসিয়েট প্রফেসর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, পিএইচডি, হাসব্যান্ড অফ রুকিয়া ওসমান
১২৩	রুকিয়া ওসমান	এডমিনিস্ট্রেটর, জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, আবদুরেহিম রাহমানের স্ত্রী
১২৪	গুলবাহার এজিজ	সিভিল সার্ভেন্ট, প্রাদেশিক কারা প্রশাসন অফিস, সাইকোলিজি কাউন্সিলর, আইনজীবী
সূত্র: http://uighurtimes.com/index.php/list-of-uyghur-intellectuals-imprisoned-in-china-from-2016-to-the-present/		

পরিস্থিতি মোকাবেলায় চীনের 'বাণিজ্য' কৌশল

তুরস্কের প্রধানসারির দৈনিক হুররিয়াত ডেইলি নিউজ ১ মার্চ ২০১৯ তারিখে একটি সংবাদ প্রকাশ করে যার শিরোনাম China plays economy card in Uighur dispute. সংবাদে বলা হয় সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত কেভসলুগলু জিনজিয়াংয়ে দশ লাখেরও বেশি উইঘুর মুসলিকে রিএডুকেশন ক্যাম্পের নামে আটকে রেখে নির্যাতন করার প্রতিবাদ জানান। এর এক সপ্তাহ পর তুরস্কের ইজমির অঞ্চলের চীনা কনস্যুলেট বন্ধ করে দেয় চীন। চীনের সাথে বাণিজ্যিক লেনেদেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ ইজমির। বার্ষিক প্রায় ৮২৩ মিলিয়ন

মার্কিন ডলারের বাণিজ্য হয় এই পথে। চীনের সাথে তুরস্কের মোট বাণিজ্য প্রায় ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের। ইজমির বন্ধ করে দেবার পর দুই দেশের ব্যবসায়ী গোষ্ঠি দুই দেশের কাছে তাদের বাণিজ্য পথ খুলে দেবার জন্য স্মারকলিপি দেয়।

এটি একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ। চীনা তাদের দেশের মুসলিম নির্যাতন ঢাকতে অন্য অনেক মুসলিম দেশে অনেক রকম কৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনে মুসলমানদের জন্য আর্থিক সাহায্য দান, রোহিঙ্গাদের প্রতি সহানুভূতি স্বরুপ বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস এবং আর্থিক অনুদান প্রদান, আফগানিস্তানে যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে সহযোগিতা, পাকিস্তানকে আর্থিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

চীনা চাপে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে উইঘুরদের

২০০৯ সালে উরামকি দাঙ্গার পর থেকে উইঘুরদের উপর রাষ্ট্রীয় দমন পীড়ন এবং ইসলামবিদ্বেষী অবস্থান প্রকাশ্য রুপ ধারন করে। সচ্ছল উইঘুররা পড়াশুনার জন্য তাদের সন্তানদের ইউরোপ আমেরিকা, মিশর, তুরস্কে, পাঠাতে পারলেও তুলনামূলক অসচ্ছল পরিবারের সন্তানেরা পড়ে বিপাকে। পশ্চিমা দেশগুলোতে যেতে হলে অর্থবিত্ত না হয় উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। যার কোনোটাই তাদের নেই। তাই তারা বেছে নেয় পূর্ব এশিয়া বা চীনের আশেপাশের বিভিন্ন দেশ। যেসব দেশে খুব সহজে এবং কম খরচে যাওয়া যায়। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে মালয়শিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, বুলগেরিয়া ইত্যাদি। এছাড়া ইউরোপের অনেক দেশেও তারা রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে।

কিন্তু সেসব দেশে গিয়েও নিস্তার নেই। উইঘুরদের ব্যাপারে সেসব দেশেও নজরদারি করে চীন সরকার। আশ্রয় চাওয়া উইঘুরদের নিজ দেশে ফিরিয়ে দিতে বলে। এমন অনেককেই ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

এমনি এক খবর প্রকাশিত হয় ৯ জুলাই ২০১৫ তারিখে। এএফপির বরাতে খবরটির শিরোনাম ছিল Thailand forcibly sends nearly 100 Uighur Muslims back to China অর্থ্যাৎ, থাইল্যান্ড জোর করে প্রায় ১০০ উইঘুর মুসলিমকে চীনের ফেরত পাঠাতে চাচ্ছে। এবং এ খবরে মানবাধিকার সংগঠনগুলো ও জাতিসংঘ উদ্বেগ প্রকাশ করে থাইল্যান্ডকে সতর্ক করে এবং মানবিক দিক বিবেচনার অনুরোধ জানায়। উইঘুররা

থাইল্যান্ড রুট ব্যবহার করে তুরস্কে গিয়ে পৌছত। এতদ্বসত্ত্বেও থাইল্যান্ড চীনা চাপে তাদেরকে চীনে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিবাদে তুরস্কে থাই দূতাবাসের সামনে প্রায় সহস্রাধিক উইঘুর বিক্ষোভ সমাবেশ করে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে সুনাই ফাসুক নামের একজন থাই মানবাধিকার গবেষক বলেন, "এটা অত্যান্ত পরিতাপের বিষয় যে, থাই সরকার চীনা চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে।"

মিশরের নিরাপত্তা বাহিনী ২০১৭ সালে কয়েক ডজন উইঘুর শিক্ষার্থীকে চীনের হাতে তুলে দেয়। অবশ্য ২০১৭ সালের আগস্টে জার্মানী একজন উইঘুর মুসলিমকে চীনের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারে নিজেদের ভুল স্বীকার করে বলেছে যে তারা তখন জিনজিয়াংয়ে মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের খবর জানত না। অন্যদিকে আরব আমিরাতও কিছু উইঘুরকে চীনের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে এইচআরডব্লিউ চীন শাখার ডিরেক্টর সফাই রিচার্ডসন বলেন, "আরব আমিরাতের উচিৎ নির্যাতিত উইঘুরদের চীনের হাতে তুলে না দেওয়া। এ ক্ষেত্রে তারা জার্মানী ও সুইডেনের উদাহরণ অনুসরণ করতে পারে।" তিনি আরো বলেন, আমরা খরব পেয়েছি চীন অন্যান্য দেশে পালিয়ে যাওয়া উইঘুরদের জিনজিয়াংয়ে ফিরিয়ে দিতে চাপ সৃষ্টি করছে।"

ইউরোপীয় মানবাধিকার সংস্থা ইউএনপিও ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রচার করে। সংবাদটি হলো, ইউরোপিয়ান সংসদ সদস্যরা বুলগেরিয়া সরকারকে সেদেশে আশ্রয়প্রার্থী উইঘুর মুসলিমদের চীনে ফিরিয়ে না দেওয়ার আহবান জানান। এবং এ আহবান জানিয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমাদের সাধ্যমত আমরা ইউরোপিয়ান সংসদের সদস্যরা বুলগেরিয়া সরকারের কাছে অনুরোধ করছি আশ্রয়প্রার্থী ৫ উইঘুর মুসলিমকে যেন চীনের কাছে হস্তান্তর করা না হয়। ওই উইঘুররা বুলগেরিয়ার লিমবিমেটস কারাগারে আটক রয়েছে। এটা বুঝা যাচ্ছে যে চীনে তাদের বেআইনিভাবে আটক রাখা, গুম করে রাখা অথবা নির্যাতনের আশংকা রয়েছে। বুলগেরিয়ান পুলিশ তাদেরকে ২৭ জুলাই ২০১৭ তারিখে আটক করে। তারা তুর্কি সীমানা পার হয়ে বুলগেরিয়ায় বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছিল। পরে তারা সরকারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে সরকার তাদের আবেদন ফিরিয়ে দেয়।

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে সুইডেন ঘোষণা দেয় যে তারা কোন উইঘুরকে চীনাদের হাতে তুলে দিবে না। খবরটি অস্ট্রেলিয়ান এসবিএস পত্রিকার অনলাইন ভার্সনে বিশ্বব্যাপি প্রচারিত হয়। সাংবাদিক জজি ওলসন পলিতিক প্রতিবেদনের শুরুতে বলেন, গত ৫ সেপ্টেম্বর রিপোর্ট করেছিলাম 'সুইডেন এক উইঘুর পরিবারকে জিনজিয়াংয়ে ফেরত দিতে যাচ্ছে' আর আজ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গল্পটি হলো চার সদস্যের এক উইঘুর পরিবারকে আশ্রয় দিতে সুইডেনের মাইগ্রেশন বোর্ড ও মাইগ্রেশন কোর্ট অস্বীকার জানায় এবং তাদেরকে চীনা দূতাবাসে যোগাযোগ করে দেশে ফিরে যেতে বলে। অবস্থাদৃষ্টে বুঝা যায় সুইডেন কর্তপক্ষের জিনজিয়াংয়ে মুসলিম নির্যাতন সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর জানা ছিল না। কিন্তু সপ্তাহখানেক পর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে আপাতত সকল ধরনের ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠিকে চীনে ফিরিয়ে দেয়া বন্ধ করে।

"চীনে ফিরে গেলে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে!"-১৮ বছর বয়সের এক উইঘুর উদ্বাস্তু কানাডা সরকারের কাছে এভাবেই আশ্রয় প্রার্থনা করে। সিবিসি রেডিও ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে।

আবিরা নামের এক উইঘুর নারী চার বছর আগে তার মায়ের সাথে আমেরিকার উদ্দেশ্যে চীন ত্যাগ করে। তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে দেখাশোনা করতে তার মা চীনে যান। কিন্তু সেখানকার পরিস্থিতি খারাপ হলে তারা কানাডা আসতে ব্যর্থ হন। আবিরা গত বছর আবার কানাডা আসেন এবং নিজের অবস্থা তুলে ধরে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। জুলাই মাসে তিনি দেশ ত্যাগের নোটিশ পান। "আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে যদি আমি চীনে ফিরে যাই। আমার পরিবারের কোন খবর নেই। আর আমি যদি সেখানে ফিরে যাই তারা আমাকে নিশ্চিত ক্যাম্পে প্রেরণ করবে।" আবিরা দ্য কারেন্ট পত্রিকাকে বলেন। "আমি এখনো আমার মাকে নিয়ে চিন্তিত।" পরে মানবাধিকার কর্মীদের হস্তক্ষেপে কানাডায় থাকার অনুমতি পান।

মালয়েশিয়ার নির্লজ্জতা ও বোধদয়

মালয়েশিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে ২০১৭ সালে সেদেশে আশ্রয় নেয়া উইঘুরদের অন্তত ২৭জনকে চীনের হাতে তুলে দেয়। অথচ একটি মুসলিম দেশ হিসেবে সেখানে আশ্রয় পাওয়া তাদের অধিকার ছিল। এর কিছুদিন পর মালয়েশিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী চীন সফরে যায়। সেখানে দুই পক্ষের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় সহযোগিতার কথা পুর্নব্যক্ত করে এবং অর্থনৈতিক

সম্পর্ক জোরদার করা নিয়ে গোপন মিটিং করে। এদিকে থাইল্যান্ড এ ঘটনায় মালয়েশিয়ার সমালোচনা করে এবং উইঘুরদের ব্যাপারে নমনীয় হতে অনুরোধ করে।

অন্যদিকে ২০১৮ সালের ১১ অক্টোবর প্রকাশিত বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক খবরে দেখা যায়, মালয়েশিয়া চীনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ১১ উইঘুর মুসলিমকে মুক্তি দিয়ে তুরস্কে ফিরে যেতে অনুমতি দেয়। 'অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে কারণ এখানে মানবিক দিক বিবেচনা করা হয়েছে' একজন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন। তাদেরকে গত বছরের নভেম্বরে অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় প্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

এর আগে নাজিব রাজাকের সরকার ২০১৫ সালে ১০০ উইঘুরকে জোর করে চীনের হাতে তুলে দিয়েছিল। যদিও তারা নিজেদেরকে তুরস্কের নাগরিক বলে দাবী করেছিল। কিন্তু মাহাথির মোহাম্মাদের সরকার ক্ষমতায় এসে অনেক নমনীয়তা দেখায়। এর আগে মাহাথির মিয়ানমারের অং সান সুচির সমালোচনা করে বলেন, 'আমরা আর তোমাকে সমর্থন করি না'।

দুবাইতেও নিরাপদ নয় উইঘুর মুসলিমরা!

আরবের দুবাইতেও নিরাপদ নয় উইঘুর মুসলিমরা। চীনা সরকারের চাপের কাছে তারাও নতি স্বীকার করেছে। দুবাইতে একজন মসজিদের মুয়াজ্জিনকে উইঘুর হওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয় বলে তার পরিবার জানায়। আবদুল আজিজি সুফি চীনের জিনজিয়াং প্রদেশ হতে দুবাইতে আসেন। চীন সরকারের নির্যাতন, গ্রেপ্তারের মুখে তিনি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। এদিকে সুফির ভাই এক সংবাদমাধ্যমে বলেন, আরব আমিরাত যদি আমার ভাইকে চীনে ফেরত পাঠায় তবে তারা আমার ভাইকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে। সুফি এর আগে মিশরের কায়রোতে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে পড়াশুনা করেন। তিনি ২০১২ সালে চীন থেকে পালিয়ে মিশরে আসেন এবং ইংরেজির ওপর কোর্স করতে দুবাইতে আসেন ২০১৭ সালে। ইংরেজি কোর্স শেষ হলে দুবাই কর্তৃপক্ষ তার সুমিষ্ট কণ্ঠের জন্য মুয়াজ্জিনের চাকরিতে জয়েন করতে বলেন। সেসময় তাকে ২০২১ সাল পর্যন্ত থাকার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি দুবাই পুলিশ তাকে সাদা পোশাকে গিয়ে গ্রেপ্তার করে।

মুসলিম দেশগুলোও চীনের পক্ষে; হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

সৌদি আরব

উইঘুর মুসলিমদের টার্গেট করে চীনের কঠোর দমন-পীড়ন তুরস্ক-যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বে সমালোচিত হয়ে এলেও এই নিপীড়নের পক্ষেই যেন সাফাই গাইলেন সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

সৌদি বাদশাহীর প্রথম উত্তরাধিকারী বিন, সালমান কথিত 'সন্ত্রাস দমন' ও 'উগ্রবাদ ঠেকাতে' চীনের কঠোর দমননীতির সাফাই গেয়ে বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থে 'সন্ত্রাসবিরোধী' ও 'উগ্রবাদ প্রতিহত করতে' পদক্ষেপ বাস্তবায়নের অধিকার বেইজিংয়ের রয়েছে।

চীন সফররত বিন সালমান স্বাগতিক দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে এক বৈঠকে তাদের দমননীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে এমন কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চীনের অধিকারকে সৌদি আরব সবসময় সম্মান জানিয়েছে এবং সমর্থন করেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বিন সালমানের এমন 'অবস্থান' জানার পর সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

জিনজিয়াংয়ে সামরিক বাহিনীর টহলসফরে গিয়ে নিপীড়িত গোষ্ঠী উইগুরের অধিকারের পক্ষে কোনো কথা না বলে উল্টো বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর 'ভ্যানগার্ড' দাবিদার সৌদি আরবের প্রভাবশালী এ যুবরাজ 'চীনা দমননীতি'র তোষণ করায় ব্যথিত মুসলিম বিশ্ব। মুসলিম অধিকারের বিভিন্ন সংগঠন বিন সালমানের এই মন্তব্য 'জঘন্য ও ন্যাক্কারজনক' বলেও উল্লেখ করেছে।

জিনজিয়াংয়ে মুসলিমদের ওপর চীনের এই দমন-নীতির ব্যাপারে রিয়াদ সবসময়ই মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছে। এমনকি সৌদি আরবের শাসক আল সৌদ রাজপরিবার দু'টি পবিত্র মসজিদের রক্ষক ও বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর অভিভাবক পরিচয় দিয়ে এলেও তারা ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (আইসিসি) কোনো পরিসরেও বিষয়টি নিয়ে টুঁ শব্দ করেনি। চীনের উত্তর-পশ্চিমে জিনজিয়াংয়ের ম্যাপমুখে কুলুপ এঁটে থাকার অবস্থান থেকে মুখ খুলে উল্টো এবার চীনের পক্ষ নিয়ে দমন-পীড়নে সমর্থন দেওয়ায় সৌদি যুবরাজের কঠোর সমালোচনা করেছেন ব্রিটেনের মুসলিম কাউন্সিলের মুখপাত্র মিকদাদ ভার্সি। বিষয়টিকে 'উইঘুর মুসলিমদের বিরুদ্ধে নির্যাতন

কেন্দ্র গড়ে তোলার পক্ষে সাফাই' এবং 'অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক' বলেও মন্তব্য করেছেন মিকদাদ।

জার্মানিভিত্তিক অধিকার সংগঠন ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, উইঘুরদের বন্দিশালায় নিক্ষেপের বিষয়ে বিন সালমান সোচ্চার না হতে পারার ব্যর্থতা কার্যত 'চীনের লজ্জাকর অধিকার লঙ্ঘন'কেই নীরব সমর্থন। (বাংলাদেশ প্রতিদিন, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৯)

পাকিস্তান

চীন মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন চালাচ্ছে সে ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইমরান খান। সংখ্যালঘু উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের ২০ লাখেরও বেশি মানুষকে এক ধরনের বন্দীশিবিরে আটকে রেখেছে চীন। দেশটি মুসলিমদের ওপর গত কয়েক বছর ধরে নানা অত্যাচার করছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও পশ্চিমা অনেক দেশ অভিযোগ তুলেছে। তবে এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, উইঘুরদের ওপর চীন সরকারের দমন পীড়নের ব্যাপারে তিনি বেশি কিছু জানেন না। (৩১ মার্চ, ২০১৯)

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন পাকিস্তানের এ প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাৎকারে ইমরান খান বলেন, সত্যি কথা আমি ওই সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি। বিশ্বে মুসলিম সম্প্রদায় অনেক খারাপ সময়ের মধ্যে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেন ইমরান খান। কিন্তু সেসময় তিনি চীনে উইঘুর মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সাক্ষাৎকারে ইমরান খান আরো বলেন, ব্যাপারটি সম্পর্কে আমার যথেষ্ট জানা থাকলে আমি এ ব্যাপারে কথা বলতাম। এছাড়া চীনে মুসলিমদের ওপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছে সে বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমে বেশি কোনো খবর নেই বলে উল্লেখ করেন তিনি।

কিরগিজিস্তান

কিরগিজিস্তানের এক নারীকে চীনের উইঘুর মুসলিমদের পক্ষে স্লোগান দেয়ায় দুই মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে সে দেশের আদালত। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে প্রায় ১০ লাখ মুসলিমকে পুনঃশিক্ষা কর্মসূচীর নামে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে আটকের প্রতিবাদে তারা পাঁচ শতাধিক লোক রাজধানী বিশকেকের

আলাতূ স্কয়ারে মিছিল সমাবেশ করে। ১৭ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশ থেকে আরো অনেককে গ্রেপ্তার করে পরে ৪৫ মার্কিন ডলার দণ্ড আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ২৩ জানুয়ারি জাতিবিদ্বেষী স্লোগান দেয়ার অভিযোগ এনে ৫৬ বছর বয়সী গুলজামিলা সাপারালিয়েভাকে গ্রেপ্তার করে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

দেশটির প্রেসিডেন্ট সুরনবাই জীনবিকভ এ গ্রেপ্তারের পক্ষ নেন এবং এই বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, যারাই চীন-কিরগিজ মৈত্রী সম্পর্ক নিয়ে কথা বলবে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।

সূত্রঃ https://rferl.org

আইএসের রক্তের নদী বইয়ে দেয়ার হুমকি

মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সশস্ত্রগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এ যোগ দেওয়া চীনের সংখ্যালঘু উইঘুর সম্প্রদায়ের মানুষ চীনে ফিরে 'রক্তের নদী বইয়ে দেওয়ার' হুমকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে সাইট ইনটেলিজেন্স। সম্প্রতি একটি নতুন ভিডিওতে এই হুমকি দেয়া হয়। যুক্তরাজ্যভিত্তিক জঙ্গি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকারী গ্রুপ 'সাইট ইনটেলিজেন্স' নতুন এই ভিডিওটি এ সপ্তাহে প্রকাশ করে। আইএস-এর অনলাইনে প্রকাশ করা ভিডিওতে ইরাকে উইঘুর সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ছবি ধারণ করা হয়েছে।

এই ভিডিওটিকে ভয়াবহ হুমকি হিসেবে দেখছে বেইজিং। উইঘুর হলো চীনের পশ্চিমাঞ্চলে শিনঝিয়াং প্রদেশের মুসলিম সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে অনেকে সিরিয়া ও ইরাকে গিয়ে জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দিয়েছে। এছাড়া অবৈধভাবে এদের অনেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও তুরস্ক সফর করছে বলে ধারণা করা হয়। এদের নিয়ে বরাবরই উদ্বেগ প্রকাশ করে চীন। চীনাদের মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে দিতে ২০১৫ সালে এক চীনা জিম্মিকে হত্যার দাবি করেছিল ইসলামিক স্টেট। গত কয়েক বছরে জিনজিয়াং-এ কয়েকশ' মানুষের মৃত্যু হয়েছে উইঘুর আর হান চাইনিজদের মধ্যে সংঘর্ষে এই অস্থিরতার জন্য চীনা সরকার ইসলামিক জঙ্গিদের দায়ী করে আসছে।

ইসলামিক স্টেটের 'দ্য ইরাকি আর্ম' আধা ঘণ্টার এই ভিডিওটি প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে উইঘুররা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এছাড়া এর

মধ্যে কিছু দৃশ্য জিনঝিয়াং প্রদেশে ধারণ করা, যেখানে চীনা পুলিশদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে এক যোদ্ধাকে বলতে শোনা গেছে, ''আমার ভাইয়েরা, আমরা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ করছি! আমি তোমাদের বলছি, এসো এবং এখানে থাকো, শক্তিশালী হও। আমরা নিশ্চিতভাবে আমেরিকা, চীন, রাশিয়া এবং বিশ্বের সব প্রান্তে আমাদের পতাকা গেড়ে দেবো।'' অন্য এক দৃশ্যে এক উইঘুরকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''নিপীড়িতদের চোখে যত অশ্রু বয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ আমরা তত রক্তের নদী বইয়ে দেবো।'' রয়টার্স অবশ্য বলছে, ভিডিওটি সত্যি কিনা তা নিয়ে তারা নিশ্চিত নয়।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেঙ শুয়াং জানান, তিনি এখনও এই ভিডিওটি সম্পর্কে জানেন না এবং এটি তিনি দেখেননি। তবে তিনি বলেন, ''একটা বিষয় পরিষ্কার আর তা হলো, আমরা সন্ত্রাসকে কখনোই সমর্থন করি না এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় আমরা সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ নেবো।'' তবে চীনের মানবাধিকার কর্মীদের মতে, জিনঝিয়াংয়ে কোনো জঙ্গি গোষ্ঠী নেই। (সূত্রঃ এপি, এএফপি, রয়টার্স)

রাবেয়া কাদির ও একটি চিঠি

রাবিয়া কাদির। চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের নির্যাতিত উইঘুর জনগনের মুখপাত্র হয়ে কাজ করে আসছেন। তিনি অনেকের কাছে মুসলমানদের 'দালাইলামা' হিসেবেও পরিচিত। তবে দালাইলামাকে নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব যতটা সরব তার বেলায় ততটাই নীরব। সম্প্রতি তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের প্রতি একটি খোলা চিঠি দেন।

ভারতবর্ষের মুসলিমদের প্রতি খোলা চিঠি

সম্মানিত ভারতবর্ষের মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর (২০১৮) আপনারা আমাদের প্রতি যে সমর্থন ও চীন সরকারের প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন তা আমাদের পূর্ব তুর্কিস্তানের ভেতরে ও বাইরের জনগণের অন্তরে আশার বীজ বুনেছে। একজন উইঘুর কর্মী হিসেবে আমাদের কাছে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে চীন ১০

লাখ উইঘুর মানুষকে আটকে রাখতে পারে। কারণ চীন সরকার জাতি হিসেবে আমাদের ধ্বংস করে দিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে এবং আমাদের ভূমি চিরতরে দখল নিয়ে নিতে চাচ্ছে। ১৯৪৯ সালে তারা আমাদের ভূমিতে অভিযান চালিয়েছিল এবং তখন থেকে তাদের দখল কার্যক্রম চালু রাখতে নানা ফন্দি ফিকির করে। আজকে তাদের ক্যাম্পগুলো তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তারা প্রকাশ্যে আমাদের লোকদের ধ্বংস করার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হলো এই নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য দেখেও বিশ্ববাসী নীরব ছিল। বিশেষ করে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের খবর প্রকাশিত হবার পর ইসলামী দেশগুলো থেকে কোন (প্রতিবাদ) শব্দ শোনা যায়নি অথচ তারা আমাদের ভাই।

এ বছরের শুরুতে আমি পশ্চিমা এবং ইসলামী দেশগুলোর নিকট যাদের সাথে চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তাদের কাছে বিভিন্ন প্রতিবেদন জমা দিয়েছি এবং অনুরোধ করেছি। আমার অনুরোধ ছিল ক্যাম্পগুলো বন্ধ করা যেখানে নিয়ে নির্যাতন করে চীন সরকার। যদি সেটাও সম্ভব না হয় তবে কূটনৈতিকভাবে অন্তত চীনকে বলা হয় নির্যাতন না করতে এবং নিন্দা জানানো হয়।

কিছুই হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে নেয় কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপ নেবার মতো তা যথেষ্ট নয়। কিন্তু একটি মুসলিম দেশও টু শব্দ করেনি। বরং মুসলিম দেশগুলোর যেসব আমাদের সাথে কথা বলেছে তারা যেন বোবা, বধির। যেখানে পশ্চিমা দেশগুলো, তাদের সংস্থা-সংগঠন কথা বলছে সেখানে আমাদের মুসলিম দেশগুলো কেন কোন কথা বলে না? তারা কথা বলতে পারলে আমরা কেন চুপ মেরে থাকি।

যখন আমরা দেখি হাজার হাজার ভাইবোনেরা বাংলাদেশে এবং ভারতে আমাদের জন্য রাস্তায় নামেন তখন আমাদের আনন্দ ধরে না, আমরা অনুভব করি আমরা একা নই। আমরা দেখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের (শাসকদের) ভূমিকা ও প্রতিবাদ যথেষ্ট না হলেও অন্তত মুসলিম ভাইবোনদের অন্তর থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃনা মুছে যায়নি। আমরা দেখি সেসব ভাইবোনদের যারা গরিব হলেও চায়না থেকে অর্থনৈতিক লাভের হিসাব না করে শুধু অসীম ঈমানী প্রাচুর্যকে দুনিয়াবী টাকা পয়সা অস্ত্রশস্ত্রর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাবেয়া কাদীর প্রসঙ্গ

আমরা প্রমাণ দেখি যে আল্লাহ মাজলুমের পক্ষে আছেন, জালেমের পক্ষে নয়। আজকে এক মিলিয়নেরও বেশি (১০ লাখেরও বেশি) মুসলিম সেসব ক্যাম্পে বন্দি আছেন। সমগ্র উইঘুর পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা একে অপরকে দেখেন না দেড় বছর ধরে। জানেন না তাদের প্রিয় মুখগুলো কোথায় আছে? কমন আছে? আমাদের লোকেরা এরকম নির্যাতন সয়ে আসছে দীর্ঘ ৬৮ বছর ধরে, শুধু ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে। এখন চীন আমাদের ঈমানের উপর আঘাত করছে। তারা আমাদের উইঘুর এবং কাজাখ মুসলিম পরিচয়কে চায়না নাস্তিকতায় বদলে দিতে চায়।

আমাদের উইঘুর জাতীয়তা আমাদের নির্বাচিত নয়। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্বাচন করে দেওয়া। তাই চীনের পক্ষে কখনোই সম্ভব না এই পরিচয় বদলে দেওয়া। আমরা বিশ্বাস করি পৃথিবীতে কিয়ামত পর্যন্ত আমরা এই উইঘুর পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকবো। আর এভাবে লড়াই চালিয়ে যাব।

আমাদের ভাইদের কাছে আমাদের এটাই চাওয়া আপনারা স্বৈরাচারের পক্ষ নিবেন না। আপনারা আওয়াজ তুলুন। আমাদের পাশে থাকুন। সে সমর্থন শুধু আমাদের জন্য অনুপ্রেরণাই হবে না বরং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রেরণার বাতি জ্বালবে। জানবে, আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাইবোন চীনের ক্যাম্পেগুলোতে বন্দি। দেখবে, রাজনীতিবিদরা কী করে, আর মিডিয়া রাষ্ট্রের কাছে প্রশ্ন করবে।

অধিকন্তু, সেই সমর্থন এশিয়ার দেশগুলোকে এসব ক্যাম্প সম্পর্কে জানাতে ভূমিকা রাখবে এবং কার্যকরভাবে দ্রুত পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যাবে।

ভাইয়েরা, আল্লাহ আপনাদের মঙ্গল করুন! আল্লাহ আপনাদের সংগঠনগুলোর এবং নেতাদের সফল করুন!

ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট
রাবিয়া কাদির

রাবিয়া কাদির এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাবিয়া কাদিরকে চীনা সরকার একসময় উইঘুর নারী ব্যবসায়ীদের মডেল বলে প্রচারণা চালাত। আর এখন সেই রাবিয়াকে আটবছরের জেল দেওয়া

হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি দেশের আইন ভঙ্গ করে বিদেশিদের হাতে গোপন তথ্য তুলে দিয়েছেন, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা করেছেন। ৫৫ বছর বয়স্কা রাবিয়াকে ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট আটক করা হয়। তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্রে একটি গবেষণা পত্র উপস্থাপনের জন্য যাচ্ছিলেন। ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি উরামকি প্রশাসন সেই অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তি হলো তিনি তার স্বামী সিদিক রোজিকে কিছু সংবাদপত্র মেইল করেছিলেন। তার স্বামী যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রেডিও ফ্রি এশিয়ার একজন ভাষ্যকার।

চীনা কর্তৃপক্ষের দাবি সেসব ইমেইল ডকুমেন্টসের মধ্যে উইঘুর স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে। অথচ সেসব কাগজপত্র ছিল স্থানীয় পত্রিকা জিনজিয়াং ডেইলিতেমে ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য। কাদির উরামকি ইন্টারমিডিয়েট কোর্টে ১০ মার্চ জবানবন্দি দিতে যান কিন্তু না তাকে না তার আইনজীবীকে কথা বলতে দেয়া হয়। পরিবারের সদস্যদেরও তাতে সেই বিচারকার্যে অংশ নিতে দেয়া হয় নি। মাত্র দু'ঘন্টার মধ্যে সবকিছু করে ফেলা হয়। কাদিরকে ৮ বছরের সাজা দেয়া হয় চীনের অপরাধ আদালতের ১১১ নং বিধি অনুযায়ী।

যদিও উরামকি উচ্চ আদালত বলেছিল যে তারা কাদিরের আবেদন বিবেচনা করবে। কিন্তু কিছুই হয় নি। রাবিয়া কাদিরের মেয়ে বলেন, পরবর্তীতে কাদিরের আইনজীবী বলেন নতুন করে আবেদন করে কিছুই হবে না যদি না আগের আবেদন আমলে না নেয়। এর কিছু দিন পর লুইদাওয়ান কারাগার থেকে বাজিয়াহু কারাগারে স্থানান্তর করা হয়। বাজিয়াহু উরামকি থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

প্রথম ১৫ মাস রাবেয়ার সাথে তার পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। তার ১১ সন্তানের মধ্যে ২জনকে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে। কারারক্ষা কর্মকর্তা এটাকে বিশেষ ব্যবস্থায় আয়োজন বলেন। একটি গোপন কক্ষে ৩০ মিনিটের জন্য দেখা করতে দেয়া হয়। সেখানেও তাদের কথা ধারণ করার জন্য তিনজন ব্যক্তি, ছয়জন পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। বাইরে আরো তিনজন পুলিশ ও কারা কর্মকর্তারা দাড়িয়ে ছিল। শুধুমাত্র চায়নিজ ভাষায় কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। শিশুদের কাছ থেকে আগেই জেনে নেওয়া হয় কোন বিষয় কথা বলবে। আর কোন বিষয়ে কথা বলতে পারবে না তাও বলে দেয়া হয়। রাবেয়াকে বলে দেয়া হয় স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর তিনি

দিতে পারবে না। রাবেয়া তার সন্তানদের বলে দেন তিনি ভাল আছেন আর এটাও বলে দেন যে তিনি কখনোই আত্মহত্যা করবেন না।

তার সন্তানদের অবশ্য খাবার, কম্বল এবং কাপড়চোপড় রেখে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু কোন ওষুধ রেখে যাবার অনুমতি দেয়া হয় না। কয়েকমাস পর পর রাবেয়ার মেয়েরা কাপড়চোপড় দিয়ে আসত। কিন্তু দেখা করতে পারত না। তার মেয়েরা তাদের মায়ের লেখা প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেখতে চাইলে কারারক্ষীরা বলেন, ইতিমধ্যে রাবেয়া কাদেরকে কারানিয়ম লজ্ঘন করার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

তার স্বাস্থের অবস্থা খারাপের দিকে গেলে পরিবারের পক্ষ হতে চিকিৎসা করানোর অনুমতি চাওয়া হয়। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ এজন্য পরিবারের কাছে কয়েকশ ডলার অর্থ দাবি করে। রাবেয়ার ছেলে আবলিকিম আবদুরেহিম সচিব কাহিরমান আবদু করিমকেও ১৯৯৯ সালের ১১ আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়। এবং তাদেরকে সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়।

রাবেয়া কাদির জিনজিয়াংয়ের People's Political Consultative Conference এর সদস্য। তিনি বিখ্যাত হয়ে যান তার ব্যবসার সুনামের কারণে। যেখানে অসংখ্য উইঘুর মুসলিমের কর্মসংস্থান করে দেন। তিনি উইঘুর নারীদেরও ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রজেক্টের আওতায় নিয়ে আসেন।

রাবেয়া কাদির তার দ্বিতীয় স্বামী সিদিক রোজির সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেন ১৯৭৮সালে। উইঘুর মানবাধিকার নিয়ে কাজ করায় তখন তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ছাড়া পাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তারা বিয়ে করেন। ৩০০০ ইয়ান ধার করে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমদিকে স্বামী স্ত্রী দুজনেই ব্যবসা করেন। রোজি সাহিত্য পড়াতেন, লেখালেখি করতেন। উইঘুরদের জীবন, দুঃখগাথা তুলে ধরতেন। ১৯৯৬ সালে গ্রেপ্তার এড়াতে তারা আমেরিকায় পাড়ি জমান। রোজি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন আর কাদির দেশে ফিরে আসেন।

২০০০ সালের নভেম্বর মাসে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রাবেয়া কাদিরকে 'চীনে সুস্থ সমাজ গঠনে তৃণমূল কাজ' শীর্ষক অবদানের জন্য তাকে সম্মানিত করে। তার পক্ষে তার স্বামী সে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

উইঘুর নির্যাতনে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীনা কমিউনিস্ট সরকারের অভিনব নির্যাতনের প্রতিবাদ কোনো মুসলিম দেশ থেকে তেমন জোড়ালেভাবে দেখা যায়নি যতটা দেখা গেছে আমেরিকা ও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট সংগঠনগুলোর পক্ষ হতে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন Human Rights Watch (এইচআরডব্লিউ) অনতিবিলম্বে চীনের জিনজিয়াংয়ে বেআইনি সব রাজনৈতিক কাম্পে আটক সকল বন্দিকে মুক্তি এবং ক্যাম্পগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আহবান জানায় (১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭)।

কাজাখাস্তানের চীনা রাষ্ট্রদূত শাহারাত নারশেভ চীনা উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লি হুইলাইর সাথে সাক্ষাত করে কাজাখ বন্দিদের ব্যাপারে কথা বলেন।

৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে মার্কিন সিনেটর মারকো রুবিও এবং রিপ্রেসেন্টেটিভ ক্রিস স্মিথ চীনা রাষ্ট্রদূত টেরি ব্রানস্ট্যান্ড এর কাছে চীনের জিনজিয়াংয়ে রাজনৈতিক পুনঃশিক্ষা ক্যাম্পগুলোতে গণহারে উইঘুর মুসলিমদের আটকের প্রতিবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন।

২১ মে ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘে বেসরকারি সংস্থাসংক্রান্ত একটি সেশনে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়ে জাতিসংঘ প্রতিনিধি কেলি কুরি জিনজিয়াংয়ে ব্যাপকহারে উইঘুর মুসলিমদের আটকের সত্যতা নিশ্চিত করতে গিয়ে বলেন, "চীনের ওয়েবসাইটে জিনজিয়াংয়ে রাজনৈতিক ক্যাম্প নির্মাণের টেন্ডার প্রকাশের খবর ছাপাতে দেখা গেছে।"

৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টারি গোলটেবিল বৈঠকে জিনজিয়াংয়ে জোরপূর্বক বন্দি করে রাখা ও নাগরিকদের মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। রহিমা মাহমুত নামের এক উইঘুর গায়ক ও মানবাধিকার কর্মী সেখানে উইঘুর জনগোষ্ঠীর ওপর মানবাধিকার লংঘনের বিস্তারিত তুলে ধরেন।

২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স উচ্চতর ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সভা'য় চীনের রিএডুকেশন ক্যাম্পের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, বেইজিং লক্ষ লক্ষ উইঘুর মুসলিমকে তথাকথিত পুনঃশিক্ষা কেন্দ্রে আটক করে রেখেছে। যেখানে তাদের সার্বক্ষণিক রাজনৈতিক মতাদর্শ গেলানো হয় এবং তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা শোনানো হয়"।

২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন সংস্থা Congressional- Executive Commission on China (CECC) চীনের মানবাধিকার ও আইনের শাসন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। তারা এক প্রতিবেদনে জানায় চীন প্রায় এক মিলিয়ন উইঘুর মুসলিম আটক রয়েছে রিএডুকেশন ক্যাম্পের নামে।

২৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে চীনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস ও কনসুলেট অফিস হতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। যাতে বলা হয়, রাজনৈতিক শিক্ষার নামে আটক লক্ষ লক্ষ উইঘুর মুসলিমকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।

১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘের মানাধিকার বিশেষজ্ঞরা চীনে আটক এক মিলিয়ন মুসলিম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। জাতিসংঘের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ কমিটির সদস্য গে ম্যাকডোগাল বলেন, "ধর্মীয় চরমপন্থা প্রতিরোধের নামে চীন গোটা জিনজিয়াংকে একটি কারাগারে পরিণত করেছে। গোপনীয়তার চাদরে ঢেকে রেখেছে। সেখানে কোন মানবাধিকার নেই।"

২৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে মার্কিন সিনেটর মারকো রুবিও এবং আরো ১৬ জন কংগ্রেস সদস্য যুক্তরাষ্ট্রকে বৈশ্বিক ম্যাগনটস্কি আইনের আওতায় চীনের ওপর মানবাধিকার লংঘনের শাস্তি প্রয়োগের আহবান জানান।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে জাতিসংঘ মানবাধিকার প্রধান মকিয়েল ব্যাসলেট চীনকে তার ও তার টিমের চাপ কমানোর আহবান জানান। তিনি চীনকে জিনজিয়াংয়ের ক্যাম্পগুলোতে মানবাধিকার কর্মীদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আহবান জানান।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের বিদেশ বিষয়ক নিরাপত্তা পলিসির উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি ফেডেরিকা মগেরিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে চীনের রিএডুকেশন ক্যাম্পের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন।

অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আল খোমেনীর উইঘুর মুসলিমদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে চীনের ওপর চাপ সৃষ্টিতে অস্বীকৃতি জানানোর সমালোচনা করেন।

২০১৯ সালে লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত *The Art Newspaper* পত্রিকা জানায় চীন হাজার হাজার লেখক, শিল্পী ও সম্ভ্রান্ত

শিক্ষিতজনদের গ্রেপ্তার করছে। যে কোন ধরনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ডের পরিণামে শাস্তি দিচ্ছে। *The Washington Post* পত্রিকাও উইঘুর মুসলিমদের দমন, তিব্বতে মানুষদের সাংস্কৃতিক জীবন পাল্টে দেয়া সংক্রান্ত একটি গুরুতর সংবাদ প্রকাশ করে।

২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্ক সরকার চীনকে উইঘুর স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে উইঘুর মুসলিম ও অন্যান্য মুসলিম সম্প্রদায়ের মৌলিক মানবাধিকার লংঘনে অভিযুক্ত করেন।

২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমান ক্যাম্পগুলো সমর্থন করে বলেন, "সন্ত্রাসবাদ বিরোধী এবং চরমপন্থা মোকাবেলায় যে কোন কাজ করার অধিকার চীনের রয়েছে।"

বাংলাদেশেও বিক্ষোভ

চীনের উইঘুর মুসলিমদের ওপর রাষ্ট্রীয় জুলুম ও নিপীড়নের প্রতিবাদে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন ইসলামী দল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হতে শুরু করে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এ সমাবেশগুলো অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় ওলামা মাশায়েখ আইম্মা পরিষদ, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিশ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ সুন্নী পরিষদ, ওলামা পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনের ব্যানারে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এসব বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয়। এর মধ্যে সুন্নী পরিষদ চীনা দূতাবাসে স্মারকলিপি পেশ করে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ তিন দফা বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে।

চীনের প্রতিক্রিয়া

চীন সরকার বরাবরই এসব রিএডুকেশন ক্যাম্পের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আসছে। যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়া চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চায় তখন তারা বলে তারা এ ব্যাপারে কিছুই শুনেনি।

১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে চীন সরকার নিয়ন্ত্রিত ট্যাবলয়েড পত্রিকা 'গ্লোবাল টাইমস' উইঘুরদের ওপর অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে জাতিসংঘের একটি কমিটির উদ্বেগ প্রকাশ করলে পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করে। গ্লোবাল টাইমস পত্রিকার মতে, চীন সরকার সিরিয়া বা লিবিয়ার

মতো পরিস্থিতি ঠেকাতে এবং লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে জিনজিয়াংয়ে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। একথা বাইরে রিএডুকেশন ক্যাম্প নিয়ে পত্রিকাটি কিছুই বলেনি। তার পরের দিন পত্রিকাটি Xinjiang policies justified বা 'জিনজিয়াং কৌশল আইনিভাবে গৃহীত' শিরোনামে একটি সম্পাদকীয় প্রকাশ করে।

১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জেনেভায় জাতিসংঘের একটি সভায় চীনের প্রতিনিধি জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটিকে বলে জিনজিয়াংয়ে রিএডুকেশন ক্যাম্প বলতে কিছু নেই এবং এধরনের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা যে চীন এক মিলিয়ন লোককে বন্দি করে রেখেছে। চাইনিজ প্রতিনিধি আরো বলেন, "উইঘুরসহ জিনজিয়াংয়ের সব জাতির লোকেরা সমান অধিকার ভোগ করে। তবে কিছু চরমপন্থি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী লোককে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাদের পুনর্বাসনে সহযোগিতা করার জন্য।"

১৪ আগস্ট ২০১৮ তারিখে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লু কাং বলেন, "চীনবিরোধী শক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে চীনের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করছে আর কিছু বিদেশি মিডিয়া ভুলভাবে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরছে। চীনের সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলার লড়াইকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করছে।"

২১ আগস্ট ২০১৮ তারিখে যুক্তরাজ্যে চীনের রাষ্ট্রদূত লিউ শিয়াওমিং বিশ্বখ্যাত *Financial Times* পত্রিকায় উইঘুরদের নির্যাতন নিয়ে লেখা *"Crackdown in Xinjiang: Where have all the people gone?"* প্রতিবেদনের জবাবে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি বলেন, "জিনজিয়াং প্রশাসন কতৃক গৃহীত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী কার্যকরভাবে শুধু ধর্মীয় চরমপন্থাই মোকাবেলা করছে না বরং তাদের চরমপন্থা ত্যাগ করে সঠিক পথ পেতে এবং উন্নত জীবন গঠনেও সহযোগিতা করছে।"

কিছু চাইনিজ মানুষও চীনা সরকারের এই পদক্ষেপের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। যেমন ১০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রায় ৪৭ জন চাইনিজ বুদ্ধিজীবী 'জিনজিয়াংয়ে মর্মান্তিক মানবাধিকার লংঘন' শিরোনামে একটি আপিল দায়ের করে।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গেং শুয়াং রিএডুকেশন ক্যাম্প নিয়ে 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' এর একটি বিবৃতির প্রতিবাদ জানায়। তিনি বলেন, "এই সংগঠনটি সবসময় চীনের

ব্যাপারে নেতিবাচক এবং অতিরঞ্জিত খবর নিয়ে মাতামাতি করে।" তিনি আরো বলেন, জিনজিয়াংয়ের লোকেরা সামাজিক স্থিতিশীলতা, সুন্দর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীরর মধ্যে সহাবস্থান উপভোগ করছে।

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে জাতিসংঘ জিনজিয়াংয়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ এবং পর্যবেক্ষক দল প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আহবান জানালে চীন জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন প্রধান মিসেল ব্যশলেটকে 'চীনের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল' হওয়ার আহবান জানান। চীন নিজদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করার এবং একপেশে মিডিয়ার বক্তব্য না শুনারও আহবান জানায়।

Radio Free Asia এ একটি অভিনব খবর প্রচারিত হয় ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। খবরে বলা হয় যখন জিনজিয়াং কর্তৃপক্ষ শুনতে পায় যে আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রতিনিধি ক্যাম্প পরিদর্শনে আসতে পারে তখন তারা কিছু কৌশলের আশ্রয় নেয়। কৌশল হলো, জিনজিয়াং প্রশাসন বিভিন্ন শহরে বাড়ি বাড়ি সরকারি কর্মকর্তা পাঠায়। বিশেষ করে যেসব বাড়ির লোকজন ক্যাম্পে বন্দি আছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা ক্যাম্পে নির্যাতনের কথা যেন আগত বিদেশিদের কাছে না বলা হয় সে নির্দেশনা দিয়ে আসে। বলে, তাদের কাছে ভাল ভাল কথা বলতে হবে, কমিউনিস্ট পার্টির প্রশংসা করতে হবে।

৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ওয়াশিংটনভিত্তিক আইনজীবী এবং উইঘুরকর্মী নূরী তুর্কেল বলেন, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চীন ভিন্ন কৌশল নিয়েছে। নিষ্ঠুর বর্বর আচরণের কথা অস্বীকার করছে এং উইঘুরদের কাঁধে দোষ চাপানোর পায়তারা করছে।

২০১৯ সালের ১৮ মার্চে জিনজিয়াংয়ে সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও ধর্মীয় মৌলবাদিকরণের বিরুদ্ধে চীন সরকার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। শ্বেতপত্রে দাবি করা হয়ে, চীন সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত একটি দেশ। গত দুই বছরে চীনে কোন আইন লঙ্ঘন করা হয়নি। বরং চরমপন্থা কমাতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উইঘুরদের সংগঠন

ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস, উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টস, উইঘুর আমেরিকান এসোসিয়েশনসহ অসংখ্য সংগঠন রয়েছে উইঘুরদের। এরমধ্যে সবচেয়ে বড় সংগঠন হলো জার্মান থেকে পরিচালিত ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস। নিচে নিচে সংগঠনগুলোর বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

১.ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস [World Uyghur Congress (WUC)]

পরিচিতি

এটি একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। পূর্ব তুর্কিস্তান ও এর বাহিরে অবস্থানরত উইঘুরদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কথা বলা এবং প্রতিনিধিত্ব করা এর প্রধান কাজ। ২০০৪ সালের ১৬ এপ্রিল জার্মানীর মিউনিখে এর যাত্রা শুরু হয়। এটি মূলত East Turkistan National Congress, World Uyghur Youth Congress সংগঠন দুটি ভেঙ্গে নতুনভাবে গঠিত একটি সংগঠন। এর মূল লক্ষ্য হলো শান্তিপূর্ণ, অসহিংস এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব তুর্কিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণ করা।

ডব্লিউইউসি একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন। ডব্লিউইউসি'র সকল সদস্য বিশ্বব্যাপি উইঘুরদের একটি সমাবেশ ও ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। তিন বছর মেয়াদি একটি পর্ব তারা অতিক্রম করে। ডব্লিউইউসি বিশ্বের অন্যান্য উইঘুর সংগঠন যারা শান্তিপূর্ণভাবে পূর্ব তুর্কিস্তানের উইঘুর জাতির মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র রক্ষায় কাজ করে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

ডব্লিউইউসি গণপ্রজাতান্ত্রিক চীনের উইঘুরদের মানবাধিকার অবস্থার উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয়ান পার্লামেন্ট, জাতিসংঘ মানবাধিকার সুরক্ষার সাথে সমন্বয় করে ব্যাপক সচেতনতা তৈরিতে কাজ করে। ডব্লিউইউসি বছরজুড়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার সভায় অংশগ্রহণ করে। চীনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিয়ে লিখিত এবং মৌখিকভাবে জাতিসংঘকে নিয়মিত আপডেট জানায়।

স্টিয়ারিং বা পরিচালনা কমিটি

এর একটি তিন বছর মেয়াদি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। ডব্লিউইউসি একটি গণতান্ত্রিক সংগঠন হওয়ায় এর সকল সদস্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়। প্রতিটি সাধারণ সভায় সারা বিশ্ব থেকে এর সদস্যরা যোগদান করেন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। সর্বশেষ নির্বাচিত কমিটির সারণিটি নিচে দেওয়া হলো।

ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেস পরিচালনা পর্ষদ ২০১৯

পদ	নাম
প্রেসিডেন্ট	দলকুন ইসা (জার্মানি)
ভাইস প্রেসিডেন্ট	ফারহাত মুহাম্মেত (জার্মানি)
	ড. এরকিন একরেম (তুর্কি)
নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান	ওমার কানাত (যুক্তরাষ্ট্র)
নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান	সেমেত আবলা (নরওয়ে)
	এরকিন এক্সমেত (কাজাখস্তান)
সেক্রেটারী	ড. এরকিন এমেত (তুর্কি)
মুখপাত্র	দিলশাত রিশিত (সুইডেন)
ইন্সপেক্টর জেনারেল	আবলিকিম ইদরিস (যুক্তরাষ্ট্র)
ইন্সপেক্টর	পোলাত সাইম (অস্ট্রেলিয়া)
	ফারহাত ইয়াকুপ (নরওয়ে)
ট্রেজারার	আবদু জেলিল ইমেত (জার্মানি)
মানবধিকার কমিটির পরিচালক	জোবায়রা শামসাদীন (যুক্তরাষ্ট্র)
আভ্যন্তরীণ বিষয়ক পরিচালক	হামিত গকতুর্ক (তুর্কি)
চীন বিষয়ক পরিচালক	ইলশাত হাসান (যুক্তরাষ্ট্র)
সংস্কৃতি বিষয়ক পরিচালক	জায়দিন তুরসুন (নেদারল্যান্ডস)
ধর্মীয় বিষয়ক পরিচালক	তুরঘুরজান আলওয়াদুন (জার্মানি)
নারীবিষয়ক পরিচালক	আমানগুল আজিজ (জার্মানি)
যুব বিষয়ক পরিচালক	কুয়েরবান হাইয়ুর (জার্মানি)
পরিবেশ বিষয়ক পরিচালক	এনভার তুহতি (যুক্তরাজ্য)
প্রকাশনা সেন্টার পরিচালক	আবদুজেলিল তুরান (তুর্কি)
উদ্বাস্তু কেন্দ্র পরিচালক	মেমেত তুহতি (কানাডা)

গবেষণা কেন্দ্র পরিচালক	এনওয়ার এহমেত (জার্মানি)
শিক্ষা বিষয়ক পরিচালক	দিলনারা কাশিমভা (কাজাখস্তান)
পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	ইলহাম মাহমুত (জাপান)
কিরগিজিস্তান প্রতিনিধি	রোজমুহাম্মদে আব্দুল বাকিভ (কিরগিজিস্তান)
উপদেষ্টা কমিটি	কেহরিমান ঘোজামবেরদি (কাজাখস্তান)
	রিজা সেমেদি (কাজাখস্তান)
	তুরসুন ইসলাম (কিরগিজিস্তান)
	সিওয়াইত তারানসি (তুর্কি)

ওয়ার্ল্ড উইঘুর কংগ্রেসের এ পর্যন্ত মোট ছয়টি এসেম্বলী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ এসেম্বলি হয় জার্মানীর মিউনিখে। যাতে ১৮ দেশের ১০০জন ডেলিগেট অংশ নেয়। ডেলিগেটদের অংশগ্রহণে নতুন সেশনের জন্য পরিচালনা কমিটি দায়িত্ব গ্রহণ করে।

প্রেসিডেন্ট দলকুন ইসা

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দলকুন ইসা ১৯৮৮ সালে জিনজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র নেতা। তিনি ১৯৮৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা তার শেষ হয়ে গেলে তিনি তুরস্কের গাজী বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে চলে যান জার্মানীতে সেখানে কম্পিউটার সাইন্সে ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে গেলে চীনা সরকার দমন পীড়ন শুরু করে। পালিয়ে আসেন ইউরোপে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ২০০৬ সালে জার্মানীর নাগরিকত্ব লাভ করেন।

তিনি জার্মানীতে World Uyghur Youth Congress সংগঠন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। সংগঠনটির নির্বাহী চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্টের দায়িত্বপালন করেন দীর্ঘদিন। ২০০৪ সালে World Uyghur Congress সংগঠন প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি East Turkistan National Congress, World Uyghur Youth Congress সংগঠন দুটি ভেঙ্গে নতুনভাবে গঠিত সংগঠনের প্রথম জেনারেল

সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি উইঘুরদের মানবাধিকার নিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, পার্লামেন্ট ও সরকারগুলোর সাথে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে মত বিনিময় করেন এবং উইঘুরদের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরেন।

ইসা ১৫ জুন ১৯৮৮ সালে জিনজিয়াংয়ে ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করে। এর আগে তাকে ছয় মাস গৃহবন্দি করে রাখা হয়। এরপর তিনি ছোট আকারের ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবসার সুবাদে চীনের বিভিন্ন শহরে যাওয়ার সুযোগ পান। এসময় তিনি ১৯৮৮ হতে ১৯৯০ সালে চীন সরকারের উইঘুর নীতিমালা সংগ্রহ করেন। ১৯৯০ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত তিনি তুর্কি এবং ইংরেজি ভাষা শিখেন বেইজিংয়ের বিদেশি ভাষা শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় হতে। এসময় তিনি উইঘুর ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন বই পুস্তিকা লিখে ও সংগ্রহ করে উইঘুরদের মাঝে বিতরণ করতেন। ১৯৯৪ সালে চীনা সরকার আবারো তার পিছু নেয়। তাকে দেশ ত্যাগের আল্টিমেটাম দেয়। তখন তিনি তুরস্কে পালিয়ে যান। তুরস্কে তার মাস্টার্স ডিগ্রি আর্জন করেন। এরপর তুরস্কে ছাত্রসহপাঠীদের নিয়ে Eastern Turkestan Youth Union সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশটিতে থাকাকালে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

উইঘুরদের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ কমিউনিস্ট সরকারের হাতে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্মাননা দেওয়া প্রতিষ্ঠান Communism Memorial Foundation's Human Rights Award এর পক্ষ হতে ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে সম্মাননা পদক লাভ করেন। ২০১৭ সালে তিনি আন্তর্জাতিক সংগঠন Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২. উইঘুর আমেরিকান এসোসিয়েশন [Uyghur American Association (UAA)]

পরিচিতি

এটি আমেরিকাভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। উইঘুর সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ, পরিপূর্ণ বিকাশ, মানবিক সমাজ গঠন এবং উইঘুর জনগণের

মানবাধিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় গণতান্ত্রিক পন্থায় কাজ করাই এর লক্ষ্য।

পরিচালনা পর্ষদ

ইলশাত হাসান - প্রেসিডেন্ট
ওমার কানাত- ভাইস প্রেসিডেন্ট
জুরেত ওবুল- জেনারেল সেক্রেটারি
একরেম- ট্রেজারার
মূসা- লজিস্টিক
মেহরাই মেমতেলি- নারী বিষয়ক

৩. ইউএইচআরপি [Uyghur Human Rights Project (UHRP)]

পরিচিতি

উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট বা ইউএইচআরপি হলো উইঘুরদের মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিশ্বব্যাপি পরিচিত একটি সংগঠন। সংগঠনটি ২০০৪ সালে উইঘুর আমেরিকান এসোশিয়েন কর্তৃক National Endowment for Democracy (NED) এর সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির উদ্দেশ্য হলো উইঘুরদের জন্য মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র নিশ্চিত করা। ২০১৬ সাল হতে এটি অলাভজনক এবং ট্যাক্স ফ্রি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইউএইচআরপির লক্ষ্য মানবধিকার গবেষণা, প্রতিবেদন তৈরি এবং আইনি সহায়তা প্রদান। সংগঠনটি পূর্ব তুর্কিস্থানে উইঘুর এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মানিবাধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষায় গুরুত্ব দেয়।

ইউএইচআরপি প্রয়োজন কেন?

মানবাধিকার সংগঠনগুলো যেমন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো চীনের কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণ জিনজিয়াংয়ের মানবাধিকার সংবাদ সবসময় সময়মত পায় না। ফলে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজরে চলতি ঘটনাপ্রবাহ আনা যায় না এবং জনসমর্থনও আদায় হয় না। তাই সময়মত সঠিক খবর পৌছে দিতে কাজ

করে ইউএইচআরপি। মানবাধিকার কর্মীরা একমত যে উইঘুর চালিত এসব মানবাধিকার সংগঠনগুলো কাজ না করলে পূর্ব তুর্কিস্তানের খুব কম খবরই বিশ্ববাসী জানত।

কর্মকর্তাবৃন্দ

ওমর কানাত-পরিচালক

ইউএইচআরপি বা উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টের পরিচালক জনবা ওমর কানাত প্রায় দুইদশক ধরে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন। ১৯৯৯ সালে তার এই মানবধিকার রক্ষার মিশন শুরু হয়। শুরুটা হয় সাংবাদিকতা দিয়ে। রেডিও ফ্রি এশিয়ার সাংবাদিক ছিলেন তিনি। ১৯৯৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশক তিনি বিভিন্ন যুদ্ধবিধংস্ত দেশের জন্য সাংবাদিকতা করেছেন। আফগানিস্তান, ইরাক, উইঘুর ভাষা সংগ্রামীদের সংবাদসহ এশিয়ার অনেক বড় বড় নেতার সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছেন। দালাইলামার মতো নেতাও সাক্ষাৎকার গ্রহীতার তালিকায় রয়েছে।

২০০৩ সালে ইউএইচআরপি গঠনে তার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এছাড়া তিনি ২০০৪ সালে World Uyghur Congress (WUC) গঠনেও ভূমিকা রাখেন। সংগঠনটির ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন ২০০৬ সালে। ২০১৭ সালে নির্বাহী বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন।

তিনি ইতিহাসে বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপর জার্মানির মিউনিখ ইনস্টিটিউট অভ ইকোনোমিকস এন্ড ট্রেড এ পড়াশুনা করেছেন। তিনি পূর্ব তুর্কিস্তানের ঘুলজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব কানাত ইংরেজ, জার্মান, উইঘুর, তার্কিশ, পার্সিয়ান, তাজিখ, দারি এবং উজবেক ভাষায় দক্ষ।

ঢাকার সাথে উইঘুরদের সম্পর্ক ও আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) হল

ঢাকার বকশিবাজারে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসটি আমরা কমবেশি চিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে বদরুন্নেসা মহিলা বিশ্ববিদ্য কলেজ পার হয়ে হাতের বাম দিকে দুমিনিট হাঁটলেই চোখে পড়বে আল্লা কাশগড়ী (রহ.) হল। হলটি ঢাকা আলিয়া মাদরাসার। এর নামকরণ করা হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের সময় অত্র মাদরাসার একজন শিক্ষক কাশগড়ী হুজুরের নামে।

আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) এর মূল নাম আব্দুর রহমান। তিনি ১৯১২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তুর্কিস্তানের কাশগড় নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। এ জন্য তাকে কাশগড়ী বলে ডাকা হয়। তিনি ছোটবেলা থেকেই একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি ও বিনয়ী। তার ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, মেধা ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন বিজ্ঞ আলেম।

আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগড়ী (রহ.) প্রাথমিক শিক্ষা কাশগড়েই করেন। এরপর তিনি অধিক জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভারত আগমন করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের লক্ষৌতে অবস্থিত দারুল নদওয়াতুল উলামা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করে ১৯৩১ সালে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে প্রথম শ্রেণী লাভ করেন। দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করে সেই প্রতিষ্ঠানে আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) আরবি সাহিত্যের শিক্ষক পদে নিয়োজিত হন। তিনি ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের উদ্দেশ্যে বড় লার্ট ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই কলিকাতা মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় উসুলে ফিকহের অধ্যাপক পদে মনোনীত হন। কালক্রমে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ১৯৪৮ সালে স্থানান্তরিত হয়, তখন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ তাকে মাদ্রাসার মালপত্র তথা লাইব্রেরির বইপত্র তদারকি করার জন্য নিযুক্ত করেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন এবং মালপত্র তদারকি করেন। এখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পর ১৯৫৬ সালে তিনি সহকারী হেড মাওলানা পদে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে আল্লামা কাশগড়ী

(রহ.) ১৯৬৯ সালে হেড মাওলানা পদে উন্নীত হন। তিনি ছিলেন শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষক। এজন্য তাকে বলা হয় "উস্তাজুল আসাতিজা"।

আল্লামা আব্দুর রহমান কাশগড়ী (রহ.) ছিলেন আরবি সাহিত্যের ...ন বিজ্ঞ কবি ও লেখক। আরবি সাহিত্যে তার অসংখ্য অবদান ...ছে। এ মহান সাধক পাঠদান ও জ্ঞান বিতরণের সঙ্গে কয়েকটি ...ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। তার লিখিত অনেক গ্রন্থ মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ...ইব্রেরিতে পাওয়া যায়। তার লিখিত গ্রন্থাবলি হলো ১. কিতাবুল হাদিকা, ২. কিতাবুল মুফীদ, ৩. আল ইবরাত, ৪. আযযাহরাত ৫. আশ শাযারাত ৬. মুহিককুননাকদ ৭. আল মাহবাব ফিল মুযাককার ওয়াল মুয়াল্লাম।

তার নামে আলিয়া মাদ্রাসার হলটির নাম- আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) হল। এ হলে বসবাসরত ছাত্র সংখ্যা প্রায় পাঁচ শতাধিক। তিনি শুধু আলোর সন্ধান দেননি, মানবসেবা, জীবপ্রেম ও সৃষ্টির প্রতি ইহসানের মাধ্যমে মানব জীবন পরিচালনার শিক্ষা দিয়েছেন।

এই মহান মনীষী ১৯৭১ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। এভাবেই উইঘুর মুসলিমদের সাথে ঢাকার গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়।

আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) এর জীবনীর একটা অংশ নিচে তুলে ধরছি। যা তার মুখ থেকে শুনে হুবহু বর্ণনা দিয়েছেন মাওলানা মুহিউদ্দীন খান তার 'জীবনের খেলাঘরে' বইয়ে।

"নির্ধারিত সময়ে একটা পুটলি হাতে দিয়ে আমাকে কাফেলার সংগী করে দেয়া হলো। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। সন্ধ্যারাতের আবছা আবহাওয়ায় মা আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিতে এসেছিলেন। শেষটায় একটা টিলার উপর দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বিলীয়মান কাফেলার দিকে।

শেষবারের মতো আমার মায়ের কণ্ঠ শুনেছিলাম, চিৎকার করে আমার নাম ধরে ডাকছেন, আমাদের কাফেলাটি তখন পাহাড়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমার পরে যারা দেশ ছেড়ে এসেছিল, তাদের মুখে শুনেছি, আমাকে বিদায় দেয়ার পর মা পুরোপুরি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন প্রতিদিনই সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তিনি পাহাড়ে টিলাটার উপর এসে দাঁড়াতেন, কিছুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ডাক দিতেন, আবদুর রহমান! আবদুর রহমান!!

শুনেছি, একদিন আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আমার মা টিলাটার উপরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। বিশ্বাস করো, প্রতি সন্ধায় এখনো আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কণ্ঠ যেনো শুনতে পাই, তিনি যেন ... ডাকছেন 'আবদুর রহমান, আবদুর রহমান'...।"

আল্লামা কাশগড়ী (রহ.) এর আরবি কবিতা আলিয়া মাদ... মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় প্রতিটি ক্লাসেই পাঠ্য। আরবি ... দখল আনতে কবিতাগুলো খুবই কার্যকর। ছাত্ররাও মন দিয়ে পড়েন। ... পড়ে ইসলামী জ্ঞানরাজ্যের ভিত্তি আরবি ভাষায় দখল আনেন। উচ্চতর ডিগ্রি নেন। দ্বীন প্রচারে নিয়োজিত হন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। কিন্তু তারা কি খবর রাখেন তাদের প্রিয় উস্তাদের মাতৃভূমি আজ বেদখল? যে উস্তাদ উম্মাহর খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন, নিজ মাতৃভূমি ছেড়েছেন, আজ তার মাতৃভূমি রক্ষায় উম্মাহর কেউ এগিয়ে আসছে না!

মান
বিশ্বব

কর্মব
ওমর
ই

আমাদের নন-ফিকশন বইগুলো

	বইয়ের নাম	লেখক	
১.	কয়েদী ৩৪৫	সামি আলহায	
২.	আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	
৩.	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	
৪.	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	
৫.	উইঘুরের কান্না	মুহসিন আবদু	
৬.	আজাদীর লড়াই (কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম)	অরুন্ধতী রায়	
৭.	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
৮.	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়	
৯.	মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান	দাউদ গজনভী	
১০.	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস এম মুশরিফ	
১১.	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩০০
১২.	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৩.	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরণ	২৫০৳
১৪.	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
১৫.	অ্যাম্বাসেডর	আবদুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
১৬.	ম্যালকম এক্স । নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
১৭.	মাইন্ড ওয়ারস	ম্যারি ডি জোনস	৩৩০৳
১৮.	বিপ্লবী ভাষণ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	আহমদ মুসা	৩৫০৳
১৯.	নির্বাচিত বাণী	শেখ মুজিবুর রহমান	২০০৳
২০.	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳
২১.	বীর নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা	সুরমা জাহিদ	২০০৳
২২.	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
২৩.	যে কারণে শেখ মুজিবকে ভালোবাসি	রফিকুল ইসলাম	২০০৳
২৪.	ইলুমিনাতি এজেন্ডা	ডিন এন্ড জিল হ্যান্ডারসন	২৫০৳
২৫.	ভারতের কারাগারে দিনগুলো	ইফতিখার গিলানি	২৫০৳
২৬.	ওসামার সাথে আমার জীবন	নাসের আল-বাহরি	৩৩০৳
২৭.	শত্রুযোদ্ধা	মোয়াজ্জেম বেগ	৫৫০৳
২৮.	সিক্রেট ওয়ার ইন আফগানিস্তান	স্টিভ কোল	৬০০৳
২৯.	কান্দাহারের ডায়েরি	রবার্ট গ্রেনিয়ার	৫০০৳
৩০.	কান্দাহারের পথে	জেসন বার্ক	৪০০৳
৩১.	ক্রমিক খুনি	মনোয়ারুল ইসলাম	২০০৳
৩২.	পাশ্চাত্যের কালিমা	খালিদ এইচ আরমান	৫৫০৳

THE SILK ROAD
0 300 600 mi
0 300 600 900 km
Lake Balkhash
Aral Sea
Syr Darya
Amu Darya
ALTAI MOUNTAINS
GOBI DESERT
GREAT WALL OF CHINA
Beijing
YELLOW SEA
NORTH CHINA PLAIN
Ürümqi
Turfan
Hami
Jiuquan
TIEN SHAN
Tashkent
Kucha
Bukhara
Osh
Aksu
Anxi
Yumen
Imperial Highway
Huang He
Shanghai
Samarkand
Kashgar
TAKLA MAKAN DESERT
Lanzhou
Chang'an (Xi'an)
Mashhad
Balkh
PAMIRS
Khotan
to Anatolia
HINDU KUSH MTS.
KARAKORAM RANGE
KUNLUN MOUNTAINS
QIN MTS.
Kabul
Taxila
PLATEAU OF TIBET
CHINA
SULAIMAN RANGE
PUNJAB
HIMALAYAS
Yangtze (Chang Jiang)
Brahmaputra
Indus
SINDH
Great Royal Road
Delhi
Hsi
BALOCHISTAN
THAR DESERT
Ganges
Irrawaddy
SOUTH CHINA SEA
Patna
Prayag (Allahabad)
VINDHYA RANGE
Narmada
Salween
ARABIAN SEA
BAY OF BENGAL
Mekong
INDIA
© Encyclopædia Britannica, Inc.